MATRICULATION BENGALI SELECTIONS

(*Intended for Matriculation Examination, 1928.*)

PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CALCUTTA
1925

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

Reg. No. 5383, Dec. 1925—H

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার অনুমোদন-ক্রমে এই রচনা-সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। কিন্তু আজ আমাদের বিশেষ দুঃখ এই যে, যাঁহার আগ্রহে, যত্নে ও উৎসাহে এই সংগ্রহ-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, আমরা তাঁহাকে ইহা দেখাইতে পারিলাম না।

রচনা-সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার ভিতর দিয়া ছাত্রদিগের প্রখ্যাত-নামা লেখকগণের বিশেষ বিশেষ লেখার সহিত সহজেই পরিচয় ঘটে এবং তাঁহাদের অন্যান্য রচনা পড়িবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে স্বতঃই স্ফুরিত হয়। তদ্ভিন্ন একই পুস্তকে নানাবিষয়িণী রচনার সমাবেশ থাকায় ভাবসম্পদ্ বৃদ্ধির বিশেষ সুবিধা ঘটে। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই রচনা-সংগ্রহ সম্পাদিত হইল। ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকগণের রচনা যথাসম্ভব মুদ্রিত হইয়াছে, এবং কয়েকটি রচনার এমন অংশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, উক্ত রচনা পাঠকালে বালকগণের যেন মূল পুস্তক পড়িবার স্পৃহা জাগরিত হয়।

পরিশেষে, এই পুস্তকে যে সমস্ত রচনা গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য যে সমস্ত স্বত্বাধিকারী রচনাগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গদ্যাংশ

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

পদ্যাংশ

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি স্বত্বাধিকারীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

MATRICULATION
BENGALI SELECTIONS

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী, এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। অনন্তর, তিনি, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থ কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া, তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের

জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি ভূষণ-প্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু, তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে; মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী, নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ, আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া, নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে, ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের

হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল। এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম, অতঃপর, পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগের

সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল; উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে, বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে; আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব; আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখী-ব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্য-প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী

হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া, বলিলেন, দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন। গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যেগুলি বলিবেন, সকল মনে রাখিও।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রামায়ণ গান

মহর্ষি, বাল্মীকি রামচরিত অবলম্বন করিয়া অতি অদ্ভুত কাব্যের রচনা করিয়াছেন, তাঁহার দুই কোকিলকণ্ঠ তরুণবয়স্ক শিষ্য অতি মধুরস্বরে সেই কাব্যের গান করে; কল্য প্রভাতে তাহারা রাজসভায় গান করিবে; এই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত হইয়াছিল। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, কি ঋষিগণ, কি নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ, সকলেই সঙ্গীতশ্রবণলালসার বশবর্ত্তী হইয়া সাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সে দিবসের সভায় সমারোহের সীমা ছিল না। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, এবং সুগ্রীব, বিভীষণাদি সুহৃদ্বর্গ, তাঁহার বামে ও দক্ষিণে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি রাজপরিবার, অরুন্ধতী প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ সমভিব্যাহারে পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইলেন!

এইরূপে রাজসভায় সমবেত হইয়া সমস্ত লোক অভিনব কাব্যের ও সুকুমার গায়কযুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও নিতান্ত উৎসুক চিত্তে তাহাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি, কুশ ও লব সমভিব্যাহারে, সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র সভামণ্ডলে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। যাঁহারা পূর্ব্বদিন কুশ ও লবকে

দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বসমীপে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে তাহাদের দুই সহোদরকে দেখাইতে লাগিলেন। বাল্মীকি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সভাস্থ সমস্ত লোকে এককালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহর্ষি ও তাঁহার দুই শিষ্যের নিমিত্তে পৃথক্ স্থান স্থিরীকৃত ছিল, তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণের নিমিত্তে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, একান্ত উৎসুক চিত্তে, কখন আরম্ভ হয়, এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাল্মীকি সভার সর্ব্বাংশে নয়ন সঞ্চারণ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহারাজ! সকলেই সঙ্গীত শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীতের আরম্ভ হউক। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে কুশ ও লব বীণাযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। বাল্মীকি পূর্ব্বেই কুশ ও লবকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, রামায়ণের যে সকল অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগ বর্ণিত আছে, তোমরা অদ্য ঐ সকল অংশেরই গান করিবে। তদনুসারে তাহারা কিয়ৎক্ষণ গান করিবামাত্র, রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাম তাহাদের দুই সহোদরকে যত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাহারা সীতার তনয় বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন—ইঁহারাও, তাহাদের কলেবরে রামের ও সীতার সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতিরিক্ত, সভাস্থ সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া

বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই দুই ঋষিকুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতিস্বরূপ; যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য না থাকিত, তাহা হইলে, রামে ও এই দুই ঋষিকুমারে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয়, যেন রাম কুমারবয়স্ অবলম্বন পূর্ব্বক দুই মূর্ত্তি ধরিয়া ঋষিকুমারের বেশ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই বয়সে রামের যেরূপ আকৃতি ও রূপলাবণ্যের যেরূপ মাধুরী ছিল, ইহাদিগেরও অবিকল সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া, একতান-মনে সঙ্গীতশ্রবণ ও অনিমিষনয়নে তাহাদের রূপ-নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! ইহাদিগকে সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দাও। তাহারা শ্রবণমাত্র বিনয়নম্রবচনে কহিল, মহারাজ! আমরা বনবাসী, বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি; যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলমাত্র আহার ও বল্কলমাত্র পরিধান করিয়া কালযাপন করি; আমাদেব সুবর্ণে প্রয়োজন কি? আমরা অনেক যত্নে ও অনেক পরিশ্রমে আপনকার চরিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম; আজি আপনকার সমক্ষে তাহার পরিচয় দিয়া, আমাদের সেই যত্ন ও সেই পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইল। আপনি শ্রবণ করিয়া যে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। বালকদিগের এইরূপ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা দেখিয়া, সকলে এককালে চমৎকৃত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কুশ ও লব সীতার তনয় বলিয়া, কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি, নিতান্ত অস্থিরচিত্তা হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস-

সহকারে, হা বৎসে জানকি! এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া, ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। সকলে বিকলান্তঃকরণ হইয়া, অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীতশ্রবণ করিয়া সকলেরই হৃদয়ে সীতার শোক এত প্রবলভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিল যে, সকলেই নিতান্ত অস্থির হইলেন, এবং অবিরল-ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস-পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা নিরতিশয় অধীরা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, ঐ দুই কুমারকে কেহ আমার নিকটে আনিয়া দাও; ক্রোড়ে লইয়া একবার আমি উহাদের মুখচুম্বন করিব; উহারা আমার জানকীর তনয়; উহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; হয় তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি উহাদের নিকটে যাই; ক্রোড়ে লইয়া একবার উহাদের মুখচুম্বন করিলে আমার জানকীশোকের অনেক নিবারণ হইবে। ঐ দেখ না, উহাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। উহারা সভায় প্রবেশ করিবামাত্র যেন কেহ আমায় বলিয়া দিল, ঐ তোমার রামের দুই বংশধর আসিতেছে; সেই অবধি উহাদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমি বার বৎসরে সীতাকে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু উহাদিগকে দেখিয়া আমার সীতাশোক পুনরায় নূতন হইয়া উঠিয়াছে। হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, অদ্যাপি জীবিত আছ, কি এই পাপিষ্ঠ নরলোকপরিত্যাগ করিয়াছ, কিছুই জানি না। এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া কৌশল্যা পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। সকলে সযত্ন হইয়া

পুনরায় তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন কৌশল্যা নিরতিশয় অধৈর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, এখনও তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দিলে না; না হয়, কেহ একবার লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া আমার নাম করিয়া বলুক; লক্ষ্মণ এখনই উহাদিগকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দিবে।

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া অরুন্ধতীর আদেশানুসারে সমীপবর্ত্তিনী প্রতিহারী লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত বলিয়া কৌশল্যার অভিপ্রায় তাঁহার গোচর করিল। লক্ষ্মণ কৌশলক্রমে সে দিবস সেই পর্য্যন্ত সঙ্গীতক্রিয়া রহিত করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন, এবং কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা তাহাদের দুই সহোদরকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে বারংবার উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন, এবং হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, এই বলিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সুমিত্রা উর্ম্মিলা প্রভৃতি সকলেই সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুশ ও লব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সন্তোষ ও পরিশ্রম

লিবরপুলনিবাসী উইলিয়ম রস্কো সন্তোষ ও পরিশ্রম-গুণের উত্তম উদাহরণস্থল। তাঁহার পিতা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন না; এ নিমিত্ত তাঁহাকে উচিতমত শিক্ষাদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু উইলিয়ম রস্কো স্বভাবতঃ সুবোধ ও সুশীল ছিলেন; অতএব তিনি কেবল আপন যত্নে ও পরিশ্রমে সুচারুরূপে শিক্ষিত হইয়া, যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং লোরেন্‌জো ডি মেডিচি ও পোপ দশম লিও এই দুই ব্যক্তির জীবনচরিত রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি আপনার প্রথম বয়সের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন—"আমি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া, পিতার কৃষিকার্য্য-বিষয়ে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার যে গোল আলুর চাষ ছিল, তাহাতেই আমি বিশিষ্টরূপ পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঐ আলু আবশ্যকমত বর্দ্ধিত হইলে, আমি মস্তকে করিয়া, বিক্রয়ার্থ বিক্রয়স্থানে আনয়ন করিতাম। পিতা প্রায় আমার উপর বিক্রয়ের ভারার্পণ করিতেন, ইহাতে আমার দ্বারা তাঁহার অনেক উপকার দর্শিয়াছিল। এই কর্ম্মে এবং এইরূপ পরিশ্রমজনক অন্যান্য কর্ম্মে, বিশেষতঃ একটি উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণরূপ তুষ্টিকর কার্য্যে আমি অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিয়াছি। এইরূপ পরিশ্রম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল অবশিষ্ট থাকিত, তাহা পুস্তকপাঠ করিয়া যাপন করিতাম। ইহাতে আমার

শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইল এবং অন্তঃকরণ সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন হইতে লাগিল। পরিশ্রমের পর যেরূপ সুনিদ্রা উপস্থিত হইত, তাহা আমার অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম রহিয়াছে। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী? আমার উত্তর এই—"যাহারা আপন হস্তে মৃত্তিকা কর্ষণ করে, ভূমণ্ডলে তাহারাই সুখী।"

অক্ষয়কুমার দত্ত।

সৎকথন ও সদাচার

১। কোন ব্যক্তি গ্রীস্-দেশীয় এরিষ্টটল-নামক জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"মহাশয়! অসত্য-কথনে উপকার কি?" এরিষ্টটল উত্তর দিলেন,—"এই উপকার যে, সত্য বলিলেও লোকে বিশ্বাস করে না।"

২। কোন ব্যক্তি স্পার্টা রাজ্যের অধীশ্বর এজেসিলস্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহারাজের বিবেচনায় বাল্যকালে কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা উচিত?" নৃপতি উত্তর করিলেন,—"যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, বাল্যকালে তাহাই শিক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা উচিত কর্ম্ম।"

৩। একদা এণ্টোনায়ইস্ পায়স্ নামে এক পরম দয়ালু সুশীল ব্যক্তি রোমক রাজ্যের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার সভাস্থ কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধ-বিষয়িণী জয়শ্রীলাভে সমুৎসুক করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন,—"সহস্র শত্রু নিধন করা অপেক্ষা একটি প্রজার প্রাণ রক্ষা আমার অধিক বাঞ্ছিত।"

৪। রোমক রাজ্যের অধিপতি টাইটস্ একদিন রাজ্যের কল্যাণকর কোন কর্ম্ম করেন নাই ইহা রজনীতে স্মরণ হওয়াতে তিনি পারিষদবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মিত্রগণ! আমি একটি দিন নষ্ট করিয়াছি।"

৫। ইংলণ্ডাধিপতি মহানুভব আল্‌ফ্রেডের তুল্য জ্ঞানবান্, দয়াবান্, উৎকৃষ্ট নৃপতি অতি দুর্লভ। তিনি সময়কে বহুমূল্য

সম্পত্তি বিবেচনা করিতেন ; এক মুহূর্ত্তও নিরর্থক ক্ষেপণ করিতেন না। তিনি অহোরাত্রকে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া, এক এক প্রকার কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ এক এক ভাগ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শরীরে প্রবল রোগ সত্ত্বেও তিনি আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম বিষয়ে বিংশতি দণ্ডের অধিক ক্ষেপণ করিতেন না ; অবশিষ্ট চল্লিশ দণ্ডের মধ্যে রাজ-কার্য্যে বিংশতি দণ্ড এবং লিখন, পঠন ও ঈশ্বরোপাসনায় বিংশতি দণ্ড ক্ষেপণ করিতেন। তিনি সময়কে সামান্য বস্তু জ্ঞান করিতেন না ; প্রত্যুত, এইরূপ বিবেচনা করিতেন,—পরমেশ্বর আমার হস্তে ঐ অমূল্য সম্পত্তি সমর্পণ করিয়াছেন ; অতএব তদর্থে আমাকে তাঁহার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

৬। লাইকর্গস্-নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রীস্ দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক ছিলেন। তথাকার এক দুর্বিনীত যুবা রাজবিদ্রোহী হইয়া তাঁহার এক চক্ষু উৎপাটন করাতে, নগরবাসীরা তাহাকে ধরিয়া, লাইকর্গসের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিল—"আপনি ইহাকে স্বেচ্ছানুরূপ শাস্তি প্রদান করুন।" লাইকর্গস্ তাহাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুশিক্ষিত ও সুবিনীত করিয়া নগর-নিবাসীদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন,—"যখন আমি তোমাদের নিকট এই ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তখন ইনি উগ্রস্বভাব ও পরদ্রোহী ছিলেন, এখন ইঁহাকে শান্ত ও সুজন করিয়া প্রত্যর্পণ করিতেছি।" তাহারা লাইকর্গসের এতাদৃশ অসামান্য সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

৭। গ্রীস্ দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী মেগারা নগরে ষ্টিপো নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন। যে সময়ে ডেমিট্রিয়স্ উল্লিখিত নগর

অধিকার করিয়া তদীয় ধন-দ্রব্যাদি অপহরণ করেন, তখন ঐ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"নগর লুণ্ঠন করাতে তোমার কি কিছু অপচয় হইয়াছে?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন,—"কিছুমাত্র হয় নাই। সংগ্রাম আমাদের ধর্ম্মও হরণ করিতে পারে না, এবং বিদ্যা ও বাক্‌পটুতাও নষ্ট করিতে পারে না; আমার সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে আছে; কারণ, উহা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে।"

৮। কোন নৃপতি কন্যা-শোকে সাতিশয় কাতর হওয়াতে, এক পণ্ডিত তাঁহাকে কহিলেন,—"কখন কোন শোকের বার্ত্তা জানে না, এই প্রকার তিনটি লোক যদি নিরূপণ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমার দুহিতাকে পুনর্জীবিতা করিয়া দিব।" নৃপতি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কুত্রাপি এরূপ লোক না পাইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

৯। এপিক্‌টিটস্-নামক গ্রীক্ জাতীয় পণ্ডিত প্রথমে একজন ধনাঢ্য রোমকের দাসত্ব-ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিলেন। দাসত্ব-মোচন হইলে পর, তিনি অত্যন্ত প্রাজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথায় ও কার্য্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না! যেরূপ উপদেশ দিতেন, নিজে তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। দাসত্বাবস্থায় তদীয় স্বামী এক দিবস অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার এক জঙ্ঘা ধরিয়া নোয়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার সহিষ্ণুতা-শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত উত্তরোত্তর অধিক বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সে সময় এপিক্‌টিটস্ কেবল এই কথাটি কহিয়াছিলেন,—"ইহাতে আমার জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া যাইবে।" বাস্তবিক তদীয় স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণে তাঁহার জঙ্ঘা ভগ্ন হইল।

তখন নিতান্ত শান্তস্বভাব এপিক্‌টিটস্‌ কহিলেন,—"আমি তো বলিয়াছিলাম, জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া যাইবে।" কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ সহিষ্ণুতা ধরণীতলে অতীব দুর্লভ!

১০। জগদ্বিখ্যাত স্যর আইজাক্‌ নিউটন্‌ আপনার অসামান্য বুদ্ধিবলে জ্যোতিষাদি বিবিধ বিদ্যার আত্যন্তিকী শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছিলেন,—"আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি; কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" সক্রেটিস্‌-নামক গ্রীস্‌-দেশীয় সর্ব্ব-প্রধান পণ্ডিত এই কথা বলিয়া গিয়াছেন,—"আমি কেবল এইটি নিশ্চিত জানি যে, আমি কিছুই জানি না।"

১১। সক্রেটিস্‌ প্রকৃত জ্ঞানী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি স্বদেশীয় কুরীতি-সংশোধন, স্বজাতীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম-নিরাকরণ ও বালকগণের সংশিক্ষা-সংশোধন-বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পণ্ডিতেরা আপনাদিগের ভ্রান্তি স্বীকার না করিয়া, সক্রেটিসের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিল; মিথ্যাপবাদ প্রচার দ্বারা অপরাপর লোকদিগকে তাঁহার বিপক্ষ করিয়া তুলিল এবং চক্রান্ত করিয়া, তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। তাহারা অমূলক অপবাদ দিয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ করিল এবং প্রাড়্‌বিবাকেরাও পক্ষপাত করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করিল। বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, তিনি প্রাড়্‌বিবাকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"এক্ষণে আমার প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত, আমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে যাই, তোমরা জীবন যাপন করিতে যাও; কিন্তু ইহার মধ্যে কাহার ভাগ্য ভাল, তাহা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যে জানে না।"

১২। তিনি প্রাণদণ্ড-বিষয়ক অনুমতি-প্রাপ্তির পর ত্রিশ দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। ঐ কয়েক দিবস তদীয় মিত্র ও শিষ্য সমুদায় সতত তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল ; তিনি অবিষণ্ণ-হৃদয়ে ও অম্লান-বদনে তাহাদের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া এবং জীবনান্ত পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া কালহরণ করিয়াছিলেন ; ক্ষণমাত্র বিষণ্ণ ছিলেন না, এবং অন্যকে তাঁহার নিমিত্ত শোকান্বিত দেখিলে হিতগর্ভ বচনে অনুযোগ করিতেন। 'নিরপরাধে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইল' এই কথা উল্লেখ করিয়া একজন শিষ্য সাতিশয় শোকাকুল-হৃদয়ে বিলাপ করিতেছিল। তাহা শুনিয়া সক্রেটিস্ কহিলেন,—"তোমার কি বাসনা, আমি সাপরাধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিব ?"

১৩। সক্রেটিসের মিত্রবর্গ মধ্যস্থ হইয়া তদীয় উদ্ধারের উপায় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাতে কোন মতেই সম্মত হন নাই। ক্রিটো নামে তাঁহার এক শিষ্য কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়া কারাগার হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়া দিবার মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিলেন। সক্রেটিস্ শুনিয়া কহিলেন,—"ক্রিটো! আমি এই সর্ব্বজনাধিগত অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তি পরিহারার্থে কোথায় পলায়ন করিব ?"

অক্ষয়কুমার দত্ত।

ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত

১৭৭৫ সালে স্কট্‌লণ্ডে ডেবিড হেয়ারের জন্ম হয়। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। কয়েক বৎসর ঘড়ীর কার্য্যে হেয়ার সাহেব ধনসঞ্চয় করত তাঁহার বন্ধু গ্রে সাহেবকে আপন কার্য্য অর্পণ করিলেন। প্রায় অধিকাংশ ইংরাজেরা এখানে আসিয়া ধন উপার্জ্জন করত স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এ দেশ অপেক্ষা স্বদেশ তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে প্রার্থনীয় আর এ দেশে থাকিবার কোন বন্ধন নাই। হেয়ার সাহেবেরও এখানে কোন বন্ধন ছিল না—বিলাতে তাঁহার মাতার ও ভ্রাতাদিগের পরিবার ছিল, কিন্তু তিনি সকল পার্থিব ভাব পরিত্যাগ করিয়া এ দেশে কি প্রকারে বিশেষরূপে পরোপকার করিতে পারেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভদ্র ভদ্র হিন্দুদিগের বাটীতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলন হয়, তাহাতেই উদ্যত হইলেন। কি নাচ, কি যাত্রা, কি কবি, কি আকড়াই, কি পাঁচালি, কি বুলবুলের লড়াই সকলেতেই হেয়ার সাহেব আহূত হইলে বসিয়া আমোদ করিতেন।

কিয়ৎ কাল বাবুদিগের সহবাসে হেয়ার সাহেব দেখিলেন যে, বাঙ্গালীদের মধ্যে বাঙ্গলা কি ইংরাজী কিছুই উত্তমরূপে অনুশীলিত হইতেছে না—স্থানে স্থানে যে পাঠশালা ছিল, তাহা দেখিয়া এই স্থির করিলেন যে, পাঠ্যপুস্তকের অভাব। ছাত্রেরা কেবল কিঞ্চিৎ

অঙ্কবিদ্যা, পত্র লেখা, জমাওয়াশীল বাকী, গুরুদক্ষিণা ও গঙ্গার বন্দনা শিখিতেছে, কিন্তু শুদ্ধলেখনে ও কথা কহিতে অক্ষম। ইংরাজীও সামান্যরূপে শিক্ষা হইতেছে, ভাল পুস্তক নাই, ভাল শিক্ষক নাই। এই অভাব সকল ক্রমে কিসে দূর হয়, এই চিন্তায় তিনি অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি ইঁহারা ঐ সময়ের বিজ্ঞলোক ছিলেন। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ স্যার হাইড ইষ্ট এতদ্দেশীয় লোকদিগের বড় হিতকারী ছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, এই নগরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় হইলে বাঙ্গালীদিগের উন্নতি হয়। স্যার হাইড ইষ্ট এই প্রস্তাব বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন, তুমি প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের নিকট যাইয়া এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা আমাকে আসিয়া বল। এই সংবাদ শুনিয়া হেয়ার সাহেব সকলের নিকট যাইয়া আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই জন্য সকলেই বৈদ্যনাথ বাবুর নিকটে ঐ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। পরে বৈদ্যনাথ বাবু স্যার হাইড ইষ্টের নিকটে আসিয়া তাঁহার প্রস্তাবে স্বদেশীয় প্রধান প্রধান লোকের সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর স্যার হাইড ইষ্টের বাটীতে কয়েক বৈঠকে এই ধার্য্য হইল যে, এতদ্দেশীয় বালকগণের শিক্ষার্থে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করা কর্ত্তব্য।

কলেজের নিয়মাদি কয়েক বৈঠকে ধার্য্য হইল। হেয়ার সাহেব উপস্থিত থাকিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করেন। হিন্দুকলেজ স্থাপন জন্য হেয়ার সাহেব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারীতে হিন্দুকলেজ

গরাণহাটা গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে স্যার হাইড ইষ্ট, হেরিংটন সাহেব ও হেয়ার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বাঙ্গালীদিগকে বৈদ্যনাথ বাবু বলিলেন—‘এই বিদ্যালয় এক্ষণে বীজস্বরূপ—পরে বৃটবৃক্ষের আকার ধারণ করত অনেককে স্বীয় ছায়া দ্বারা শীতলতা প্রদান করিবে।’

হেয়ার সাহেব হিন্দুকলেজে প্রতিদিবস আসিয়া তাহার উন্নতি-সাধন করিতে লাগিলেন। পটলডাঙ্গায় তাঁহার কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল, কলেজ-বাটীর জন্য তিনি তাহা দান করিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে হিন্দুকলেজের বাটী-নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়। এক বৎসরের মধ্যে বাটী প্রস্তুত হয় ও হেয়ার সাহেব কমিটীর অবৈতনিক মেম্বর হয়েন। হিন্দুকলেজের কার্য্য এইরূপে চলিতে লাগিল।

এদেশের হিতার্থে হেয়ার সাহেব কেবল হিন্দুকলেজে লিপ্ত ছিলেন না। ১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত হয়। এই সভার অভিপ্রায় যে, পাঠশালার জন্য ইংরাজী ও এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তক সকল প্রস্তুত হইয়া অল্প অথবা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে। এই সভার সভ্য কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছিলেন। পরে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, এই নগরে কতিপয় বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এজন্য ১লা সেপ্টেম্বর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে টাউনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। ঐ সভায় এই ধার্য্য হয় যে, কলিকাতা স্কুল সোসাইটী নামক এক সভা স্থাপিত হউক ও এই সভায় অভিপ্রায় এই যে, বঙ্গদেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তার জন্য যে সকল পাঠশালা আছে, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনানুসারে পাঠশালা সংস্থাপন আবশ্যক। আর,

এই সকল পাঠশালায় যে সকল ছাত্র বিখ্যাত হইবে, তাহাদিগকে উচ্চ-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা যাইবে। হেয়ার সাহেব উক্ত দুই সভারই সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতায় স্কুল সোসাইটীর সম্পাদক হইলেও সকল পাঠশালারই তত্ত্বাবধান করিতেন। যে পাঠশালা আড়পুলীতে ছিল, তথায় হেয়ার সাহেব অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। এই পাঠশালায় বিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভাষা শিখেন—প্রথমে কলা-পেতে পড়ো শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮২৩ সালে এই পাঠশালার নিকটে এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যে যে বালক পাঠশালাতে বিখ্যাত হইত, তাঁহারা ইংরাজী-বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত। সমস্ত নগর চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ডস্থ পাঠশালা সকল এক এক জনের অধীনে ছিল। তাঁহারা আপন আপন বাটীতে প্রধান প্রধান বালকদিগকে বৎসরের মধ্যে তিনবার পরীক্ষা করত তাহাদিগকে ও গুরুমহাশয়দিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতেন। প্রতিবৎসর, কলিকাতায় যত পাঠশালা ছিল, তাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে হইত এবং ঐ পরীক্ষা দ্বারা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে। এই বাৎসরিক পরীক্ষা-কালীন ফিমেল-সোসাইটীস্থ বালিকাদিগের পরীক্ষা হইত ও তাহাদের ব্যুৎপত্তি সকলের সন্তোষজনক হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় বালকেরা যে বঙ্গভাষা বিশেষ করিয়া শিক্ষা করেন, ইহাই হেয়ার সাহেবের বিশেষ লক্ষ ছিল। আড়পুলীর স্কুলে যাহারা প্রেরিত হইত, তাহারা পাঠশালায় প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া বঙ্গভাষা শিখিত। এইরূপ প্রথা হওয়ায় নিকটস্থ অন্যান্য পাঠশালায় বালকদিগের বঙ্গভাষায় অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। হেয়ার সাহেবের

তদারকের গুণে আড়পুলীর ছাত্রেরা বিখ্যাত হইয়া কেহ কেহ ইংরাজী স্কুলে ও কেহ কেহ হিন্দুকলেজে প্রেরিত হইত। যাহারা হিন্দুকলেজে যাইত, তাহারা প্রশংসাভাজন হইত। ১৮২০ সালে কলিকাতা জুভিনাইল সভা স্থাপিত হয়। এই সভার অধীনে শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটালীতে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক পুস্তক লেখেন ও ঐ পুস্তক উক্ত সভার দ্বারা প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বকালে স্ত্রীশিক্ষা এদেশে প্রচলিত ছিল। হেয়ার সাহেব বালিকাদিগের শিক্ষার্থেও অনুরাগী ছিলেন। ঐ বিষয়েও তিনি আপন অর্থ প্রদান করিতেন ও তাহাদিগের পরীক্ষাকালে উপস্থিত থাকিতেন। ডাক্তার কেরি ও মার্শমেন এক সভা করেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরামপুরের নিকটস্থ সকল স্থানে বঙ্গভাষারী অনুশীলন হইবে। হেয়ার সাহেব এই সভার ব্যয়ার্থ অর্থানুকূল্য করিতেন।

১৮৩০ সালে হিন্দুকলেজের ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশকরণার্থ এক সভা করিলেন। তাহাতে এই ধার্য্য হইল যে, হেয়ার সাহেব কায়িক পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে এ দেশের লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখা কর্ত্তব্য। এক প্রশংসাপত্র পার্চ্চমেণ্টে লিখিত হইয়া হেয়ার সাহেবকে প্রদত্ত হইলে তিনি এই বক্তৃতা করেন—

"এ দেশে আসিয়া দেখিলাম যে, এখানে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইতেছে—ভূমির উৎপাদিকা ও অর্থপ্রদা শক্তি অক্ষয়—লোকসকলও বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী এবং অন্যান্য সভ্যদেশের

লোকদিগের ন্যায় ক্ষমতাবান্, কিন্তু বহুকালাবধি কুশাসন ও প্রজা-পীড়ন হেতু এ দেশ একেবারে অজ্ঞানতায় আবৃত হইয়াছে। এ দেশের অবস্থা সংশোধন জন্য ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যে বীজ আমা কর্ত্তৃক বপিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বৃক্ষরূপে সপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে এবং তাহার সাক্ষী আমার চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে।"

হেয়ার সাহেব সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার আহার সামান্য ছিল—মদ্য-মাংসে রুচি ছিল না। তিনি বলিতেন, এ দেশের ঋষিরা মিতাহারী ছিলেন—এটি বড় উত্তম। এ দেশের মিঠাই, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মদ্‌গুর মৎস্য ভালবাসিতেন। প্রাতে তিন চারিখানি টোষ্ট দুইটী ডিমসিদ্ধ ও এক পিয়ালা চা খাইয়া বাহির হইতেন, রাত্রে সামান্য আহার করিতেন। তাঁহার আত্মা এক ভাবেই থাকিত—কি প্রকারে পরোপকারসাধন করিতে পারেন—এই তাঁহার ভাবনা—এই তাঁহার চিন্তা—এই তাঁহার তৃষ্ণা। প্রতিদিন দশটার মধ্যে পাল্‌কীতে ঔষধ ও পুস্তক পূরিয়া কলেজে আসিতেন। তাহার পর আপন স্কুলে যাইতেন। রেজিষ্টারী দেখিয়া যে যে বালক অনুপস্থিত, তাহাদিগের তালিকা করিতেন। পরে প্রত্যেক শ্রেণীতে যাইয়া প্রত্যেক বালক কেমন পড়িতেছে ও কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা শুনিতেন ও যাহাকে যে পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা দিতেন। তিনি মানব-স্বভাব ভাল বুঝিতেন ও যে বালকের যে দোষ, তাহা শীঘ্র অনুধাবন করিতে পারিতেন। যে বালকের যে যে বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকিত, তাহাকে প্রকারান্তরে যথাযোগ্য ঔষধ প্রদান করিতেন। কুপ্রবৃত্তি

বিনাশ করিয়া সুপ্রবৃত্তি-প্রদানে তাঁহার বিশেষ কৌশল ছিল। প্রত্যেক বালক বাটীতে কিরূপে সময় ক্ষেপণ করে ও কি প্রকার বালকের সহিত একত্রে থাকে ও পরিবারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, এই সকল সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতেন। বালকদিগের পিতা-মাতা কর্ত্তৃক যাহা না হইত, তাহা হেয়ার সাহেব করিতেন সকল বালকের সুপ্রবৃত্তি দর্শনে তাঁহার অকৃত্রিম আহ্লাদ জন্মিত কোন বালকের কুনীতি অথবা আলস্যের সংবাদ শুনিলে তাঁহার মর্ম্মবেদনা হইত। বালকদিগকে যেন স্বীয় মেষপাল জ্ঞান করিতেন —সকলেই সুপথে গমন করিতেছে, এই দর্শনে তাঁহার চিত্তে উল্লাস হইত। যে যে বালক অনুপস্থিত হইত, অনুপস্থিতির কারণ লোক দ্বারা অথবা তাহার বাটীতে আপনি গিয়া জানিতেন। বালকের পীড়া হইলে তাহার নিকট দিবারাত্রি আপনি বসিয়া ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিতেন। কদাচিৎ কাহারও পীড়ার সংবাদ না পাইলে বিরক্ত হইতেন। যে প্রকারেই হউক, পরোপকার করিতে পারিলেই আহ্লাদিত হইতেন। যে সকল বালক গ্রাসাচ্ছাদনবিহীন, তাহাদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দিয়া বিদ্যা শিক্ষা করাইতেন। যাহারা পুস্তকাদি অভাবে পড়িতে পারিত না, তাহাদিগকে পুস্তকাদি দিতেন। যাহারা লেখাপড়া শিখিয়া জীবিকার জন্য ব্যাকুল, তাহাদিগকে সুপারিস দ্বারা কর্ম্ম করিয়া দিতেন। তিনি পরদুঃখে দুঃখী, পরসুখে সুখী, দুঃখ দেখিলে দুঃখ বিমোচন করিতেন—এ জন্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করিতেন না। যদি কোন কারণ বশত আশুপ্রতীকারে অশক্ত, তত্রাচ দুঃখ-বিমোচনের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত। একদা এক স্বামিহীনা নারী পুত্রকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য তাঁহার

নিকট আসিল। হেয়ার সাহেব বলিলেন, ক্লাসে স্থান নাই। ঐ বিধবা স্ত্রীলোক দুঃখে অশ্রুপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল যিনি সামান্য দুঃখ দেখিলে কাতর হইতেন, তিনি যে দুঃখিনী স্বামিহীনার রোদনে অধিক কাতর হইবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? নিকটে একজন বাবু বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হেয়ার সাহেব ঐ দুঃখিনী নারীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ দুঃখিনী আপন কুটীর হইতে বাহির হইয়া পরিচয় দিল। হেয়ার সাহেব দুঃখে কাতর হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ অ দিয়া বলিলেন, 'তুমি রোদন করিও না, তোমার পুত্রের ভরণপোষণ ও অধ্যয়ন করাইবার ভার আমি লইলাম।'

এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। হেয়ার সাহেব সকল বালককে সমভাবে দেখিতেন—সকলের হিতার্থে সমান যত্ন করিতেন ও সকল বালক মনে করিত যে; আমাকে হেয়ার সাহেব যেমন ভালবাসেন, তেমন আর কাহাকেও ভালবাসেন না। মনের কার্য্য পরিমিত—তারতম্য হয়—সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি করিতে মন অক্ষম; কিন্তু আত্মার প্রকৃতি সমদর্শন—আত্মা যত মুক্ত, তত নির্বিশেষ শক্তি প্রকাশ করে।

দুঃখী-দরিদ্র বালকেরা অধিক দিন পাঠশালায় থাকিতে পারে না। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইবে, এজন্য তাহারা কেমন লেখে, তাহা প্রতিদিবস বৈকালে আপনি দৃষ্টি করতঃ লেখার দোষ দর্শাইতেন ও লেখা এইরূপ তদারকে সংশোধিত হইত।

হেয়ার সাহেব দুর্গোৎসবকালীন দুঃখী ও দরিদ্র বালক ও তাহাদিগের ভগিনী এবং মাতাদিগকে বস্ত্রাদি দিতেন। উৎসব কালীন কি ধনী, কি নির্ধন, সকলের বাটীতে তিনি গমন করিতেন,

এই জন্য আবাল-বৃদ্ধ, যুবা ও কুলনারীরা তাঁহাকে ভালরূপে জানিতেন। পটলডাঙ্গার স্কুলসোসাইটীর স্কুল যাহা হেয়ারস্কুল নামে এক্ষণে বিখ্যাত, ঐ স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠ্য-পুস্তকের ও কাগজ-কলমের ব্যয় হেয়ার সাহেব আপনি দিতেন। আড়পুলীতে যে পাঠশালা ছিল, তাহারও সমস্ত ব্যয় তিনি দিতেন। বাঙ্গালীদিগের হিতার্থে তিনি অন্যের নিকট ভিক্ষুক হয়েন ও আপনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। হিন্দুকলেজের দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাঁহার অনেক ভূমি ছিল, ঐ ভূমি বিক্রয় করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের মঙ্গলার্থে ব্যয় করেন। যখন তাঁহার হস্তে টাকা অল্প হইল, তখন তাঁহার চীনদেশীয় এক ধনী কুটুম্বের নিকট হইতে টাকা আনাইয়া ব্যয় করিতে লাগিলেন। ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি বড় পরহিতৈষী প্রযুক্ত হেয়ার সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়।

হেয়ার সাহেব যে সৎকর্ম্ম করিতেন, তাহা প্রশংসা পাইবার জন্য করিতেন না,—কেবল আত্মার সন্তোষার্থে করিতেন।

হেয়ার সাহেব মিতাহারী ছিলেন—রুটীতে মাখন দিয়া খাইতেন না। যেমন অন্তরে শান্ত ভাব, তেমনি শরীরে বিশেষ বল ছিল। তিনি গ্রে সাহেবের সহিত থাকিতেন। এক রাত্রে চা খাইতেছেন—ইতিমধ্যে একজন যুবকের সহিত পদব্রজে গমনের কথা উপস্থিত হইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন, 'তুমি আমার সহিত চানকে যাইতে পার ?' যুবক বলিলেন, 'হাঁ, পারি।' চানক কলিকাতা হইতে সাত ক্রোশ। হেয়ার সাহেব বলিলেন, 'আইস, দেখা যাউক।' দুই জনে উঠিলেন! কিছুকাল পরে দুই জনে ফিরিয়া আসিলেন। যুবক শ্রান্ত ও বীর্য্যহীন—আস্তে আস্তে আসিতেছেন। হেয়ার সাহেব সবল,—হেয়ার ষ্ট্রীটে আসিয়া

দৌড়িয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিবস হিন্দুকলেজের একজন ছাত্রের গাড়ী বাহিরে ছিল। একজন বলবান্ গোরা কোচ্‌মানসহিসের সঙ্গে বিবাদ করিয়া গাড়ী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কলেজের চাপরাসী, ব্রজবাসী দরোয়ান কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। ইতিমধ্যে হেয়ার সাহেব আসিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া তীরের ন্যায় গমন করত গোরাকে ধৃত করিয়া থানায় জিম্মা করিয়া দিলেন।

হেয়ার সাহেব পরদুঃখে অথবা ক্লেশে সর্ব্বদা কাতর হইতেন। এক দিবস হেয়ার সাহেব বাটীতে আছেন। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি শ্রাবণের ধারার ন্যায় পড়িতেছে। চন্দ্রশেখর দেব বাবু বৃষ্টিতে ভিজিয়া উপস্থিত। সাহেব আস্তেব্যস্তে তাঁহাকে এক বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া আপন হস্তে তাঁহার ধুতি ও চাদর নিংড়াইয়া শুকাইতে দিলেন। রাত্রি অধিক হইলে বৃষ্টি ধরিয়া গেল। চন্দ্রশেখরকে সন্দেশ আনাইয়া খাওয়াইয়া আপনি এক বৃহৎ যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। চুনাগলির নিকট আসিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, 'এই স্থানে মাতোয়ালা গোরা থাকে, হয় ত তোমার জন্য তাহাদিগের সহিত হাতাহাতি করিতে হইবে।' পরে তাঁহারা নিরুদ্বেগে সে স্থান হইতে গমন করিলেন।

হেয়ার সাহেব যখন দেখিলেন যে, বাঙ্গালীরা ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় উন্নত হইয়াছে, তখন তাহারা ব্যবসা-উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিখ্যাত হয়, এই তাঁহার বাসনা হইতে লাগিল। ঐ সময়ে লর্ড আকলেণ্ড গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি বড় আনুকূল্য করিতেন। হেয়ার সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইতেন। ঐ সময়ে কলিকাতায় একটি মেডিকেল

কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু এই সন্দেহ হইতে লাগিল যে, হিন্দু বালক মৃতদেহ স্পর্শ করিতে কোন আপত্তি করিবে কি না। এক দিবস হেয়ার সাহেব বসিয়া আছেন, মধুসূদন গুপ্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। ত্রস্তেব্যস্তে হেয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—'হিন্দুধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের নিকট হইতে কোন আপত্তি হইবে কি ?' মধুসূদন বলিলেন, 'যদি তাঁহারা বাধা দেন, তবে পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে পরাজয় করিবেন।' হেয়ার সাহেব বলিলেন, 'আমি আহ্লাদিত হইলাম, কল্যই লর্ড আকলেণ্ডের নিকট যাইব।' ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। কিছু কাল পরে ডাক্তার ব্রাম্‌লি বক্তৃতা করেন, "হেয়ার সাহেবের উৎসাহ ও সাহায্যে কলেজ অনেক উপকৃত। কলেজ স্থাপিত হইবার অগ্রে হেয়ার সাহেব আপন সৎচিত্তের ভাবে গলিত হইয়া ইহার হিতসাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তিনি উপদেশ দেওনকালীন সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যদিগের সদ্ভাব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমার এক একবার বোধ হইত যে, কলেজ থাকা ভার; কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য, শান্ত গুণ ও পরিশ্রম জন্য কলেজ রক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ হেয়ার সাহেবের সাহায্য ব্যতিরেকে এ কলেজ স্থাপন করা যাইত না, এজন্য তাঁহার নিকট সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে মেডিকেল কলেজে অনেক ছাত্র ভর্ত্তি হয়। ঐ সকল ছাত্র তাঁহার বশীভূত ছিল; সুতরাং তাহাদিগের দৃষ্টান্তে অন্যান্য বালক তাহাদিগের ন্যায় চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল হেয়ার সাহেব কলেজের সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর কলেজ কাউন্‌সেলের অনরেরী মেম্বর হন।

মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়াবধি হেয়ার সাহেব তথায় প্রতিদিন যাইতেন। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যেরূপ তদারক করিতেন, মেডিকেল কলেজের বালকদিগেরও সেইরূপ তদারক করিতে লাগিলেন। আর হস্‌পিটালে যাইয়া প্রতেক রোগী কিরূপ আছে, ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছে কি না—বা পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে, এ সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া যথাসাধ্য প্রতীকার করিতেন। সকলের পথ্য ও অন্যান্য বিষয় যাহা জানিবার আবশ্যক হইত, তাহা জানিয়া রোগীদিগকে আরামে রাখিবার জন্য সম্যক্‌রূপে চেষ্টিত হইতেন। যাঁহার চিত্ত পরোপকারে রত, তাঁহার সকল কার্য্য পরদুঃখবিমোচন ও পরসুখবিবর্দ্ধন জন্য হইয়া থাকে।

১৮৩৪ সালে হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষেরা কলেজের নিকট বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষার্থে এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। পাঠশালা-গৃহের ভিত্তিস্থাপনের দিবস অনেকে উপস্থিত থাকেন। সকলে হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থে তাঁহাকে প্রস্তর স্থাপন করিতে আহ্বান করেন। তৎকালে তিনি এক বক্তৃতা করেন, পরিশেষে জজ রাইন তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

যে প্রকারেই হউক, এ দেশের মঙ্গলসাধনে হেয়ার সাহেব কখনই ভ্রান্ত হইতেন না। পূর্ব্বে সংবাদপত্রে সকল বিষয় সাহস পূর্ব্বক লিখিত হইত না। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে লিখিলে লোকের নামে অভিযোগ হইত, আর কোন বিষয় বিবেচনার্থে প্রকাশ্য সভা হইত না। এইরূপ নিয়মে সাধারণ লোকেরা আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইত—ইহাতে দেশের অমঙ্গল ব্যতিরেকে মঙ্গল সম্ভব হয় না। এই দুই নিয়ম উঠাইয়া দিবার জন্য ও পার্লিয়ামেণ্টকে এ দেশের চার্টর বিষয়ে এক দরখাস্ত

করিবার জন্য ১৮৩৫ সালে ৩রা জানুয়ারীতে টাউনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। হেয়ার সাহেব উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“সভ্যগণ! যখন আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করি ও দেখি, এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যতাসাধন করিতেছেন, তখন বোধ হয় যে, এই দিন ভারতবর্ষের গৌরবের ও সৌভাগ্যের দিবস।”

১৮৩৫ সালে মরিচ দ্বীপে এ দেশ হইতে কুলী পাঠান আরম্ভ হয়। যে সকল কুলীর গমনে ইচ্ছা ছিল না, তাহারা ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা প্রেরিত হইত। পটলডাঙ্গার এক বাটীতে অনেক কুলী বদ্ধ ছিল। হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে খালাস করিয়া দিলেন। কুলীরা হেয়ার সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপ অহরহ অনেক পরোপকার হেয়ার সাহেবের দ্বারা কৃত হইত।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মে মাসের ৩১শে তারিখে রাত্রে হেয়ার সাহেবের ওলাউঠা হয়। আপন সর্দ্দার বেহারাকে বলিলেন, ‘গ্রে সাহেবকে বল, আমি বাঁচিব না—আমার জন্য কফিন প্রস্তুত করিতে কহ।’ পরদিবস বেলেস্তারার জ্বালা না সহিতে পারিয়া বলিলেন—‘আমাকে আরামে মরিতে দেও।’ কিছুকাল পরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কলিকাতার সমস্ত লোক শোকান্বিত হইল। সহস্র সহস্র চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল—কেহ বিলাপে কাতর,—কেহ নিস্তব্ধভাবে অন্তরে রোরুদ্যমান—কেহ তাঁহার গুণবর্ণনে গলিত—কেহ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে ভারাক্রান্ত—কেহ যেন পিতৃশোক—কেহ যেন মাতৃশোক,—কেহ যেন ভ্রাতৃশোক—

কেহ যেন অকৃত্রিম বন্ধুশোকে ব্যাকুল। অঙ্গনাদিগের হৃদয় কোমল—তাঁহারা প্রপীড়িতা হইয়া দুঃখে মগ্ন হইলেন। বালক-দিগের নয়নে অন্তরের শোক প্রকাশ হইল।

হেয়ার সাহেবের মৃত্যু গ্রে সাহেবের বাটীতে হয়—মৃত্যুসংবাদ প্রচার হইলে ঐ বাটী লোকে পূর্ণ হইল। হেয়ার সাহেবের দেহ স্বাভাবিকভাবে আচ্ছাদিত—কফিনে স্থাপিত—বদন শীতল ও শান্ত—নয়ন মুদিত—বালক ও যুবক নিকটে যাইয়া প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার বদনস্পর্শ পূর্ব্বক অনিবার্য্য কাতরতায় বিগলিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুনে ভারী দুর্য্যোগ হয়—বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে—আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন—রাস্তা সকল জলে সিক্ত, তথাচ লোকারণ্য হইল—মৃতদেহের সঙ্গে ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার লোক চলিল—গাড়ীতে রাস্তা পূর্ণ—কয়েকখানা কৃষ্ণবর্ণ শোক-চিহ্নিত গাড়ীতে ছোট ছোট বালক আরূঢ় হইল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐ মহাত্মার সমাধি হইল। সমাধি হিন্দুকলেজের সম্মুখে হইয়াছিল। তাহার উপর যে কবর নির্ম্মিত হয়, তাহার ব্যয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক এক টাকা চাঁদা দিয়া নির্ব্বাহ করে। চাঁদা এত হইল যে, কতক চাঁদা আদায়করণ আবশ্যক হইল না।

কিয়ৎকাল পরে এক প্রকাশ্য সভাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার স্কুলের নিকট প্রকাশ্যরূপে স্থাপিত হইয়াছে।

হেয়ার সাহেব এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকারী, এ জন্য তাঁহার স্মরণ ও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশার্থে বৎসর বৎসর ১লা জুন তারিখে এক সভা হয় ও ঐ বৈঠকে বক্তৃতা হইয়া থাকে।

হেয়ার সাহেবের জীবনপাঠে কে না উন্নতভাবে স্থির হইবে? যে ব্যক্তি নিষ্কামচিত্তে আপন বল, বুদ্ধি ও অর্থ—আপনার জীবন—পরোপকারার্থে—পরসুখার্থে—অর্পণ করিয়াছিলেন—যিনি আপনার সুখ অন্বেষণ করেন নাই—ও যাঁহার কোন পার্থিব বাসনা ছিল না, তিনি দেবভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কে না স্বীকার করিবে? জগদীশ্বর আমাদিগকে এই কৃপা করুন যে, হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।

প্যারীচাঁদ মিত্র

কাজ করা

অনেক কালের কথা মনে হইল—আমার সমাধ্যায়ী কোন ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন—"ও হে! যদি সত্য সত্যই ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিতে চাও, তবে, আমি যেমন করিয়াছি তেমনি কর—ইংরাজি পড়, ইংরাজি লেখ, ইংরাজিতে কথা কহ, ইংরাজিতে চিন্তা কর এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখিতেও শিখ।" যিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন তিনি, আমরা যে শ্রেণীতে পড়িতাম, তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। আমি ইংরাজি বহি পড়িতাম এবং ইংরাজিতেই পত্রাদি লিখিতাম বটে, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন অপর কাহার সহিত, ইংরাজিতে কথা কহিতাম না। আর ইংরাজিতে চিন্তা করিবার নিমিত্ত ত কখনই চেষ্টা করি নাই—প্রত্যুত যদি চিন্তাকালীন পাপড়ি ভাঙ্গা ইংরাজি গৎ মনে হইতেছে জানিতে পারিতাম—তৎক্ষণাৎ নিজ মাতৃভাষায় সেই ভাবগুলির পুনরালোচনা করিয়া বুঝিতাম, ভাবগুলি যথাযথ কি না। এইরূপ করায় ইংরাজিতে চিন্তা করা এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখা আমার ভাগ্যে কখনই ঘটে নাই।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজকর্ম্ম ইংরাজিতেই করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ইংরাজিতে চিন্তন অভ্যাস না করায় ইংরাজি লেখায় আমার বড়ই কষ্টানুভব হইত, এবং যাহা ইংরাজিতে লিখিলাম তাহা বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহাতে অনর্থক শব্দবিন্যাস রহিল কি না, কোন কথা যেরূপে লিখিলাম সেই কথা তদপেক্ষা সংক্ষেপে

এবং বিশদরূপে লেখা যায় কি না; এই সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া দেখিতে হইত,—সুতরাং ইংরাজি লেখা আমার তেমন শীঘ্র সরিত না। অন্যে এমন কি আমা হইতে যাঁহারা অল্প ইংরাজি জানেন তাঁহারাও যত শীঘ্র ইংরাজি লিখিয়া যাইতে পারেন; আমি কখনই তাহা পারি নাই। ইংরাজি লিখিতে আমার বিলম্ব হয়, এবং কাগজে অনেক কাট কুট হয়।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজকর্ম্মই ইংরাজিতে করিতে হইয়াছে, অনেক বড় বড় চিঠি এবং রিপোর্ট ইংরাজিতে লিখিতে হইয়াছে, প্রতিদিন গড়ে ৫০।৬০ খানি পত্রের জবাব ইংরাজিতে দিতে হইয়াছে, এবং অন্যের লিখিত ইংরাজির দোষ সংশোধন করিয়া অনেক স্থলেই লইতে হইয়াছে। কিন্তু আমি শীঘ্র শীঘ্র ইংরাজি লিখিতে পারি না। ইংরাজিতে চিন্তা করিবার অনভ্যাস রূপ মহৎ অন্তরায় সত্ত্বেও যেমনরূপে ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম, এবং ঐ সকল কাজ ভাল করিয়াছি বলিয়া প্রশংসা লাভও করিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে অপর একটী কথা বলিয়া রাখি আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যিনি যখন আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, যতই কেন কাজ হাতে থাকুক না, আমি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহাদের সহিত বসিয়া বাক্যালাপ করিতাম। অনেক কাজ পড়িয়া আছে বলিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্কতা বা চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতাম না। তাঁহাদের কাহাকেও পাইলে কাজকর্ম্ম একেবারে ভুলিয়া গিয়া আলাপ করিতাম। তাঁহারা জানিতেন, এত কাজ থাকিতেও যে ওরূপে সময়াতিপাত করিতে পারি তাহার কারণ কার্য্যে লঘুহস্ততা।

ফলকথা, তাহা নহে। আদৌ কোন বিষয়েই আমার ক্ষিপ্রকারিতা গুণ নাই। ক্রমে বহুকালের অভ্যাস বশতঃ কোন কোন বিষয়ে একটু লঘুহস্ততা জন্মিয়াছে বটে—কিন্তু সে সামান্য বিষয়ে এবং অতি সামান্য মাত্রায় এবং ইংরাজি লেখায় কিছুমাত্র নহে।

তবে ইংরাজিতে এত কাজ কেমন করিয়া করিতাম ?' কাজে অনেক সময় দিতাম। এত সময় কোথা হইতে পাইতাম? এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথাও বলিবার পূর্ব্বে আর কয়েকটী কথা বলিয়া রাখি। আমি কাজকর্ম্মে বিশেষ আনন্দলাভ করিতাম। আমি কখনই মনে করিতাম না যে পরের কাজ করিতেছি। যাহা কারতেছি, তাহা আপনারই কাজ। কৈফিয়ৎ দিতে হইলে পাছে পরের কাজ বোধ হইয়া যায় এবং আনন্দের ক্রটি হয়, এইজন্য যাহাতে কৈফিয়ৎ দিতে না হয়, এমন করিয়াই কাজ করিতাম। ইংরাজ মনিবের কাছে কাজ করিয়া মনের এই ভাব রক্ষা করা বড়ই কঠিন। উঁহারা প্রায়ই দেশীয় লোকের মনের তাদৃশ ভাব রক্ষা করিতে দেন না। এতই মনিবানা ফলান যে, কাজটী তাঁহাদিগের, আমরা তাঁহাদিগেরই অনুজ্ঞাপালক চাকর মাত্র, এই ভাবটী ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ঐ বিষয়ে সাবধান হইতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই হউক, অথবা শুভাদৃষ্ট বশতঃই হউক, আমি কখন ঐরূপ দুর্ভাগ্যে পড়ি নাই। আমার কাজ চিরকালই আমার নিজের কাজ এবং স্বদেশের কাজ ছিল।

আর একটী কথা এই। বাল্যাবধি আমার সংস্কার যে, ভোগে প্রকৃত সুখ নাই, কর্ম্ম সম্পাদন করাতেই সুখ। কেমন করিয়া এই

সংস্কার হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র মনে পড়ে, পিতৃঠাকুর আমার পঠদ্দশায় সর্ব্বদা বলিতেন, "ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ," আর আমার বয়ঃপ্রাপ্তির পর, দীক্ষাগ্রহণ হইলে প্রতি প্রত্যুষে অন্ততঃ একবার করিয়া বলিতাম "যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্"—আমার দৃঢ় বিশ্বাসও তাই, একাগ্রচিত্তে কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত পরিশ্রম করাই প্রকৃত পূজা। এখন কাজ করিবার নিমিত্ত আমার সময় সংগ্রহ কিরূপে হইত তাহা বলি।

(১) আমি দ্রব্যাদি সমস্ত এবং কাগজ পত্রাদি বেশ গুছাইয়া রাখিতে জানি—কাগজটী, কলমটী, কালির দোয়াতটী এবং যে সকল পত্রের উত্তর লিখিতে হইবে সেগুলি যথাস্থানেই থাকে—ওগুলি খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার সময় যায় না।

(২) আমি ইংরাজি পুস্তকাদিতে যাহা যাহা পড়িতাম, মনে মনে তাঁহা মাতৃভাষায় অনুবাদ না করিয়া ছাড়িতাম না। সুতরাং কোন্ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করা বিধেয়, তাহার অনেকটা স্থির থাকিত। অভিমতি স্থির করিবার নিমিত্ত আমার অল্প সময়ই যাইত। কয়েকখানি পুস্তক ভিন্ন, ইংরাজি বইগুলিতে এত শব্দের আধিক্য এবং পৌনরুক্তের বাহুল্য যে, মাতৃভাষায় তাহাদিগের মানসিক অনুবাদ করা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপে একবার ঝাড়িয়া না লইলে তুঁষের ভাগ অধিক এবং তণ্ডুলের ভাগ নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে। ফলতঃ মাতৃভাষায় অনুবাদরূপ শূর্প দ্বারা ইংরাজি গ্রন্থগুলিকে ঝাড়িয়া লইবার পরামর্শ আমি সকল ইংরাজি পাঠককেই দিতেছি।

(৩) আমি কথনই ইংরাজির শব্দবিন্যাস-পারিপাট্য লিখিবার জন্য ভাল ভাল ইংরাজি শব্দ বা ইংরাজি গৎ অভ্যাস করি নাই।

ইহাতে উপকার কি অনুপকার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তবে ইংরাজি শব্দ-বিন্যাসের উপর কিছুমাত্র নেসা না থাকায় কাজের সময়, অর্থাৎ পত্রাদি লিখিবার সময়, শব্দ খুঁজিতে আমার অল্প সময় যাইত, এ কথা বলিতে পারি।

উপরের (২) এবং (৩) চিহ্নিত কথাগুলির দ্বারা আমার বক্তব্য এই যে, কোন বিষয়ে কি বলিতে বা করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া লওয়ার পক্ষে অভ্যস্ত ইংরাজি শব্দ এবং ইংরাজি গৎরূপ যে বিষম অন্তরায় আছে আমার সে অন্তরায় ছিল না, এবং সেই জন্য মতলব স্থির করিতে অল্পসময়ই যাইত। কেমন করিয়া মতলবটা প্রকাশ করিব—ইহা লইয়াই যত কষ্ট এবং যত মারামারি। সেই মারামারি করিবার সময়, অনেকটা নিদ্রা হইতে, কতকটা ভোজন হইতে এবং একটু আধটুকু পরিজনদিগের সহিত আলাপের কাল হইতে, সংগ্রহ করিতাম। তদ্ভিন্ন, আমাকে ত ঘরের কোন খুটি নাটি লইয়া বিব্রত হইতে হইত না, সে জন্যও অনেকটা সময় পাইতাম। এইরূপে সময়ের সংগ্রহ করিয়া ধীরে সুস্থে বসিয়া আস্তে আস্তে ইংরাজি লিখিতাম—কি লিখিতাম তাহা মনে মনে আর একজন হইয়া, প্রায়ই নিজের প্রতিপক্ষ পক্ষ হইয়া, পড়িতাম। সেই কল্পিত প্রতিপক্ষের চক্ষু দিয়া ভুল ধরিতাম—আপনার চক্ষু দিয়া ভুল সুধরাইতাম—যথেষ্ট কাটকুট হইত—কোন কোন পত্রাদি ফিরাইয়া ফিরাইয়া দুই তিন বার করিয়া লিখিতে হইত।

একবার কোন সুদূর স্থানে গিয়াছিলাম। বটীতে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি কাগজপত্র জমা হইয়া আছে। অমনি কাগজগুলি লইয়া বসিলাম। পড়িতে পড়িতে যেগুলির জবাব তদ্দণ্ডে দেওয়া যাইতে পারে বোধ হইল, সেগুলির একটী স্বতন্ত্র

তাড়া করিলাম, যেগুলির উত্তর বিশেষ ভাবিয়া অথবা অন্য কাগজ পত্র দেখিয়া দিতে হইবে বোধ হইল, তাহা দ্বিতীয় তাড়াবন্দি করলাম। প্রথম গুলির উত্তর লিখিলাম। যতক্ষণ সে কাজটী শেষ না হইল, ততক্ষণ উঠিলাম না।

"অনেক বেলা হইয়াছে—খাওয়া দাওয়ার পর কাগজপত্র লইয়া বসিলেই ভাল হয়।"

"তা ত হয় কিন্তু ঐ কাগজের মোট বিদায় না হইলে ত খাইতে বসিয়া কোন সুখ হইবে না"—বাটীর ভিতরে এরূপ কথোপকথন প্রায়ই শুনিতে পাইতাম।

"আজি বিকালে অমুক আসিবার সম্ভাবনা আছে; কতকটা কাজ বাকি রহিয়াছে, না সারিয়া রাখিলে কথোপকথনের সুখোপভোগ হইবে না; তোমারও যদি কোন কাজ বাকি থাকে তাহা এই সময়ে সারিয়া লও।" * * "রাত দুপুরে বসে ও কি হচ্চে?—খাওয়া নাই, ঘুম নাই—অসুখ করিবে।"

"না অসুখ হবে না, আমি ত একবার ঘুমাইয়াছিলাম; আর এইটা না লিখিলেই নয়—কালি না পাঠাইতে পারিলে—"

"কি হবে?"

"একটু বাহাদুরির ত্রুটি।"

"হউক গে।"

সে রাত্রিতে কিছুই লেখা হইল না সত্য, কিন্তু অন্যান্য রাত্রিতে হইত।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ভাই ভগিনী

ভাই ভগিনীর সম্বন্ধটী বড় সুমিষ্ট। শৈশব হইতে একত্রে থাকা, একত্রে শিক্ষালাভ, একত্রে সুখ দুঃখ ভোগ, এই সকল কারণে ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে একটি গূঢ়রূপ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা থাকিলেও, তাহাতে ঈর্ষ্যা থাকে না। পরস্পরের মধ্যে সাহায্যদান থাকিলেও অহঙ্কার থাকে না; পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ থাকিলেও আত্মগ্লানি থাকে না। ভাই-ভগিনীদের সম্বন্ধটী মূলতঃ সাম্যসম্বন্ধ এবং সকল অবস্থাতেই ঐ সাম্যভাবটী উহাদিগের মনোমধ্যে জাগরূক থাকে। উহাদিগের মধ্যে কালক্রমে যিনি যত ছোট হউন, কখনই তাঁহার অন্তর্ভূত সাম্য-ভাবটী একেবারে অপনীত হইয়া যায় না। আমরা এক বাপ-মায়ের ছেলে, ভাই ভগিনীরা কখনই এই তথ্যটী ভুলিতে পারে না এবং যাহারা ঐ তথ্যটী বিশিষ্টরূপেই স্মরণ রাখিতে পারে, তাহারাই পরস্পরের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিতে পারে।

ঐ সূত্রটী স্মরণ থাকিলে এবং উহার অনুযায়ী কার্য্য করিলে যে, ভাই-ভগিনীরাই আপনাপন কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া পরস্পরের ধর্ম্মবৃদ্ধি করিতে পারে তাহাই নহে; ঐ সূত্রই উহাদিগের পরস্পর কর্ত্তব্যাবধারণের পথ। ঐটী মনে রাখিয়া চলিতে পারিলে, পিতা-মাতাও উহাদিগের পক্ষে ধার্য্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনাদের করণীয় সুনির্ব্বাহিত করিতে পারেন। আপনাদিগের সন্তান

সন্ততির মধ্যে পরস্পর সাম্যভাব উদ্রিক্ত হইলেই তাঁহাদিগের পক্ষে উচিত হয়; অতএব শৈশব হইতেই ঐ সাম্যভাবের বীজ তাহাদিগের হৃদয়ে বপন করা কর্ত্তব্য।

এই কাজটী সুসম্পন্ন হইবার কয়েকটী অন্তরায় আছে। এক অন্তরায় কন্যা-পুত্রের ইতর বিশেষ। যিনি যাহা বলুন, সকল সমাজেই ঐ পার্থক্য আছে এবং তাহা থাকিবার যথেষ্ট কারণও আছে। অপর কোন কারণের এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে এই মাত্র বলিব যে, একটী প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই, কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানের জীবনীশক্তি শৈশবে অধিকতর ক্ষীণা থাকে। সুতিকাগারে অনেক ছেলে মারা যায়—কিন্তু কন্যা সন্তান দুইটীর স্থলে পুত্রসন্তান পাঁচটী মারা যায়; আর পঞ্চমবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যাসন্তান ছয়টী স্থানে পুত্রসন্তান আটটী মারা যায়; আর দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যাসন্তান দশটীর স্থানে পুত্রসন্তান চৌদ্দটী মারা যায়, আর ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যাসন্তান চৌদ্দটীর স্থানে পুত্রসন্তান পনরটী মারা যায়। ষোল সতর বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পুত্রের জীবন কন্যার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়ায়। এই নৈসর্গিক নিয়মের অনুযায়ী হইয়াই সকল সমাজে কন্যার অপেক্ষা শৈশবে পুত্রের প্রতিপালন যত্ন কিছু অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আধিক্য নিবন্ধন কন্যাদিগের হৃদয়ে যে বিশেষ ঈর্ষ্যা জন্মে তাহা বোধ হয় না। কন্যাদিগের ধীশক্তি পুত্রদিগের ধীশক্তি অপেক্ষায় অধিক শীঘ্র পরিস্ফুট হয়, এবং যাহার ধীশক্তি পরিস্ফুট হয়, সে স্বভাবভেদে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করিতে বা মুরব্বি-আনা করিতে ভালবাসে। আমি ইংরাজের বাটীতে ইংরাজের ছেলেদের মধ্যেই দেখিয়াছি, পাঁচ বৎসরের বালিকা সাত বৎসর বয়সের জ্যেষ্ঠ

ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহশীলা হইয়া তাহাকে খাবার বাটিয়া দিতেছে এবং আপনি ভ্রাতার অপেক্ষা অল্পভাগ লইতেছে! স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রথমে কন্যাসন্তান হওয়া ভাল, তাহার পরে পুত্র। কন্যা অতি অল্পবয়সেই অন্যের যত্ন করিতে পারে। ফলকথা, কন্যাসন্তানের অপেক্ষা পুত্রসন্তানের একটু বেশী যত্ন হইলেই যে উহাদিগের মধ্যে সাম্যভাব উদ্রেকের বিশেষ ব্যাঘাত হয়, তাহা নহে।

ছোট ছেলের এবং ডাগর ছেলের মধ্যেও একটু ইতর বিশেষ হয়। ছোটকে আগে খাওয়াইতে হইবে, সে আবদার করিলে তাহাকে আগে ভুলাইয়া শান্ত করিতে হইবে, তাহার খেলনাটি বিশেষ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে, তাহারটী হারাইয়া গেলে বড়রটী লইয়া তাহাকে দিতে হইবে, সে অধিকক্ষণ কোলে পিঠে থাকিবে। এইরূপ ইতর বিশেষেও ছেলেদের মধ্যে যে সাম্যভাবের সংস্থাপন আবশ্যক তাহার বিঘ্ন হয় না। ছেলেরা সত্য সত্যই তত নির্ব্বোধ নয়। উহারা বেশ বুঝিতে পারে যে, ছোট এবং দুর্ব্বল এবং অক্ষমদিগের প্রতি একটু অধিক যত্নের প্রয়োজন এবং উহারা নিজেও সেই যত্ন করিবার জন্য বিলক্ষণ আগ্রহশীল হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ অমন সকল স্থলে সাম্যভাব প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করা অনৈসর্গিক, অনাবশ্যক, অসাধ্য এবং হানিকর। বাপ মা ঐ সকল বৈসাম্য রক্ষা করুন। ও সকল বৈসাম্যের হেতু অতি সুস্পষ্ট এবং শিশুদিগেরও বোধগম্য, কিন্তু বাপ মা যেন সত্য সত্যই একটী ছেলেকে বেশী এবং অপর একটীকে কম ভাল না বাসেন—অর্থাৎ ছেলেদের মধ্যে অহেতুক কোন ইতর বিশেষ না করেন। তাহা করিলেই স্ব স্ব সন্তানদিগের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা জন্মিয়া যাইবে এবং

সে ঈর্ষ্যা যাবজ্জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইবে না। কিন্তু সহেতুক বৈসাম্যেও কোন কোন স্থলে দোষ হয়। যদি একটী ছেলে অন্য ছেলেদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর বলিয়া বাপ মায়ের আদুরে হয়, তবে অপর সকল ছেলেই তাহার প্রতি বিদ্বেষ করে। যদি একটী অধিক বুদ্ধিমান মেধাবী এবং আবিষ্ট বলিয়া বিশেষ সমাদর পায়, তাহা হইলেও ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়, কিন্তু সে ঈর্ষ্যা প্রবলা হয় না এবং বয়োধিকে তাহা একেবারেই অন্তর্হিত হয়। যদি অনেকগুলি কন্যাসন্তানের পর একটী পুত্রসন্তান হয় অথবা অনেকগুলি পুত্র জন্মিবার পর একটী কন্যা জন্মে, তবে তাদৃশ পুত্র বা কন্যা কিছু বেশী আদরের সামগ্রী হইয়া উঠে—এবং সে রূপ হইলে ভাই ভগিনীর মধ্যে কিছু ঈর্ষ্যার উত্তেজনা করে, কিন্তু সে ঈর্ষ্যা অতি প্রবলা হইয়া চরিত্র দূষিত করে না। পিতামাতা যত দূর পারেন, এই সকল সহেতুক বৈসাম্যজনিত ঈর্ষ্যার কারণ নিবারণ করিয়া চলিবেন; আর পুনর্ব্বার বলি, অহেতুক বৈসাম্য কোন মতেই হইতে দিবেন না। আমাদের দেশে একটা উপধর্ম্মমূলক বৈসাম্য আছে—সেটা বিশেষ যত্ন সহকারে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যে সময়ে পিতা-মাতার কোন বিশেষ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে যে সন্তান জন্মে, তাহার প্রতি একটু বিশেষ অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা হইয়া থাকে এবং পিতামাতার তাদৃশ আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যের ভুক্তভোগী সন্তান প্রায়ই দুর্ব্বল বা কঠিন প্রকৃতিক হইয়া পড়ে। তাদৃশ সন্তান ভাইভগিনীর প্রতি সমীচীন ব্যবহারে কদাপি সমর্থ হয় না। এই 'পয়া' 'অপয়া' কথা দুইটীতে অনেক সুখ নষ্ট এবং অসুখের বৃদ্ধি করিয়াছে—সহর অঞ্চলে ও শব্দটার তেমন প্রাদুর্ভাব নাই; কিন্তু পল্লীগ্রামে উহাদিগের প্রাদুর্ভাব

অত্যধিক। এই সকল স্থলে পিতা-মাতা একটু সতর্ক হইয়া চলিলে এবং সন্তানগুলিকে পরস্পর সাহায্যদানে উন্মুখ করিয়া তুলিলে গৃহবাসের সুখ বিশিষ্টরূপেই বর্দ্ধিত হয়। বড়-ভাই, বড় ভগিনী, ছোট ভাই-ভগিনীদিগকে কাপড় পরাইয়া দিবে, খাওয়াইবে, মুখ হাত ধুইয়া দিবে, তাহাদের জুতা, কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিবে, খেলনা সাজাইয়া দিবে, তাহাদিগকে লইয়া খেলা করিবে—এইরূপ হইলে পিতা-মাতার বিশেষ আনন্দ জন্মে এবং ছেলেদের মধ্যেও সৌভ্রাত্রভাব সুসম্বদ্ধ হয়। আমার বিবেচনায় বড়দিগের মধ্যে ছোটদিগের কাজ কর্ম্ম ভাগাভাগী করিয়া দেওয়া ভাল নয়। মনে কর, যেন কোন গৃহস্থের ক, খ, গ তিনটী কন্যা এবং চ, ছ দুইটী পুত্র আছে। ক, চয়ের কাজগুলি করিবে এবং খ, ছয়ের কাজগুলি করিবে, এবং তাহা করিয়া ক, চকে এবং খ, ছকে আপনাপন ভাগে বুঝিবে, এরূপ ব্যবস্থা ভাল নয়। ক, সকলের জ্যেষ্ঠা, সে গ এবং চ এবং ছ এই তিনেরই খাওয়া দাওয়া দেখুক, খ ও গ, চ এবং ছয়ের বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিবার ভার প্রাপ্ত হউক,—এইরূপে সকল ছোটগুলিকেই সকল বড়গুলি আপনাদিগের প্রতিপাল্যের মধ্যে পাউক। ইহাই সুব্যবস্থা।

আজি কালি একান্নবর্ত্তী সম্মিলিত পরিবারের মধ্যে প্রায়ই এরূপ ব্যবস্থা করা হয় না; এবং তাহা করা হয় না বলিয়াই মিলিত পরিবারের অনেকটা সুখ কম হইয়া যাইতেছে। যদি মিলিত পরিবারের মধ্যে সকল ভ্রাতার সকল সন্তানগুলিকে একদলস্থ মনে করিয়া বড় ছেলেগুলির দ্বারা ছোট ছেলেদের কাজ লওয়া যায়—তবে মিলিত পরিবারের মধ্যে সুখ এবং ধর্ম্ম সাধনা উৎকৃষ্টতর হয়।

যে পরিবারের ছেলেরা এইরূপে বিবেচনা-পূর্ব্বক পালিত এবং শিক্ষিত হয়, সে পরিবারে ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া কম হয়, তাহাতে বয়োধিকদিগের যোগ কম হয় এবং অল্প কারণে অন্তর্ব্বিচ্ছেদ হইতে পারে না।

সেরূপে পালিত পরিবারের মধ্যে ভাই-ভগিনীদিগের পরস্পর মনের মিল অতি সুমধুর হইয়া উঠে। ছেলেবেলায় ত এ খাইল বেশী, ও পরিল ভাল, এ সকল কচকচির কোন উল্লেখই হয় না; বড় হইয়া উঠিলে পরস্পরকে সাহায্যদান করা, অতি সহজ ব্যাপারই হইয়া থাকে। এক জনের কোন জিনিষটী আছে আর একজনের নাই বা হারাইয়া গিয়াছে, যাহার নাই বা হারাইয়াছে, সেই উহা পায়—কেমন করিয়া পায় তাহার কোন উচ্চবাচ্য হয় না। 'তুই নেনা' বা 'তুমি নাওনা' কখন কখন এই কথা দুই একবার শুনা যায় মাত্র। একজনের পাঠশিক্ষা হইয়াছে, খেলিতে যাইবার সময় হইয়াছে, কিন্তু ভগিনীটীর হয় নাই—যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ খেলিতে যাওয়া হয় না। একটীর পীড়া হইয়াছে, আর বাড়ীতে দৌড়াদৌড়ি থাকে না—কান্না কাটনার এবং আমোদ প্রমোদের চেঁচাচেঁচি হয় না।

আরও বয়োবৃদ্ধি হইলে, ভগিনীদিগের বিবাহ হইয়া গেলে, শ্যালকদিগের সহিত ভগিনীপতিদিগের বিলক্ষণ মনের মিল জন্মে। ভগিনীদিগেরও পরস্পর সৌহার্দ্দ ন্যূন হইয়া যায় না। যদি এক ভগিনীর বড় মানুষের বাটীতে বিবাহ আর একটীর সামান্য গৃহস্থের বাটীতে বিবাহ হইয়া থাকে, তথাপি ভগিনীদিগের মধ্যে তাচ্ছীল্য বা ঈর্ষ্যা জন্মিতে পারে না। কিন্তু সকল কন্যাকে সমান ঘরে (সঘরে) বিবাহ দিবার চেষ্টা করা পিতামাতার কর্ত্তব্য।

ভ্রাতৃবর্গের বিবাহ হইবার পর এবং পিতামাতার অবর্ত্তমানে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়া থাকে। কিন্তু সুপালিত পরিবারের মধ্যে এবং পৈতৃক ধনের বিভাগ স্পষ্টরূপে করা থাকিলে প্রায়ই তাহা হইতে পায় না। যদি ভাইয়ে ভাইয়ে সত্যই মনের মিল থাকে তবে তাঁহাদিগের পত্নীগণও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষসম্পন্ন হইতে পারে না। যায়ে যায়ে ঝকড়া বাধাইবার মূল (১ম) ছেলেয় ছেলেয় ঝকড়া, (২য়) ঝিয়ে ঝিয়ে ঝকড়া। ঐ দুইটীই অতি সামান্য বিষয় এবং অল্প মাত্র সাবধানতায় উহাদিগের প্রতিবিধান হইয়া যায়। ভ্রাতাদিগের মধ্যে উপায়ক্ষমতার ইতর বিশেষ নিবন্ধন যদি মনোমালিন্যের সম্ভাবনা হয় তাহার প্রতিবিধানের উপায় একটী মাত্র—পৃথগন্ন হওয়া। ভ্রাতাদিগের মধ্যে পরস্পর সম্মতিক্রমেই তাহা করা ভাল, মনোমালিন্য পর্য্যন্ত জন্মিতে দেওয়া অনুচিত, আর যাঁহার উপায় কম অথবা সন্তানাদি অধিক তাঁহার দ্বারাই পৃথগন্নতার প্রস্তাব হওয়া বিধেয়। কিন্তু পৃথগন্ন হইয়া গেলেও ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনের ঐক্য সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে এবং তাহা না হইলে উহাদিগের স্বভাবে দোষ জন্মে। পৃথগন্ন হইলেও পরস্পর সাহায্য চলিবে, সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, বিষয়বিশেষে সম্মিলিত পরামর্শ হইবে এবং একযোগে অনুষ্ঠান চলিবে। সৌভ্রাত্র এবং সৌভাগিন্য ইহার নিত্য সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধের রক্ষায় পবিত্রতা সাধন হয়, আত্মগৌরবের কোন কারণ হয় না; ইহা রক্ষা না করায় পবিত্রতার হানি হয় এবং লোকনিন্দাও জন্মে।

ইউরোপীয়দিগের স্থানে আমরা পারিবারিক কোন ধর্ম্মই প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিতে পারি না। উহাদের সহিত আমাদিগের

ধর্ম্মনীতি এবং সমাজনীতির অনৈক্য নিবন্ধন আমাদিগের পারিবারিক নীতিও ভিন্নরূপ। উহাদিগের মধ্যে অর্থের গৌরব কিছু অতিরিক্ত। এই জন্য উহারা স্বজনের স্থানে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে অথবা স্বজনকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে বড়ই নারাজ। কিন্তু সত্য সত্যই অর্থ সাহায্য ত অপর সকল প্রকার সাহায্য অপেক্ষা উচ্চতর সাহায্য নয়। শারীরিক পরিশ্রম এবং যত্ন দ্বারা, বুদ্ধিশক্তির পরিচালন দ্বারা, প্রভাবশালিতার প্রয়োগ দ্বারা, এবং প্রীতি ভক্তি এবং উৎসাহ প্রদান দ্বারা, যে সাহায্য হয় তাহা অর্থ সাহায্য অপেক্ষা অনেক অধিক। ঐ সকল সাহায্যের আদান প্রদানে যখন কোন আপত্তি হয় না, তখন টাকার সাহায্য সম্বন্ধেই অতটা লজ্জাবোধ এবং মনিসিক সঙ্কোচ হয় কেন? আমার বিবেচনায় অপরের স্থানে অর্থ সাহায্য গ্রহণে যে দোষ এবং লজ্জা, ভাই ভগিনীর মধ্যে সে দোষ এবং লজ্জার কোনই হেতুই নাই। ভাই-ভগিনীর মধ্যে অর্থ সাহায্যের যদি প্রয়োজন থাকে এবং অর্থ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সমাজে নিন্দা হয়। সুতরাং যিনি ওরূপ সাহায্য করিতে না দেন, তিনি আপনার স্বজনদিগকে নিন্দাভাগী করেন।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইহার ভিন্নভাব। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) অনেক গুণশালী গারফীল্ডের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন গারফীল্ডকে তাঁহার শৈশবাবস্থায় কোলে করিয়া দুই ক্রোশ পথ লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে রাখিয়া আসিতেন এবং সায়ংকালে পুনর্ব্বার বিদ্যালয় হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিতেন। ঐ জ্যেষ্ঠার বিবাহ হইয়া গেলে গারফীল্ড কিছুকাল

তাঁহারই বাটীতে থাকিয়া লেখা পড়া এবং শিল্পীকার্য্য শিক্ষা করেন। গারফীল্ড ভগিনীর বাটীতে বাসাখরচ দিতেন এবং জ্যেষ্ঠা তাহা লইতেন; বলিতেন, গারফীল্ডকে বাসাখরচ না দিতে দিলে, সে ভগিনীপতির বাটীতে থাকিতে লজ্জিত হইবে। (২) গারফীল্ডের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন সময় কনিষ্ঠের পাঠের সাহায্যার্থে নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিতে চাহিলে, গারফীল্ড তাহা লইলেন, কিন্তু প্রথমে আপনার লাইফ-ইনস্যুর করিয়া উহার প্রমাণপত্রখানি জ্যেষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গারফীল্ডের জীবনচরিত লেখক ঐ উদাহরণগুলিকে সৌভ্রাত্রভাবের বিশেষ পরিচায়ক বলিয়াই মনে করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যজাতীয় লোকের চক্ষে ঐ গুলি বিশেষ সৌভ্রাত্রের পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। 'যে জাতি ধনকেই পরম পদার্থ বলিয়া পূজা করে, তাহাদিগের চক্ষে ঐ গুলি বিশেষ ভ্রাতৃবাৎসল্যের চিহ্নস্বরূপ হইতে পারে। আমার বিবেচনায় জ্যেষ্ঠকে বাসাখরচ না ধরিয়া দিলে এবং জ্যেষ্ঠের হস্তে লাইফ-ইনস্যুয়রের সার্টিফিকেট জমা করিয়া না দিলে, গারফীল্ড উহাদিগকে অধিকতর সুখী করিতে পারিতেন। অন্ততঃ আমার মতে উহাই ভাই-ভগিনীর প্রতি উচিত ব্যবহার হইত। আর গারফীল্ড ইউনাইটেড সাম্রাজ্যের সম্রাট সভাপতি হইলে পর ঐ জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ভ্রাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ কৌতূহল হইয়া আছে! কিন্তু চরিত্রলেখকের মনে ঐ কৌতূহল উঠে নাই —তিনি ঐ বিষয়ে নির্ব্বাক্।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

রোগীর সেবা

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহ মমতা কম—স্বার্থপরতা বেশী—আত্মত্যাগশক্তি ন্যূন—বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল হয়, সে বাটীর অনেকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি।

(১) সে বাটীতে গৃহোপকরণের মধ্যে এমন কতক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং প্রয়োজনীয়। যথা, জল গরমের কেটল, ফ্লানেল এবং মলমল কাপড়ের টুকরা, খল দাঁটি, হামানদিস্তা, মেজর গ্লাস, উষ্ণ জলে না ফাটিয়া যায় এমন বোতল, ভাল নিক্তি, সোণা, বেডপ্যান, ক্লিনিকাল থার্ম্মোমেটর এবং ঔষধের একটী বাক্স বা আলমারি।

(২) সে বাটীতে কি পুরুষ কি স্ত্রী কাহার কোন পীড়া হইলে তাহা যতই সামান্য হউক, বাটীর কর্ত্তা তাহার তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন।

(৩) সে বাটীতে যদি কোন কঠিন পীড়া উপস্থিত হয়, তবে বাটীর ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার জন্য বিশিষ্টরূপে আদিষ্ট হয়।

(৪) অধিক পীড়ায়, সমস্ত বাটী উপশান্তভাব ধারণ করে—কেহই কাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয় না—কেহই উচ্চৈঃস্বরে কথা

কহে না—বাটীর কৃতবিদ্যেরাও সাহেবী চাইলে মস্ মস্ করিয়া চলেন না—ছেলেরাও আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলে।

(৫) রোগীর নিকটে থাকিবার জন্য পাহারা বদলের ন্যায় দিবারাত্রির মধ্যে পারিবারিক স্ত্রী এবং পুরুষদিগের নিয়োগ হইয়া যায়। যাহারা সেবায় নিযুক্ত হয়, অপরে তাহাদিগের তাৎকালিক করণীয় গৃহকার্য্য সমস্ত আপনাদের মধ্যে বিভাজিত করিয়া লয় এবং সমস্ত গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে—বাসনের ঠনঠনানি গৃহোপকরণের হড়হড়ানি, কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

(৬) রোগীর পথ্য এবং ঔষধ যথাসময়ে প্রদত্ত হইতে থাকে; তাড়াতাড়িও নাই বিলম্বও নাই—বিন্দুমাত্রে কোন বিপর্য্যয় নাই। বাটীর অনেকেই রোগীকে পথ্যাদি প্রদান কার্য্যে সক্ষম হয়।

(৭) রোগের লক্ষণ দেখা এবং চিকিৎসককে তাহা অবগত করান পরিবারের মধ্যে অনেকের সাধ্য হইয়া থাকে।

(৮) রোগের চিকিৎসায় ব্যয়কুণ্ঠতার নামগন্ধ থাকে না।

রোগীর সেবা পরিবারবর্গের যে কতদূর করা উচিত, আমি তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদিগের সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা আমার চক্ষে অপরিসীম বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ঐ সময়ে মিলিত পরিবারবর্গের টাকা এক এবং মন এক হইয়া যায়। আমি স্বচক্ষে পীড়িতাবস্থা ইংরাজের সেবা এবং চিকিৎসা দেখিয়াছি। পীড়িত ব্যক্তির পত্নী যদি একটু রাত্রি জাগরণ করিলেন, যদি ঠিক সময়ে স্বয়ং হাজিরা না খাইলেন, তবেই তাঁহার চিচি প্রশংসা হইল। পীড়িতের ভ্রাতা যদি তাঁহার বাটীতে আসিলেন এবং ভ্রাতা কেমন আছেন, পরিচারককে দিনের মধ্যে দুই চারিবার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে

পীড়াসম্বন্ধীয় দুই একটা কথা কহিলেন, তাহা হইলেই তিনি ভ্রাতৃকর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিলেন। প্রতিবেশী ইংরাজ যদি বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া নিজ নামাঙ্কিত কার্ড রাখিয়া গেলেন, তাহা হইলেই সামাজিক নিয়ম রক্ষার দায় হইতে খোলসা হইলেন। এই বিদেশে ত ইংরাজদিগের পীড়ার সময় বেতনভোগী খানসামা প্রভৃতি দ্বারা যতদূর সেবা হইবার তাহাই হইয়া থাকে। উঁহাদিগের স্বদেশেও পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও বড় একটা কিছু করিতে হয় না। বেতনগ্রাহিণী ধাত্রী অথবা দয়াবতী উদাসিনীগণ মুখ্যতঃ উঁহাদিগের রোগের সেবা করিয়া থাকে।

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। আস্তাবলে যদি একটা ঘোড়া পীড়িত হইয়া পড়ে তবে আস্তাবলের সকল ঘোড়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে—গোশালায় একটা গোরু রুগ্ন হইয়া পড়িলে আর যে গোরু তাহাকে দেখিতে পায় সেই উব লেজ করিয়া দৌড়াইতে চায়—কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ময়না, টিয়া, চটক প্রভৃতি সকল পশুপক্ষীরই এই ব্যবহার। প্রায় কেহই স্বজাতীয় পীড়িতের সমীপে গমন করিয়া তাহার গা ঝাড়িয়া বা চাটিয়া দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে না। অতএব পীড়িতের শুশ্রূষা পাশবধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য। যে মনুষ্য জাতির মধ্যে পাশব ভাব যত অল্প, সেই জাতীয় ব্যক্তি পীড়িতের সেবায় তত অধিক যত্নশীল হইয়া থাকে। অতএব রোগ সেবা সম্বন্ধে ইংরাজের রীতি আমাদিগের অনুকরণীয় নহে।

যদি রোগীর সেবার কোন সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা, সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই বিচার করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য

পীড়িতকে রোগমুক্ত করা। রোগীর মনে ভয় সঞ্চার হইলে রোগমুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে। এই জন্য এমনভাবে সেবা করা আবশ্যক, যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে তাহার জন্য পরিবারবর্গ অতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি পুত্র, কি ভ্রাতা, রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছ—তোমার আহার করিবার সময় হইল আর যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে, সে রোগীর ঘরে আসিল—তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল—তুমি যাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার আতিশয্যে ভীত হইয়াছ ইহাই বুঝিবে না কি? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি? অতএব ওরূপ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শায়িত—তুমি রাত্রদিন তাহার মলিন মুখমণ্ডলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছ। খাইতে যাও না, শুইতে যাও না, একেবারে শরীর পাত করিতেছ। যদি শিশু তোমার দুধ খায়—তবে তোমার শোক-বিহ্বল হৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে—তোমার দুগ্ধ, যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য, তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে, তুমি অধীর হইয়া শিশুর ত কোন উপকারই করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিত স্তন্যরূপ বিষপান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎ বধভাগিনী হইতেছ। মনে কর, উটি যেন কচি নয়—তোমার ক্রন্দনের, হা হতাশের, উপবাসের এবং অনিদ্রার, প্রকৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ। তাহা হইলে ত ও বড়ই ভীত হইত। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে এমন কাজ করিতে নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যটী নষ্ট

করিও না। এই জন্যই প্রাচীনা গৃহিণীরা বলিতেন, পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে নাই।

তবে কি রোগীর নিকট হাস্য কৌতুক বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে, আমি তাহার পীড়ায় কিছুই ভীত হই নাই? বরং এ পক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেরও অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারে না। রোগী ঐ কৃত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে—অথবা যদি প্রবেশ করিতে না পারে, তোমাকে নির্ম্মায় এবং হৃদয়শূন্য মনে করিবে—অথবা স্বয়ং হাস্য পরিহাসে যোগ দিতে গিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন—তাহার কি কষ্ট হইতেছে তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গিতেও বুঝিবেন এবং সেই কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন। কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না—স্বয়ং ধীর, শান্তমূর্ত্তি হইয়া পীড়িতরূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

পীড়িতের সেবক আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চুলবুলে লোকেরা, যাহারা সর্ব্বদাই এ পাশ ও পাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চলদৃষ্টি হইতে হয়। তাঁহার হৃদয়ে ধ্যানগম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সেবককেও পীড়িতের পূর্ব্বমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বভাব

দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যধিজনিত লক্ষণবিপর্য্যয় তাঁহার লক্ষ্যমধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবককেও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন্ সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন না—রোগীকে কথা কহিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া আত্ম-প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয়, এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারেও না এবং চাহেও না; যদি করিতে হয়, বড়ই বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়। যে সেবক বা সেবিকাতে সাধকের এই সকল গুণ বিদ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগীর প্রফুল্লতা জন্মে। তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন—একটু জল চাই—কি দুই চারিটা দাড়িম্বের দানা চাই—গায়ের চাদরটা একটু পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে—বালিসটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে হইবে, ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে—শীতল হস্তটী কপালে দিতে হইবে,—ঠিক একটুকু চাপিয়া বা আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে,—ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন, পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদু হাস্যের আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হয়েন।

পরিজনগণ উল্লিখিতভাবে রোগীর সেবা করিবে। গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিস, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহারও বস্ত্রাদির সহিত না মিশে—তাহার মল, মূত্র, ক্লেদাদি বাটী হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়—তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে—এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে

রোগীর ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া বাটীর অপর লোকের বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত পরিজন সেই আদেশ পালন করিবে। গৃহস্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে, সে কথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা, এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ। তাঁহারা ছেলের বিষ্ঠা বা মূত্রাদিতে ঘৃণা করা অকল্যাণকর মনে করিয়া ঐ সকল আদেশ পালনে শিথিলযত্ন হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পীড়িতের মল মূত্রে ঘৃণা করা অকল্যাণ বটে, এবং তাহা করিতেও নাই, কিন্তু এস্থলে ঘৃণা প্রদর্শন হইতেছে না, কেবল মাত্র সংস্রব দোষ নিবারণের উপায় বিধান হইতেছে। ছেলের মায়েরা যেন কখনই না ভুলেন যে, এক মাতৃগর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের পীড়া আপনাদিগের মধ্যে বড়ই সহজে সংক্রামিত হয়, আর ডাগরদিগের পীড়া ছোটদিগকে যত ধরে, ছোটর পীড়া ডাগরকে তত ধরে না। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগের পীড়াও সংক্রামকধর্ম্মী হইয়া থাকে। বৃদ্ধের পীড়াই সর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংক্রামক।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

নীতিশিক্ষা

সচরাচর এতদ্দেশে শিশুরা পিতার যেরূপ বাধ্য হয়, মাতার সেরূপ বাধ্য হয় না। মাতার অসাবধানতা এবং মূর্খতাবশতই যে এরূপ ঘটে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। শৈশবাবস্থা হইতে মাতা উহাদিগকে এত অধিক আদর দিতে আরম্ভ করেন যে, নিজে কোন্ বিষয় হইতে নিবারণ করা দূরে থাকুক, দাসদাসী বা অপর কেহ শিশুকে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। ইহাতে যে কেবল সন্তানের স্বভাব নষ্ট করা হয়, এমত নহে, পরে আপনাকেও বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্যা শিক্ষা করান আবশ্যক হইলে, যদ্যপি শিশু অবাধ্য হয় ও পিতামাতার কথা না শুনে, তখন মাতা নিজের দোষ জানিতে পারেন। কখন কখন এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্য কারণবশত মাতা রুষ্ট হইয়া থাকিলে অতি সামান্য দোষেই শিশুকে তাড়না করেন, কিন্তু এরূপ আচরণ মাতার পক্ষে অতি গর্হিত। বিনা দোষে শিশুকে তাড়না করিলে মাতার প্রতি উহার যেরূপ অশ্রদ্ধা জন্মে, অন্য কোন কারণে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া মাতা শিশুকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিবেন।

শৈশবাবস্থা হইতেই যাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে পিতামাতার বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। যে সকল উপায় দ্বারা এই অতি প্রয়োজনীয়

কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায়, প্রথমে তাহাদের সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া পরে ঐ সকল বৃত্তির বিষয় উল্লেখ করা যাইবে।

(১). অবস্থা। ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে, এক ব্যক্তির সন্তানের মধ্যে যত্তপি কেহ অসৎসঙ্গে ও কেহ সৎসঙ্গে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে কেবল ঐ কারণবশতই তাহাদের মনোবৃত্তি ও চরিত্র বিভিন্ন হইবে। জন্মগ্রহণের পরেই সভ্য জাতিদিগের সন্তানাপেক্ষা অসভ্যজাতিদিগের সন্তানের মনোবৃত্তির যে বিশেষ বিভিন্নতা থাকে, এমন বোধ হয় না; কেবল পিতামাতার আচরণ দর্শনে ও সমাজিক নিয়মের প্রভাবেই একজন রিপুপরবশ ও নিষ্ঠুর কার্য্যে রত হয় এবং একজন অপেক্ষাকৃত সুশীল ও শান্তস্বভাব হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থার প্রভাব অতিপ্রবল বলিয়া পিতামাতা সন্তানকে সচ্চরিত্র করিতে বিশেষ যত্ন পাইলেও দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজের দোষে অনেক স্থলে উহারা দুর্বৃত্ত হইয়া উঠে। কুপল্লীতে বাস করিয়া সন্তানকে সুনীতিশিক্ষা দেওয়া যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা সহর অঞ্চলের লোকে অনেকে অবগত আছেন। সামাজিক দোষ ও সাধারণের কুসংস্কার দূরীভূত না হইলে এ বিষয়ে সুবিধা হওয়া সম্ভব নহে। এই বিষয় স্মরণ করিয়াই পূর্ব্বে বাটীতে সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া উত্তম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহা সুসাধ্য নহে।

(২) দৃষ্টান্ত। পিতা, মাতা, বাটীর অন্যান্য পরিবার, দাস দাসী ও শিক্ষকের দৃষ্টান্তানুসারেই প্রায় বালকেরা কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। এ বয়সে যেরূপ অনুকরণ করিতে শিখে, অপর কোন সময়েই প্রায় তদ্রূপ দেখা যায় না। অনুকরণ করা ইহাদের স্বভাবসিদ্ধ বলিলেও বলা যায়, ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না

করিয়া ইহারা অন্যের দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য করে। এমন কি তিরস্কার এবং প্রহার দ্বারা উহার চরিত্র শোধন করিতে গেলে, অপরের প্রতি উহার স্বভাবও ঐরূপ হইয়া উঠে। এজন্য যাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে শিশু কার্য্য করিবে ও যাঁহারা উহাকে শিক্ষা প্রদান করিতে ভার লইবেন, উহার সম্মুখে তাঁহাদের নিজের আচরণের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা অতীব কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে অনেক সময়ে সুনীতি শিক্ষা দিতে কুনীতি শিক্ষা দিবেন এবং চরিত্র সংশোধন করিতে গিয়া উহা অধিকতর দূষিত করিবেন। মিথ্যা কথা, কটু কথা, হীনাবস্থার লোকের প্রতি অবজ্ঞা, দাস দাসীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ ইত্যাদি শিশুর সম্মুখে একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন। এই সকল উপায় দ্বারা উহাকে বাধ্য করিলে অপকার ব্যতীত উপকারের সম্ভাবনা নাই।

(৩) উপদেশ। যদিচ বাল্যাবস্থায় কেবল উপদেশ দ্বারা চরিত্র সংশোধন সম্বন্ধে অত্যল্পই উপকার দর্শে, কিন্তু অন্যান্য উপায়ের সহিত ইহাও অবলম্বন করা উচিত। সময় বুঝিয়া উপদেশ দিতে পারিলে ও উহা বোধগম্য হইলে, অবশ্যই উহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সময়ে উহার দ্বারা কোন উপকার বোধ না হইলেও উহা স্মরণ থাকিতে পারে এবং ভবিষ্যতে হয়ত বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে উহা কার্য্যে আইসে। উপদেশানুসারে কার্য্য করুক বা না করুক এই সময় হইতে মনোযোগপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিতে শিক্ষা করিলেও অনেক উপকার বিবেচনা করিতে হইবে। নীতিকথা উহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া, বা সত্যের গুণ ও মিথ্যার দোষ বর্ণন করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, নীতিবিষয়ক গল্পচ্ছলেই উহাকে উপদেশ

দেওয়া উচিত। উপদেশ দিবার জন্যই যে ঐ সকল গল্প করা হইতেছে, বা শিশু কোন্ পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতেছে, তাহা প্রথমে শিশুকে বলিবার আবশ্যক নাই, উহা শেষ হইলে গল্পের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে, এবং কখন কখন শিশু আপনা হইতেই উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। নীতিগর্ভ বিষয় বর্ণন করিয়া বালককে উহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে কহিলে উহার বিবেচনা-শক্তি যেরূপ পরিচালিত হয় ও ঐ তাৎপর্য্য মনোমধ্যে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়া যায়, সাধারণরূপে উপদেশ প্রদান করিলে, কথনই তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল তিরস্কার বা প্রহার দ্বারা বালককে অপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিলে, উহা যে বাস্তবিক অপকর্ম্ম, তাহা বোধ হওয়া দূরে থাকুক, যিনি এরূপ আচরণ করেন, তাঁহার প্রতি উহার অশ্রদ্ধা জন্মে। এজন্য তাড়না না করিয়া যাহাতে বালকের নিজের দোষ বোধগম্য হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

(৪) অভ্যাস। বালকের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে, অবস্থা, দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অপেক্ষা অভ্যাসকে অতিফলদায়ক উপায় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, ইহা দ্বারা সদাচার আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যায় এবং একবার স্বভাবসিদ্ধ হইলে উহা প্রতিপালন করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না, এবং ইচ্ছা হইলেও সহসা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। এজন্য শৈশবাবস্থা হইতেই শিশুকে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করাইলে এবং উহা একবার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গেলে, বিনা ক্লেশে, বিনা যত্নে, বিনা চিন্তায় ও ইচ্ছা ব্যতীত ভবিষ্যতে ঐরূপ আচরণ করিতে সমর্থ হইবে।

বাল্যাবস্থায় আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল কিরূপে পরিচালনা করা উচিত, তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে।

স্বার্থপরতা। আপনার এবং জীবপ্রবাহরক্ষার্থে ইহা অতি প্রয়োজনীয়। শৈশবাবস্থায় এবং বাল্যাবস্থায় আহার সম্বন্ধেই এই বৃত্তি অতিপ্রবল হইতে দেখা যায়। জীবনধারণার্থে যদিচ প্রচুর পরিমাণে আহার করা নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সচরাচর শিশুদিগকে সাবধান না করিলে ও শরীর সুস্থ থাকিলে, উহারা অত্যধিক পরিমাণে আহার করাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। আহারীয় দ্রব্যাদির গুণাগুণ না বুঝিয়া সুস্বাদু হইলেই তাহা অধিক পরিমাণে খাইতে চাহে। এজন্য পিতামাতার এ বিষয়ে অতি সাবধান হওয়া আবশ্যক। যাহাতে শিশু লোভী না হয় এবং আহারীয় দ্রব্যাদি দর্শন করিলেই খাইতে না চাহে, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। অত্যধিক আহার করিলে যে কেবল শারীরিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা এমত নহে, ইহা দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকলও প্রখর হইতে পারে না।

জিঘাংসা। বাল্যাবস্থার পূর্ব্বেই অনেকের এই প্রবৃত্তি অতি বলবতী হইয়া উঠে, এবং এই বয়সে জীবনী শক্তির আধিক্যকেই ইহার মুখ্য কারণ বলিতে হইবে। এ সময়ে বিপদকে বিপদ বলিয়া বোধ হয় না, সাহসের পরিসীমা থাকে না ও কি মনুষ্য, কি ইতর জন্তু কাহার সহিত ব্যবহারে মনে সন্দেহের লেশমাত্র উদয় হয় না। এরূপ স্বভাব এক পক্ষে কাঙ্ক্ষণীয়, কিন্তু অন্যান্য বৃত্তির অধীন হইয়া না চলিলে পরে ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিতে এই সময়ের জীবনী শক্তি চালিত না করিয়া, শারীরিক পরিশ্রম, ক্লেশসাধ্য কার্য্য সম্পাদন এবং বাল্যাবস্থায় কিঞ্চিৎ মানসিক চিন্তা দ্বারা উহা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে। নিরাশ্রয় ইতর জন্তুদিগের প্রতি বালকেরা সচরাচর অতি নিষ্ঠুর

আচরণ করিয়া থাকে। অতিসামান্য জীবকেও বিনা কারণে আঘাত করিতে দেখিলে উহা হইতে যে বালককে কেবল নিবৃত্ত করা উচিত, এমত নহে, যাহাতে পুনরায় ঐরূপ আচরণ না করে, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে যত্নবান্ হইবে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এ বয়সে কি সৎকর্ম্ম কি দুষ্কর্ম্ম শিশু যাহা দেখে, তাহারই অনুকরণ করিতে চাহে। এজন্য বলিদান প্রভৃতি নিষ্ঠুরতার কার্য্য ইহাদিগকে কখনই দেখান উচিত নহে।

কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাটীর মধ্যে এক বালক অপর বালককে আঘাত করিলে, আহত বালক দ্বারা উহাকে আঘাত করিতে বলা হয়। এরূপ আচরণ নিতান্ত নিষিদ্ধ, ইহাতে কেবল প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বলবতী হয় ও বালকদ্বয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা জন্মে। বিদ্যালয়ে যে কখন কখন এক বালককে, অপর বালকের কাণ মলিয়া দিতে আদেশ করা হয়, তাহা যে কতদূর অন্যায়, তাহা বলিতে পারা যায় না। তাড়না করা আবশ্যক হইলে পিতামাতা বা শিক্ষক স্বয়ং তাড়না করিবেন, ভ্রাতা ভগিনী বা সহাধ্যায়ী বালকদিগের মধ্যে একজনের দ্বারা অপরকে প্রহার করাইলে, পরস্পরে কোন ক্রমেই সদ্ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রবৃত্তির উগ্রতাবশতই অনেক স্থলে শিশুরা গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। শিশুর এরূপ স্বভাব দ্বারা বিশেষ অপকার হউক বা না হউক, যাহাতে উহা ক্রমে প্রবল হইয়া না উঠে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবে। কখন কখন শিশু এইরূপ অপকার করিলে, স্নেহবশত মাতা উহার প্রতি লক্ষ্য করেন না, কিন্তু উহা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিলে, পরে যে কত অনিষ্টকর হয়, তাহা বিবেচনা করা উচিত।

গোপন করিবার ইচ্ছা। যাহাদের উপর সন্তান প্রতি-পালনের ভার অর্পিত হয়, শিশুর এই প্রবৃত্তির প্রতি তাহাদের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। যদিচ সর্ব্বদা মনোমধ্যে যাহা উদয় হয়, তাহা গোপন রাখা উচিত বলিয়া এই বৃত্তি বিশেষ উপকারক, কিন্তু ইহা হইতে, বিশেষত শৈশবাবাস্থয়, অনেক অপকার হইয়া থাকে। কি বালক, কি যুবা, উপযুক্ত নীতিশিক্ষা না পাইলে, নিজের স্থবিধার জন্য মিথ্যা কহিতে সঙ্কুচিত হয় না, এজন্য অতি শৈশবাবস্থা হইতেই মিথ্যার দোষ ও সত্যের গুণ উহাদিগকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সক্রোধে শিশুকে তাড়না করিলে অনেক স্থলে নিজের দোষ গোপন করিবার জন্য বা আঘাতের ভয়ে শিশুরা মিথ্যা কহিয়া থাকে, তজ্জন্য যাহাতে পিতা মাতা বা শিক্ষককে দেখিয়া ভয় প্রাপ্ত না হয়, উহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিবে। তাড়না না করিলে যদ্যপি শিশু দুরন্ত হয়, তাহাও ভাল, কিন্তু তাড়নার ভয়ে স্থবোধ হয়, অথচ মিথ্যা কহে, তাহা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নহে। কাল্পনিক গল্প দ্বারা শিশুকে সান্ত্বনা বা ভয় প্রদর্শন করিবার প্রথা প্রায় সকল বাটীতেই প্রচলিত আছে। এই উপায় দ্বারা কখন কখন আশু উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাতে শিশু ক্রমে মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে, তজ্জন্য এই প্রথাকে অতি কুপ্রথা বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। যে কোন কারণে হউক, যেরূপ স্থবিধার জন্যই হউক, মিথ্যা বলাই দূষণীয়, বিশেষত শিশুর নিকটে মিথ্যা বলা নিতান্ত গর্হিত।

এই দ্রব্যটি আপনার, এই দ্রব্যটি পরের, আপনার দ্রব্যটি রক্ষা করিতে যত্নবান্ হওয়া, এই সকল সংস্কার অর্জ্জন-স্পৃহা মধ্যে গণ্য। অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত ইহা অতি

প্রয়োজনীয়, কিন্তু বলবতী হইয়া উঠিলে ইহার প্রভাবে স্বার্থপরতা অত্যন্ত প্রবল হয়। শিশুরা আহারীয় বা ক্রীড়ার কোন উত্তম দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, উহা প্রায় অপরকে দিতে চাহে না। উহাদের নিজের দ্রব্যাদির প্রতি যত্নবান্ হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিন্তু তাহা বলিয়া আবশ্যক হইলে অপরকে, বিশেষতঃ ভাইভগিনীকে উহা দিতে অসম্মত হওয়াও উচিত নহে। এই দ্রব্য আপনার, এই দ্রব্য পরের এরূপ প্রভেদ করিতে এমন প্রকারে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, যে উহারা যেন আপনার ব্যতীত পরের দ্রব্য লইতে না চাহে। কিন্তু যাহাতে আপনার দ্রব্য অপরকে দিতে কষ্টবোধ করে, তদ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

সাবধানতা। অকারণ আপদ বিপদে পতিত হইতে না দিতে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া যাহাতে শিশুর স্বভাব ভীরু না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবে। অবিবেচক লোকেই কেবল আমোদের জন্য ভয়ঙ্কর জন্তু বা ভূত প্রেতাদির গল্প করিয়া শিশুকে ভয় প্রদর্শন করে। ইহাতে যে কেবল স্বভাব ভীরু হইয়া ক্রমে সে নিতান্ত কাপুরুষ হইয়া উঠে, এমত নহে, অনেক স্থলে এই কারণে নানাপ্রকার শারীরিক পীড়া জন্মে।

সৎকর্ম্মের জন্যই কেবল আপদ বিপদ অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে, শিশুকে এইরূপ শিক্ষা দিবে। যে স্থলে কোন উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই, কেবল সাহস প্রকাশ করাই প্রধান উদ্দেশ্য, সে স্থলে বিপদে পড়া উচিত নহে। নিরাশ্রয় ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য নিজের কিঞ্চিৎ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও জলে ঝাঁপ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেবল নিজের

ক্ষমতা প্রকাশ করিবার জন্য অধিক দূর সাঁতার দিতে প্রবৃত্ত হওয়া মূর্খের কার্য্য। শিশুকে সচ্চরিত্র ও মনুষ্য নামের যোগ্য করিতে হইলে যাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহের অধীন থাকে, সেইরূপ চেষ্টা করিবে।

দয়ার ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি আর নাই। কেবল উপদেশ দ্বারা শিশুকে ইহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, দয়ার পাত্রের সংসর্গে না আসিলে, ইহা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক, ও ইহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে, মন যে কত দূর পর্য্যন্ত তৃপ্ত হয়, তাহা জানিতে পারা যায় না। দরিদ্রকে দান করিতে হইলে বাটীতে বালকবালিকা থাকিলে, উহাদের হস্ত দ্বারাই বিতরণ করা উচিত। হীনাবস্থার লোকদিগের পক্ষে অর্থ দান করা অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে শিশুরা আচার ব্যবহারে দুরবস্থার লোকদিগের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছল্য না করে, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

অধীনস্থ লোক ও দাসদাসীর প্রতি যাহাতে বালকবালিকারা অসদ্ব্যবহার না করে, মাতাপিতা যেন তাহাতে সর্ব্বদা সতর্ক হয়েন। তোমাদের কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতেছে বলিয়াই যে ঐ সকল লোকের আত্মগৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে, এমত বিবেচনা করা উচিত নহে। যে অবস্থার লোক হউক না কেন, অবজ্ঞাতে যেরূপ হৃদয় পীড়িত হয়, তদ্রূপ প্রায় আর কিছুতেই হয় না। সচরাচর বাটীর লোকে দাসদাসীর প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ও অবজ্ঞা করাতেই সন্তানের স্বভাব ঐরূপ হইয়া উঠে। অতএব কেবল শিশুর মঙ্গলার্থে ঐরূপ আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইবে। অধিকন্তু প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিলে উহারা শিশুর

প্রতি যেরূপ অনুরক্ত ও উহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠে, অন্য কোন কারণে তদ্রূপ হইতে পারে না।

নম্রতা। বাল্যাবস্থা হইতেই যাহাতে শিশুর স্বভাব উদ্ধত না হয়, এবং পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি ভক্তি থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। বিদ্যাভ্যাসের সময়ে স্বভাব উদ্ধত হইলে, বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইতে হইবে, যাঁহারা সর্ব্বদা বালকের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের নিকট নম্রস্বভাব না হইলে এবং তাঁহাদের যোগ্যতার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে কখনই সম্যক্‌রূপে উপকৃত হইতে পারা যায় না। কেবল বালকের নিজের উপকারের জন্যই যে এইরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক, এমত নহে, ইহা ব্যতীত মানব-সমাজও রক্ষা হইতে পারে না। বিদ্যা, বুদ্ধি বা পদ দ্বারা যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান না করিলে, কুশলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নহে।

কিন্তু অর্থ, চাটুকারিতা ও বলবীর্য্য প্রভৃতি দ্বারাও অনেকে সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, বালকদিগকে এই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত ব্যক্তিদিগকে সম্মান করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। এরূপ অভ্যাস হইলে বরং নীচত্ব প্রকাশ পায়। বুদ্ধিবৃত্তি বা উৎকৃষ্ট মানসিকবৃত্তি সকল চালনা করিয়া যাঁহারা বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, সমাজ তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করুক বা না করুক, তাঁহারাই মাননীয়, এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াই বালকদিগকে কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

কখন কখন শিক্ষকের অপটুতা দর্শনে বালকেরা সম্মুখে না পারাতে গোপনে উঁহাকে উপহাস করে, এই কুঅভ্যাস অতিশয় গর্হিত এবং মাতাপিতা ইহাতে সতর্ক না হইলে, কোন দিন তাঁহাদিগকেও যে উপহাস করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

লোকশিক্ষা

লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহমাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়, তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়, তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যা-বুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।

ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা।

আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে যে, ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজী নবীস সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন।

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিস্তালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সংবাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। সংবাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এ দেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না।

এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপত্র; কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত; পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত সহস্র সহস্র। এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ; পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তার পর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া, শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্ব্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না, তাহার বহু কারণের

মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে, আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কূটতর্ক সকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে; মোক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে, গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন—লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে,

নগরে নগরে বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামাল্য শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্ নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, দধীচির আত্মসমর্পণ-বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কারসংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণসমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত, যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে—পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম্ম, যে লোকহিত পরমকার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজী-শিক্ষাসত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না! রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, আর কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, এ দেশে সার অ্যাস্‌লি ইডেন, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের

সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্‌, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটি লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালার লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালার লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গগন-পর্য্যটন

পুরাণ-ইতিহাসাদিতে কথিত আছে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ আকাশ মার্গে রথ চালাইতেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহারা সচরাচর এ পাড়া ও পাড়ার ন্যায় স্বর্গলোকে বেড়াইতে যাইতেন, কথায় কথায় সমুদ্রকে গণ্ডূষ করিয়া ফেলিতেন; কেহ জগদীশ্বরকে অভিশপ্ত করিতেন, কেহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের কথা স্বতন্ত্র; সামান্য মনুষ্যদিগের কথা বলা যাউক।

সামান্য মনুষ্যের চিরকাল বড় সাধ, গগনপর্য্যটন করে। কথিত আছে, তারন্তম-নগরবাসী আর্কাইতস নামক এক ব্যক্তি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি কাষ্ঠের পক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিল; তাহা কিয়ৎক্ষণের জন্য আকাশে উঠিতে পারিয়াছিল। ৬৬ খৃষ্টীয় অব্দে সাইমন্ নামক এক ব্যক্তি রোম নগরে প্রাসাদ হইতে প্রাসাদে উড়িয়া বেড়াইবার উদ্যোগ পাইয়াছিল এবং তৎপরে কনস্তান্তিনোপল নগরে একজন মুসলমানি ঐরূপ চেষ্টা করিয়া-ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দান্তে নামক একজন গণিতশাস্ত্রবিৎ পক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া আপন অঙ্গে সমাবেশ করিয়া থ্রাসিমীন হ্রদের উপর উঠিয়া গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিতে করিতে এক দিন এক উচ্চ অট্টালিকার উপর পড়িয়া তাঁহার পদ ভগ্ন হয়। মাম্‌সবরিনিবাসী অলিবর নামক একজন ইংরেজেরও সেই দশা ঘটে। ১৬৩৮ সালে গোলড্উইন-নামক

এক ব্যক্তি শিক্ষিত হংসদিগের সাহায্যে উড়িতে চেষ্টা করেন ১৬৭৮ সালে বেনিয়র নামক একজন ফরাসী পক্ষ প্রস্তুত পূর্ব্বক হস্ত-পদ বাঁধিয়া উড়িয়াছিল। ১৭১০ সালে লরেন্ত দে গুজমান নামক একজন ফরাসী দারুনির্ম্মিত বায়ুপূর্ণ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিল। মাকুইস্ দে বাকবির নামক একজন আপন অট্টালিকা হইতে উড়িতে চেষ্টা করিয়া নদী-গর্ভে পতিত হন। বানসার্ডেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল।

১৭৬৭ সালে বিখ্যাত রসায়নবিদ্যার আচার্য্য ডাক্তার ব্লাক প্রচার করেন যে, জলজান-বায়ু-পরিপূর্ণ পাত্র আকাশে উঠিতে পারে। আচার্য্য কাবালো ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণীকৃত করেন, কিন্তু তখনও ব্যোমযানের কল্পনা হয় নাই।

ব্যোমযানের স্থষ্টিকর্ত্তা মোনগোল্‌ফীর নামক ফরাসী। কিন্তু তিনি জলজান-বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পূরিতেন। উত্তপ্ত বায়ু লঘুতর হয়, স্থতরাং তৎসাহায্যে গোলক সকলের ঊর্দ্ধে উঠিত। আচার্য্য চার্লস প্রথমে জলজান-বায়ুপূরিত ব্যোমযানের স্থষ্টি করেন। গ্লোব্ নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন, তাঁহাতে সাহস করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয়প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর উঠিয়া ফাটিয়া যায়। জলজান বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হয়। গোনেস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পতিত হয়। অদৃষ্ট-পূর্ব্ব খেচর দেখিয়া গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা-কোলাহল আরম্ভ করে।

অনেকে একত্রী হইয়া; গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আসিল যে, কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে নামিয়াছে। দুই জন ধর্ম্মযাজক বলিলেন যে, ইহা অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট চর্ম্ম। শুনিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাতে ঢিল্ মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে, বিবেচনা করিয়া গ্রাম্য লোকেরা ভূতশান্তির জন্য দলবদ্ধ হইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্রবলে ভূত ছাড়িয়া পলায় কি না, দেখিবার জন্য আবার ধীরে ধীরে সেইখানে ফিরিয়া আসিল। ভূত তথাপি যায় না—বায়ুসংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে একজন গ্রাম্যবীর, সাহস করিয়া তৎপ্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আবরণ ছিদ্রবিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর একজন বীর গিয়া তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন ক্ষতমুখ দিয়া বহুল-পরিমাণে জলজান নির্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এ জাতীয় রাক্ষসের শোণিত ঐ বায়ু। তাহা ক্ষতমুখে নির্গত হইয়া গেল, রাক্ষস ছিন্নমুণ্ড ছাগলের ন্যায় "ধড়ফড়" করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীরগণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্বপুচ্ছে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। তার পরে, মোমগোল্‌ফীর আবার আগ্নেয় ব্যোমযান (অর্থাৎ যাহাতে জলজান না পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ু পূরিত হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি "রথ" সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেবারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি মেষ, একটি কুক্কুট ও একটি হংস স্বর্গ-পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিল। পরে

স্বচ্ছন্দে গগনবিহার করিয়া, তাহারা 'সশরীরে' মর্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণিহত্যার আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমন দুই ব্যক্তি উঠুক—মরে মরিবে। শুনিয়া বিলাতের দে রোজীর নামক একজন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল—"কি! আকাশমার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্বৃত্ত নরাধমদিগের কপালে ঘটিবে!" একজন রাজ-পুরস্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়া তিনি মার্কুইস দর্লান্দের সমভিব্যাহারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে পর্য্যটন করেন। সেবার নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে—আবার ব্যোমযানে আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্র পার হইতে গিয়া, অধঃপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যাহা হউক, তিনিই মনুষ্যমধ্যে প্রথম গগন-পর্য্যটক। কেন না, দুষ্মন্ত, পুরূরবা, কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা অতি ধৃষ্টের কাজ! আর যিনি 'জয় রাম' বলিয়া পঞ্চমবায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিষিক্ত করায় আমাদিগের আপত্তি ছিল না।

দে রোজীরের পরেই চার্লস্ ও রবার্ট একত্রে রাজভবন হইতে ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজানীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন এবং প্রায় ১৪০০০ ফীট উর্দ্ধে উঠেন।

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই আমোদের জন্য। বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব-পরীক্ষার্থ

যাহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪ সালে গাই লুকাসের আরোহণই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩০০০ ফীট উর্দ্ধে উঠিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া আঠার ঘণ্টার মধ্যে জর্ম্মণীর অন্তর্গত উইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন অতি প্রসিদ্ধ গগন-পর্য্যটক্ ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার বায়ুপথে সমুদ্রপার হইয়াছিলেন, অতএব কলিযুগেও রামায়ণের দৈববলসম্পন্ন কার্য্য সকল পুনঃ সম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন, দুইবার সমুদ্রমধ্যে পতিত হয়েন—এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয়, জেম্‌স্ গ্লেশর অপেক্ষা কেহ অধিক উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬২ সালে উল্বর্হাম্টন হইতে উড্ডীন হইয়া প্রায় সাত মাইল উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণ পূর্ব্বক বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সুম্প্রতি আমেরিকার গগন-পর্য্যটক ওয়াইজ সাহেব, ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্যোগ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রোপরি আসিবার পূর্ব্বে বাত্যামধ্যে পতিত হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক!

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগন-পর্য্যটন সুখ ঘটিবে, এমন বোধ হয় না, এজন্য গগন-পর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ

করিয়া এ স্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল-সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত, তাহাও সমুদ্রবিশেষ; জল-সমুদ্র হইতে বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের জলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে, তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চে গিয়াই মেঘ-সকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত, দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান্ জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীপ্ত, রৌদ্রপ্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্গণের এইরূপ অনুমান।

এইরূপ পৃথিবী হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র জীবশূন্য, গতিশূন্য, স্থির নীরব। মস্তকোপরি আকাশ অতি নিবিড় নীল—সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবস্যার রাত্রিতে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্র-সকল প্রচণ্ড জ্বালা-বিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না—কেন না, এই সকল প্রদীপ বহুদূরস্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ

বায়ু। সকলেই জানেন, সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক করা যায়—সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোক। বায়ু জড় পদার্থ, কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীলবর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক-রেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায় আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি—অন্ধকার দেখি না। কিন্তু যত উর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্য উর্দ্ধলোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ়নীলিমা—পদতলে তুঙ্গশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতমালায় শোভিত মেঘলোক—সে পর্ব্বতমালাও বাষ্পীয় মেঘের পর্ব্বত—পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আরও পর্ব্বত—কেহ বা কৃষ্ণমধ্য পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহ বা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত, কেহ যেন হীরক-নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে। তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মস্যূর ফনবিল একবার একটি মেঘগর্ভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেমন মুঙ্গেরের পথে পর্ব্বতমধ্য দিয়া বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযান মেঘমধ্য দিয়া সেইরূপ গমন করিয়াছিল।

এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে একদিনে দুইবার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যাস্তের পর রাত্রিসমাগম দেখিয়া আবার ততোধিক উর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয়বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে এবং একবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয়বার সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘ, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগর-সকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযান-সকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন—তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেশর সাহেব লিখিয়াছেন যে, লণ্ডনের উপরে উঠিয়া এককালে ত্রিশ লক্ষ মনুষ্যের বাসগৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরী সকলের রাজপথস্থ দীপমালা-সকল অতি রমণীয় দেখায়।

যাঁহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যত উর্দ্ধে উঠা যায়, তত তাপের অল্পতা। সিমলা, দারজিলিং প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানের শীতলতার কারণ এই, এবং এই জন্য হিমালয় তুষার-মণ্ডিত। (আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে হিমকে ভারতবর্ষীয় কবিগণ "কো হি দোষ গুণসন্নিপাতে" বিবেচনা

করিয়াছিলেন, আধুনিক রাজপুরুষেরা তাঁহাকেও গুণ বিবেচনা করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন।) ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া উর্দ্ধে উত্থান করিলেও ঐরূপ ক্রমে হিমের আতিশয্য অনুভূত হয়। তাপ, তাপমান-যন্ত্রের দ্বারা মিত হইয়া থাকে। যন্ত্র ভাগে ভাগে বিভক্ত। মনুষ্যশোণিত কিছু উষ্ণ, তাহার পরিমাণ ৯৮ ভাগ। ২২২ ভাগ তাপে জল বাষ্প হয়। ৩২ ভাগ তাপে জল তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়। (তাপে জল তুষার হয়, এ কোন্ কথা? বাস্তবিক তাপে জল তুষার হয় না, তাপাভাবেই হয়। ৩২ ভাগ তাপ জলের স্বাভাবিক তাপের অভাববাচক।)

পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্গণের সংস্কার ছিল যে, উর্দ্ধে প্রতি তিন শত ফীটে একভাগ তাপ কমে অর্থাৎ তিন শত ফীট উঠিলে এক ভাগ তাপহানি হইবে—ছয় শত ফীট উঠিলে দুই ভাগ কমিবে—ইত্যাদি। কিন্তু গ্লেশর সাহেব বহুবার পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, উর্দ্ধে তাপহানি এরূপ একটি সরল নিয়মানুগামী নহে। অবস্থা-বিশেষে তাপহানির গৌরব ঘটিয়া থাকে, মেঘ তাপরোধক এবং তাপগ্রাহক। আবার দিবাভাগে যেরূপ তাপহানি ঘটে, রাত্রিতে সেরূপ নহে। গ্লেশর সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্নলিখিত মত—

ভূমি হইতে হাজার ফীট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় তাপহানির পরিমাণ ৪.৫ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ৬.২ ভাগ, দশ হাজার ফীট পর্য্যন্ত মেঘাচ্ছন্নাবস্থায় ২.২ ভাগ, মেঘ না থাকিলে ২ ভাগ। বিশ হাজার ফীট উর্দ্ধে মেঘাচ্ছন্ন ১.১ ভাগ, মেঘশূন্যে ১.২ ভাগ। ত্রিশ হাজার ফীট উর্দ্ধে মোট ৬.২ ভাগ তাপহ্রাস পরীক্ষিত হইয়াছিল ইত্যাদি। তাপহ্রাস হেতু উর্দ্ধে স্থানে স্থানে তুষার-কণা (snow) দৃষ্ট হয় এবং ব্যোমযান কখনও কখনও তন্মধ্যে পতিত

হয়। উর্দ্ধে শীতাধিক্য অনেক সময়ে যানারোহীদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে, এমন কি, অনেক সময় হাত-পা অবশ হয়, এবং চেতনা অপহৃত হয়।

উর্দ্ধে তাপাভাবের কারণ তপ্ত বা তাপ্য সামগ্রীর অভাব। রৌদ্র ভূমিতে যেমন প্রখর, উর্দ্ধে বরং ততোধিক প্রখরতর বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি তপ্ত হইবে? ভূমি অতি দূরে, বায়ু অতি ক্ষীণ—অল্প পরমাণু। দশ বারটি তুলার বস্তা উপর্য্যুপরি রাখিয়া দেখিবেন—উপরিস্থ তুলার ভারে নিম্নস্থ বস্তার তুলা গাঢ়তর হইয়াছে। তেমনি নিম্নস্থ বায়ু গাঢ়—উপরিস্থ বায়ু ক্ষীণ। ভূমির উপরে যে ভার, তাহার পরিমাণ সাড়ে সাত সের। আমরা মস্তকের উপর অহরহঃ এই ভার বহন করিতেছি—তজ্জন্য কোন পীড়া বোধ করি না কেন? উত্তর, "অগাধজলসঞ্চারী" মৎস্য উপরিস্থিত বারি-রাশির ভারে পীড়িত না হয় কেন? উপরিস্থ বায়ুস্তর-সমূহের ভারে নিম্নস্থ বায়ুস্তর-সকল ঘনীভূত—যত উর্দ্ধে যাওয়া যায়, বায়ু তত ক্ষীণ হইতে থাকে। গগন-পর্য্যটকেরা ইহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছেন, গুরুতা অনুসারে ৩৮০ মাইলের উর্দ্ধের মধ্যেই অর্দ্ধেক বায়ু আছে; এবং পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যেই সমুদয় বায়ুর তিন ভাগের দুই ভাগ আছে। এই জন্য উর্দ্ধে উঠিতে গেলে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত কষ্ট হয়। মস্যুর ফ্লামারিয় দশ সহস্র ফীট উর্দ্ধে উঠিয়া প্রথমবারে যেরূপ কষ্ট অনুভূত করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—

"সাতটা বাজিতে এক পোয়া থাকিতে আমার শরীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব আভ্যন্তরিক শীতলতা অনুভূত করিতে লাগিলাম। তৎসহিত তন্দ্রা আসিল। কষ্টে নিশ্বাস ফেলিতে

লাগিলাম। কর্ণমধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং আধ মিনিট কাল, আমার হৃদ্রোগ উপস্থিত হইল। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। আমি একপাত্র জল পান করিলাম—তাহাতে উপকার বোধ হইল। যে বোতলে জল ছিল—তাহার ছিপি খুলিবার সময়ে, যেমন শ্যাম্পেনের বোতলের ছিপি সশব্দে বেগে উঠিয়া পড়ে, জলের বোতলের ছিপি খুলিতে সেইরূপ হইল। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। তখন আমাদিগের মস্তকের উপর বায়ু এক ভাগ কমিয়াছিল। যখন বোতলের ছিপি আঁটিয়া গগনে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা এখনকার বায়ুর ভার এক ভাগ কম হইয়াছিল।"

দুই একবার গগন-মার্গে যাতায়াত করিলে এ সকল কষ্ট সহ্য হইয়া আইসে, কিন্তু অধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে সহিষ্ণু ব্যক্তিরও কষ্ট হয়। গ্লেশর সাহেব এ সকল কষ্টে বিশেষ সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু ছয় মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়া তিনিও চেতনাশূন্য ও মুমুর্ষু হইয়াছিলেন। ২৯০০০ ফীট উপরে উঠিলে পর, তাঁহার দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া আইসে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর তাপমান যন্ত্রের পারদ-স্তম্ভ অথবা ঘড়ীর কাঁটা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। টেবিলের উপর এক হাত রাখিলেন। যখন টেবিলের উপর হাত রাখিলেন, তখন হস্ত সম্পূর্ণ সবল; কিন্তু তখনই সে হাত আর উঠাইতে পারিলেন না—তাঁহার শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। তখন দেখিলেন, দ্বিতীয় হস্তও সেই দশাপন্ন হইয়াছে, অবশ। তখন একবার গাত্রালোড়ন করিলেন; গাত্র চালনা করিতে পারিলেন, কিন্তু বোধ হইল, যেন, হস্ত-পদাদি নাই। ক্রমে এইরূপে তাঁহার সকল অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল; ভগ্নগ্রীবের ন্যায় মস্তক লম্বিত হইয়া পড়িল, এবং দৃষ্টি

৬

একেবারে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, এমত সময়ে হঠাৎ তাঁহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল। পরে ব্যোমযানের সারথি রথ নামাইলে তিনি পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

রথ নামাইল কি প্রকারে? ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ;—প্রথম, উর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে উর্দ্ধ। দ্বিতীয়, দিগন্তরে; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিকে যায়, সেইরূপ। ব্যোমযান অভিলষিত দিগন্তরে চালনা করা এ পর্য্যন্ত সাধ্যায়ত্ত হয় নাই—চালক মনে করিলে উত্তর-পশ্চিমে, বামে বা দক্ষিণে, সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি, বায়ুসারথি যে দিকে লইয়া যায়, ব্যোমযান সেই দিকে চলে। কিন্তু উর্দ্ধাধঃ গতি মনুষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই উর্দ্ধে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলে নামিবে। ব্যোমযানের রথে কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে; তাহার কিয়দংশ নিক্ষেপ করিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়—তখন ব্যোমযান আরও উর্দ্ধে উঠে। এইরূপে ইচ্ছাক্রমে উর্দ্ধে উঠা যায়। আর যে লঘু বায়ু কর্ত্তৃক বেলুন পরিপূরিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সমর্থ, তাহার কিয়দংশ নির্গত করিতে পারিলেই উহা নামে। ঐ বায়ু নির্গত করিবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটি দড়ি বাঁধা; সেই দড়ি ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়, ব্যোমযান নামিতে থাকে।

দিগন্তরে গতি মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু মনুষ্য বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করিতে সমর্থ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভিন্ন

ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দিগভিমুখে বায়ু বহিতে থাকে। যখন ব্যোমারোহী ভূমির উপরে দক্ষিণবায়ু দেখিয়া, যানারোহণ করিলেন, তখনই হয় ত কিয়দ্দূরে উঠিয়া দেখিলেন যে, বায়ু উত্তরে, আরও উঠিলে হয় ত দেখিবেন যে, বায়ু পূর্ব্বে কি পুনশ্চ দক্ষিণে ইত্যাদি। কোন্ স্তরে কোন্ সময়ে কোন্ দিকে বায়ু বহে, ইহা যদি মনুষ্যের জানা থাকিত, তাহা হইলে ব্যোমযান মনুষ্যের আজ্ঞাকারী হইত। যাঁহারা সুচতুর, তাঁহারা কখন কখন বায়ুর গতি অবধারিত করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গগন-পর্য্যটন করিয়াছেন। ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে মস্যুর ত্রিসান্দর কালে নগর হইতে নেপ্‌চ্যুন নামক বেলুনে গগনারোহণ করেন। চারি ফীট ঊর্দ্ধে উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের গতি উত্তর-সমুদ্রে। অপরাহ্নে এইরূপ তাঁহারা অকস্মাৎ অনিচ্ছার সহিত অনন্ত সাগরের উপর যাত্রা করিলেন। কিন্তু তখন উপায়ান্তর ছিল না; এই সঙ্কটে তাঁহারা দেখিলেন যে, নিম্নে মেঘ সকল দক্ষিণগামী। তখন তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সমুদ্র-বিহারে চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা ২১ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরি বাহির হইয়া যান। তাহার পর লঘু বায়ু নির্গত করিয়া দিয়া নীচে নামেন। বায়ুর সেই নিম্নস্তরে দক্ষিণ-বায়ু পাইয়া তৎকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমির উপরে আসেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অবতরণ করেন নাই। তার পর সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইল। বাষ্পের গাঢ়তা বশতঃ নিম্নে ভূতল দেখা যাইতেছিল না। এমন অবস্থায় তাঁহারা কোথায় যাইতেছিলেন, তাহা জানিতে পারেন নাই। আকস্মাৎ নিম্ন হইতে গম্ভীর সমুদ্র-কল্লোল উত্থিত হইল। তখন অন্ধকারে পুনর্ব্বার অনন্ত সাগরোপরি বিচরণ করিতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহারা

আবার নিম্নে নামিলেন। আবার দক্ষিণ-বায়ুর সাহায্যে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন।

উত্তর-সমুদ্রে বিচরণকালে তাঁহারা কয়েকটি অদ্ভুত ছায়া দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন যে, সমুদ্রে যে সকল বাষ্পীয়াদি জাহাজ চলিতেছিল, ঊর্দ্ধে মেঘমধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব। মেঘমধ্যে তেমনি সমুদ্র চিত্রিত হইয়াছে—সেই চিত্রিত সমুদ্রে তেমনি প্রকৃত জাহাজের ন্যায় ছায়ার জাহাজ চলিতেছে। সেই সকল জাহাজের তলদেশ ঊর্দ্ধে, মাস্তল নিম্নে বিপরীতভাবে জাহাজ চলিতেছে। মেঘরাশি বৃহদ্দর্পণস্বরূপ সমুদ্রকে প্রতিবিম্বিত করিয়াছিল।

মস্যুর ফ্লামারিয়ঁ আর একটি আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব দেখিয়াছিলেন। দিবাভাগে প্রায় পাঁচ সহস্র ফীট ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় শত ফীট মাত্র দূরে দ্বিতীয় একটি বেলুন চলিয়াছে। আরও দেখিলেন যে, সেই দ্বিতীয় বেলুনটির আকৃতি তাঁহাদিগের বেলুনের আকৃতি, যেমন তাঁহাদিগের বেলুনের নিম্নে "রথ" যুক্ত ছিল, এবং তাহাতে তাঁহারা দুই জন আরোহী বসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বেলুনেও সেইরূপ রথ, এবং সেইরূপ দুই জন আরোহী। আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দুই জন আরোহীর অবয়ব—তাঁহাদিগেরই অবয়ব! তাঁহারাই সেই দ্বিতীয় বেলুনে বসিয়া আছেন। একটি বেলুনে যেখানে যাহা ছিল—যেখানে যে দড়ি, যেখানে যে সূতা, যেখানে যে যন্ত্র, দ্বিতীয় বেলুনে ঠিক তাহাই আছে। ফ্লামারিয়ঁ দক্ষিণ হস্তত্তোলন করিলেন—ভৌতিক ফ্লামারিয়ঁ বাম হস্তোত্তোলন করিল। তাঁহার সঙ্গী একটি পতাকা উড়াইলেন—ভৌতিক সঙ্গী একটা তদ্রূপ পতাকা উড়াইল।

গগনপথে পার্থিব শব্দ সহজে গমন করে, কিন্তু সকল সময়ে নহে, এবং সকল শব্দের গতি তুল্যরূপ নহে। মেঘাচ্ছন্নে শব্দরোধ ঘটে। গ্লেশর সাহেব চারি মাইল ঊর্দ্ধ হইতে রেইল্‌ওয়ে ট্রেণের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং বিশ হাজার ফীট উপরে থাকিয়া কামানের শব্দ শুনিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র কুক্কুটের রব দুই মাইল উপর হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু চারি হাজার ফীট উপরে থাকিয়া বহুসংখ্যক মনুষ্যের কোলাহল শুনিতে পান নাই। মস্যর ফ্লামারিয় আকাশ হইতে ভূমণ্ডলের বাদ্য শুনিতে পাইতেন। তাঁহার বোধ হইত, যেন মেঘমধ্যে কে সঙ্গীত করিতেছে।

অনেকেই অবগত আছেন যে, যখন পারিস্ অবরুদ্ধ হয়, তখন ব্যোমযানযোগে পারিস হইতে গ্রাম্য প্রদেশে ডাক যাইত। শিক্ষিত পারাবত-সকল সেই সকল ব্যোমযানে চড়িয়া যাইত। তাহাদের পুচ্ছে উত্তর বাঁধিয়া দিলে লইয়া ফিরিয়া আসিত। লঘুতার অনুরোধে সেই সকল পত্র ফটোগ্রাফের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইত—অতি বৃহৎ পত্র এক ইঞ্চির মধ্যে সমাবিষ্ট হইত। পড়িবার সময়ে অনুবীক্ষণ ব্যবহার করিতে হইত। স্থানাভাব বশতঃ এই কৌতুকাবহ তত্ত্ব আমরা সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না।

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, ব্যোমযান এখনও সাধারণের গমনাগমনের উপযোগী বা যথেচ্ছ বিহারের উপায়স্বরূপ হয় নাই। গ্লেশর সাহেব বলেন যে, বেলুনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, যানান্তর ইহার দ্বারা সূচিত হইতে পারে; যানান্তর সূচিত না হইলে সে আশা পূর্ণ হইবে না। মনুষ্য কখন উড়িতে পারিবে কি না, মস্যর ফ্লামারিয় এই তত্ত্বের সবিস্তারে আলোচনা করিয়া

সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, একদিন মনুষ্যগণ অবশ্য পক্ষীদের ন্যায় উড়িতে পারিবে; কিন্তু আত্মবলে নহে। যখন মনুষ্য, পক্ষ বা পক্ষবৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক বলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারিবে, তখন মনুষ্যের বিহঙ্গপদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দেলোম নামক একজন ফরাসী একটি মৎস্যাকীর বেলুন কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন, তৎসাহায্যে মনুষ্য যথেচ্ছ আকাশ-পথে যাতায়াত করিতে পারিবে। কিন্তু সে যন্ত্র হইতে এ পর্য্যন্ত কোন ফলোদয় হয় নাই বলিয়া আমরা তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হরবল্লভের ঋণ: পরিশোধ

(দেবী চৌধুরাণী হইতে)

বৈশাখ শুক্লা সপ্তমী আসিল, কিন্তু দেবীরাণীর ঋণ পরিশোধের কোন উদ্যোগ হইল না। হরবল্লভ এক্ষণে অঋণী, মনে করিলে অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেবীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন, কিন্তু সে দিকে মন দিলেন না। তাঁহাকে এ বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রজেশ্বর দুই চারিবার এ কথা উত্থাপন করিলেন; কিন্তু হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। এ দিকে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রায়াগতা—দুই চারি দিন আছে মাত্র। তখন ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "ভাল, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম। ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।" হরবল্লভ শিবিকারোহণে পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দুই জন লাঠিয়াল (পাইক) সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

হরবল্লভ টাকার চেষ্টায় গেলেন বটে, কিন্তু আর এক রকম। তিনি বরাবর রঙ্গপুর গিয়া কালেক্‌টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন কালেক্‌টরই শান্তিরক্ষক ছিলেন। হরবল্লভ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে সিপাহী দিউন। আমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমায় কি পুরস্কার দিবেন, বলুন।"

শুনিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দেবী চৌধুরাণী দস্যুদিগের নেত্রী, তাহাকে ধরিতে পারিলে আর আর

সকলে ধরা পড়িবে। তিনি দেবীকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনমতে সফল হইতে পারেন নাই। অতএব হরবল্লভ সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে ধরাইয়া দিবে শুনিয়া, সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন; পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। হরবল্লভ বলিলেন, "আমার সঙ্গে পাঁচ শত সিপাহী পাঠাইতে হুকুম হউক।" সাহেব সিপাহীর হুকুম দিলেন। হরবল্লভকে সঙ্গে করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান সিপাহী লইয়া দেবীকে ধরিতে চলিলেন।

হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের নিকট সবিশেষ শুনিয়াছিলেন, ঠিক সে ঘাটে দেবীকে পাওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ দেবী বজরাতেই থাকিবে। লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান সেই জন্য কতক ফৌজ লইয়া ছিপে চলিলেন। এইরূপ পাঁচখানি ছিপ ভাঁটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল। এদিকে লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব আরও কতক সিপাহী সৈন্য লুক্কায়িতভাবে, বন দিয়া বন দিয়া, তটপথে পাঠাইলেন। যেখানে দেবীর বজরা থাকিবে, হরবল্লভ বলিয়া দিল; সেইখানে তীরবর্ত্তী বনমধ্যে ফৌজ তিনি লুকাইয়া রাখিলেন, যদি দেবী ছিপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তটপথে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে এই ফৌজের দ্বারা ঘেরাও করিয়া ধরিবেন। আরও এক পলাইবার পথ ছিল—ছিপগুলি ভাঁটি দিয়া আসিবে, দূর হইতে ছিপ দেখিতে পাইলে দেবী ভাঁটি দিয়া পলাইতে পারে; অতএব লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনান অবশিষ্ট সিপাহীগুলিকে দুই ক্রোশ ভাঁটিতে পাঠাইলেন, তাহাদিগের থাকিবার জন্য এমন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন যে সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সময়ে সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সিপাহীরা সেখানে তীরে লুকাইয়া থাকিবে, বজরা দেখিলেই জলে আসিয়া তাহা ঘেরাও করিবে।

সন্ন্যাসিনী রমণীকে ধরিবার জন্য এইরূপ ঘোরতর আড়ম্বর হইল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা এ আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। দেবী সন্ন্যাসিনী হউক আর নাই হউক, তাহার আজ্ঞাধীন হাজার যোদ্ধা আছে, সাহেবেরা জানিতেন। এই যোদ্ধাদিগের নাম "বরকন্দাজ"। অনেক সময়ে কোম্পানীর সিপাহীদিগকে এই বরকন্দাজদিগের লাঠির চোটে পলাইতে হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ। হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ, হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালার আব্রু-পর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। বদমাইস তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল, তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্দারি ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে। পীনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে—সমাজ শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি লাঠি! আর লাঠি নও, বংশখণ্ড মাত্র। ছড়িত্ব প্রাপ্ত

হইয়া শৃগালকুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতের শোভা কর ; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি নাকি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই; "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্।" এখন মূর্খের ঔষধ "বাপু", "বাছা"—তাহাতেও রোগ ভাল হয় না। তোমার সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনেকেরই গুণ এই ছুনিয়াতে জাজ্বল্যমান। ইস্তক আঁড়া, বাঁকারি, খোঁটা লাগায়েৎ শ্রীনন্দনন্দনের মোহন বংশী, সকলেরই গুণ বুঝি—কিন্তু লাঠি! তোমার মত কেহ না। তুমি আর নাই—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে। তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাতবৃক্ষ-শাখার ঠেকনো হইয়া আছ, দেবকন্যারা তোমার ঘায় কল্পবৃক্ষ হইতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফল সকল পাড়িয়া লইতেছে। এক আধটা ফল যেন থিবীতে গড়াইয়া পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাল্মীকির জয়

আজি কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞ করিবেন, তথায় সমস্ত ভূচর খেচর উভচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবৃন্দ আহূত হইয়াছে। যজ্ঞ-সম্বৎসর-ব্যাপী। কৌশাম্বীর চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। কিন্তু মন কাহারও স্থির নহে। এরূপ অগাধ জনসমুদ্র মধ্যে যখন চারিদিকে এরূপ শত্রুতা ও বৈরিতা, তখন একটুতেই প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া উঠিতে পারে। বাস্তবিক বাধিয়াও উঠিল। কৌশাম্বীনাথ সূর্য্যবংশীয় নরপতি ব্রাহ্মণপক্ষপাতী। তিনি বশিষ্ঠকে আপন পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। অমনি বিশ্বামিত্রের দল ও পরশুরামের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের মন্ত্রী খরদূষণ ও বালী রাজাকে সঙ্গী পাইলেন। তিনি অনেক-দিবসাবধি বহুসংখ্যক প্রবলপরাক্রম দস্যুদলপতিকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়াছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। বশিষ্ঠপক্ষীয় ব্রাহ্মণ এবং অযোধ্যা ও মিথিলার রাজগণ যজ্ঞরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। বশিষ্ঠের আশ্রিত পারদহূনাদিজাতিও তাঁহার রক্ষার্থ অস্ত্র ধরিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত রহিলেন। এরূপ স্থলে শান্তিরাজ্যপতি গুহকও নিজ দল সঙ্গে উপস্থিত আছেন। তাঁহার প্রথম চেষ্টা মিটাইয়া দিবেন, শেষ অন্ততঃ যুদ্ধ রহিত করিবেন; না হয় অন্যায়পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। আর বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের হাত ধরিয়া বেড়াইতেছেন। কেহই তাঁহাকে মানিতেছে না। বাল্মীকির কান্নায় পাষাণ-হৃদয়ও দ্রব হয়। কিন্তু যাহারা রাজনীতিজ্ঞ, যাহারা উচ্চতর জাতি,

শক্তি নাই। চাহিবার শক্তি নাই। ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বামিত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দরবিগলিত অশ্রুধারা ব্রাহ্মণদিগের গায়ে পড়িল। রোদনে শরীর আরও ক্ষীণ হইল। আবার অজ্ঞান হইলেন। অজ্ঞান হইয়া বোধ হইল, ঋভুগণ গান করিতেছে, আর সব ভাই ভাই গাইতেছে, বলিতেছে মানুষ যদি মানুষের উপর কর্ত্তা হইতে না চাহিত, তবে কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। রাজা যদি আপন কাজ করিত, কত দিন সব ভাই ভাই হইয়া যাইত। এই গান শুনিতেছেন, আর মনের ভিতর তলায় যে মন আছে সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষাকে স্থান দিব না. প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। এমন সময় চৈতন্য হইল। তখন চেতন অবস্থায় কেবল পরহিতে জীবন উৎসর্গ করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, আবার অজ্ঞান হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অগ্নি জ্বালিবার জন্য যে কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার কি একটা পদার্থ উপর হইতে পড়িতেছে। সকলেই সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে সকলের আত্মাপুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল। সমস্ত লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত হইয়া বাক্‌শক্তি-শূন্য হইয়া রহিল। যাহারা বাল্মীকিকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বাল্মীকি দৌড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন একটী প্রকাণ্ড পুরুষ তথায় পড়িয়া আছেন। বাল্মীকি অলৌকিক শক্তিবলে জানিতে পারিলেন কুণ্ডস্থ মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড বিশ্বামিত্র; তখন তাঁহার ক্রন্দনের অবধি রহিল না। তাঁহার বীণা একেবারে অতি করুণস্বরে গান ধরিল। নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে

লাগিল। তিনি বলিলেন, তোরা দেখ্, তোরা তুচ্ছ মানব, তোরা সামান্য—দেখ দেখি, যে বিশ্বামিত্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে, যে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মারও উপর হইয়াছিল, দেখরে নিয়তির বলে তাহার কি হইয়াছে। দেখ একবার সেই বিশাল বীর—সেই প্রকাণ্ড তপস্বী—সেই অদ্ভুত মনুষ্য—তাহার কি দশা হইয়াছে। দেখ দেখিরে তোরা সামান্য সুখে দুঃখে পাগল। দেখ বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি আজি ধ্বংস হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মত্ব গিয়াছে, তাহার যা ছিল, সে যে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছিল, এখন বুঝি তাহাও নাই, এখন বুঝি তাহার জীবনও নাই। ভাব দেখি বিশ্বামিত্রের কি কষ্ট। যখন বিশ্বামিত্র—তাহারই এই দশা, তখন ভাব দেখি তোদের কি হইয়াছে। তখন মনে কর দেখি তোদের কি হইবে। ঐ দেখ ব্রহ্মা আজি বিশ্বামিত্রের জন্য কাঁদিয়া আকুল। যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের হাতে এত লাঞ্ছনা পাইয়াছে, আজি সেও কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। অতএব তোরা ঝগড়া বিবাদ ত্যাগ কর, তোরা স্থির হইয়া থাক। জীবন দিনকত বই নয়।

সকলেই নীরব হইয়া বাল্মীকির সকরুণ বীণাঝঙ্কার শুনিতে লাগিল। সকলের মন গলিয়া গেল। সকলেরই মনে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সকলেই কাঁদিয়া আকুল হইল। অস্ত্র শস্ত্র বিবাদ বচসা ত্যাগ করিল। ক্রমে তাহাদের মন ফিরিল।

এদিকে ক্রমে বিশ্বামিত্রের সংজ্ঞা হইতে লাগিল। বীণাঝঙ্কার দূরস্থ সঙ্গীত-ধ্বনির ন্যায় তাঁহার কর্ণে লাগিতে লাগিল। তিনি মূর্চ্ছিত, কত ভীষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ক্রমে শরীর শীতল হইতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিশ্বামিত্র চক্ষু মেলিলেন।

বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। গানের মৃদুমন্দ তিরস্কার ও দয়া-ভিক্ষা বিশ্বামিত্রের মনে শরবৎ বিঁধিতে লাগিল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই সম্মুখে দেখিলেন ব্রহ্মা। ক্রমে সমবেত জন-গণমধ্যে ব্রহ্মামূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। সঙ্গে দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও আবির্ভূত হইলেন। নয়নজলে শরীর স্নাত হইতেছে। তিনি যোড়করে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কোলে করিয়া লইলেন। তাঁহার মুখচুম্বন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বৎস আজি তুমি ব্রাহ্মণ হইলে।" বিশ্বামিত্র আবার কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িলেন, বাল্মীকির গান চলিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার দয়ায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "দেব, আমি কোথায়?" ব্রহ্মা বলিলেন, "পৃথিবীতে। তোমার যন্ত্রণার আমি অবসান করিয়া দিতেছি" বলিয়া নিজ কমণ্ডলুস্থিত স্বর্গীয় বারিবর্ষণে বিশ্বামিত্রের শরীরে বল প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিলেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রোদন করিতেছে। আর একজন গায়ক গান করিতেছে। বশিষ্ঠ দৌড়িয়া আসিয়া বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আজি বিশ্বামিত্রের দুর্দ্দিনে তাঁহার দয়া হইয়াছে। আর সে ভাব নাই, যে ভাবে একদিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হইতে দেন নাই। সে ভাব আর নাই। কঠিনতা গলিয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং স্বহস্তে উপবীত লইয়া মন্ত্রপূত করত বিশ্বামিত্রের গলে দিলেন। বলিলেন, "ভাইরে আজি তোয় আমায় এক হইলাম। আজি তুই বামণ হইলি। আয় দুজনে কোলাকুলি করি।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "দেব, আমি না বুঝিয়া সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া

তোমায় অনেক কষ্ট দিয়াছি, অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি, অনেক কটূক্তি করিয়াছি। আজি আমার বিপদে তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। তোমার দুঃখে কিন্তু আমি একদিনও কাঁদি নাই আজি তোমার করুণা দেখিয়া আমার নয়ন জল প্রথম পড়িল। জানিলাম 'ব্রাহ্মণ বড়ই দয়ালু'। আর ব্রহ্মন্, তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা, তোমায় কত কটূক্তিই বলিয়াছি, তোমায় কারাগারে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিতে গিয়াছিলাম। আজি আমার বিপদে তুমি আমায় প্রাণ দিলে। 'তোমার করুণা অপার।'" ব্রহ্মা বলিলেন, "বৎস, তোমার ন্যায় প্রকাণ্ড পুরুষকে ক্ষমা না করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার ক্ষমাগুণ বৃথামাত্র।"

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দেখাদেখি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সব যুদ্ধসজ্জা ত্যাগ করিয়া কোলাকুলি আরম্ভ করিল। সকলে আপনার মনোমত দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। গুহকচণ্ডাল ভয়ানক সময় আশঙ্কা করিতেছিল, তাহার এই শুভ পরিণাম দেখিয়া আহ্লাদে উর্দ্ধনৃত্য করিতে লাগিল। কৌশাম্বীনাথ যজ্ঞের এই পরিণাম দেখিয়া প্রথম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে দেখিয়া শুনিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া ভাণ্ডার-স্থিত যজ্ঞার্থ আহৃত অগাধ সামগ্রী বিশ্বামিত্রের উপনয়ন উপলক্ষে অকাতরে দান করিতে লাগিলেন। আর বাল্মীকি আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন, ভাই ভাই গাইতেছেন, আর যাহাকে পাইতেছেন গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছেন, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ, যবন, রাক্ষস, বানর কিছু জ্ঞান নাই। শেষ নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে আসিয়া ব্রহ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া একটু অপ্রতিভ হইবার

যোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে, ব্রহ্মা তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।" বশিষ্ঠ দূর হইতে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "বাল্মীকি! আজি তোমারই জয়।" বিশ্বামিত্র আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "আজি তোমারই জয়।" চারিদিক হইতে "জয় বাল্মীকির জয়" ধ্বনি উঠিতে লাগিল। গুহকের লোক চীৎকার করিয়া উঠিল "জয় বাল্মীকির জয়।" "জয় বাল্মীকির জয়।" দিগন্ত হইতে প্রতিধ্বনি আসিল, "জয় বাল্মীকির জয়।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পালামৌ

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি, এমন নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন আমার পালামৌ যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে, সে স্থান কোন্ দিকে, কত দূর; অতএব ম্যাপ্ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ডাক-গাড়ি ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময় রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ী ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়ওয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্ব্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গালায় বসিয়া পাইপ্ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকা হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে, চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই

মৃত্তিকা দ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বঙ্গ লোকই অধিক, তাহারা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে, তাহাও এক একবার দেখিতেছে, শেষে হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটীতে নদীর জল উচ্ছ্সিত হইয়া কূলের উপর উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কে এই রঙ্গ দেখিতেছি, এমত সময় কুলিদের কতকগুলি বালক-বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল। "সাহেব একটী পয়সা" "সাহেব একটী পয়সা" এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি-চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটী বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালী।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে, সে অবশ্য সাহেব।

বরাকর হইতে দুই একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? বাল্যকালে পাহাড় পর্ব্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চুণকাম করা এক গিরিগোবর্দ্ধন

দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সেই বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম, একটী সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়ওয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়ওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অনেক দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না। অতএব গাড়ওয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থানে পনর মিনিটকাল দ্রুতপাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্ব্বত সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন। ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃ পুনঃ পাইয়াছিলাম।

পরদিবস প্রায় দুই প্রহরের সময় হাজারিবাগে পৌছিলাম। তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার

আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর অবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাড়ীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ হয় নাই; তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি, সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না, বঙ্গবাসী মাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা; যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ ও বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ প্রতিবাসীরা! যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিন প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে আপনার অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার পরই ঋষিকে ওকালতীর পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক্, যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে, তাহা কোন ধনবান্ ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল।

পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটিকত বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন; না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্ত্তা। তিনি শত লোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। কোন মহানুভব ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

(২)

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন, মর্ত্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ

হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম। পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘ ভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল; কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান, সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজিদ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড়, অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়, যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন, অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম, তরঙ্গগুলি পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটী পূর্ব্বাদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিমদিকে নামে নাই। এইরূপ অর্দ্ধ পাহাড় লাতেহার গ্রাম-পার্শ্বে একটী আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিম ভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ স[illegible]র দেখা যায়; এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কাল পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে,

প্রত্যেকটী কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমোকহারাম ফরাসিস্ কুকুর আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোন একটী বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়, সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটী আছে ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আর একটী পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম, সেটী একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্ ঝর্ করিতেছে। তাহার একস্থান অনেকদূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর এক অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থ বৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থ গাছ আমার মনে পড়িয়াছিল; তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটী বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা তুই একটী বলি। অপরাহ্ণে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বত-শ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সঙ্কীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেকস্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা-পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল। বন-বর্ণনায় যেরূপ, "শাল-তাল-তমাল-হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্যগাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটীও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশী কদম্ব বৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি তুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি। খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্, তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতা আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই; বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃ-ক্রোড়ে।

অল্প বিলম্বেই অর্দ্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল। প্রান্তরের পর এক ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার নাম স্মরণ নাই; তথায় ত্রিশ বত্রিশটী গৃহস্থ বাস করে। সকলেরই পর্ণকুটীর। আমার পাল্কী দেখিতে যাবতীয় স্ত্রীলোক ছুটিয়া আসিল। সকলেই আবলুসের মত কাল, সকলেই যুবতী, সকলেরই কটিদেশে একখানি

করিয়া ক্ষুদ্র কাপড় জড়ান; বক্ষে পুতির সাতনরী তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী ঝুলিতেছে; কর্ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল; মাথায় বড় বড় বনফুল। যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু দেখিল, কেবল পাল্কী আর বেহারা। পাল্কীর ভিতরে কে বা কি, তাহা কেহই দেখিল না।

(৩)

নিত্য অপরাহ্ণে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শতকার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন, তাহা কখন ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমার সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি, এ বেগ আমার একার নহে; যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে; জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে। জলে যে যাইতে পারিল না, সে অভাগিনী, সে গৃহে বসিয়া দেখে, উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে; বাহির হইয়া সে দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

এই পাহাড় অতি নির্জ্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই, সর্ব্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মৌয়া গাছ তথায় বিস্তর। তাহারই মধ্যে একটীকে

আমি বড় ভালবাসিতাম, তাহার নাম "কুমারী" রাখিয়াছিলাম। কখন তাহার ফুল কি ফল হয় নাই; কিন্তু তাহার ছায়া বড় শীতল ছিল। আমি সেই ছায়ায় বসিয়া "দুনিয়া" দেখিতাম। এই উচ্চ স্থানে বসিলে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারিদিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেইখানেই পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটী গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে। আমার তাঁবু যেন একটী শ্বেত কপোতী জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম; আর ভাবিতাম, এই আমার "দুনিয়া"।

যেরূপ নিত্য লাতেহার-পাহাড়ে যাইতাম, সেইরূপ অন্য একদিন যাইতেছিলাম; পথে দেখি, একটী যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম, যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে, তখন যুবার রাগ নিশ্চিত ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এক-কালে এরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাহাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

আমি যখন নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সে বাঘ না মারিয়া কোন মুখে আর জলগ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম,

"চল, তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোট-পেণ্টুলন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং এ কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে, অতএব সাহেবি ধরণে নিঃসঙ্কোচচিত্তে চলিলাম।

যুবার সঙ্গে কতকদূরে গেলে সে আমায় বলিল, "আমি বাঘটী স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল, তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল। "স্বহস্তে মারিব" এই কথায় বুঝাইয়াছিল, পরহস্তে বাঘ মারা সম্ভব; আমি সাহেব-বেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চিত ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতকদূরে গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গি, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর কতকদূর গিয়া দেখি, পাহাড়ের একস্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটী গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী কুটীর, চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকট একস্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোক বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর-সংযুক্ত একটী থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটী একবার চাটিয়াছিল। যেদিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল; আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া

পড়িবে।” তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম। শেষে সে একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, “আসুন, এইখানি ঠেলিয়া তুলি।” উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর উহা ঘোররবে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানি না, ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মিবার

দুইবার চিতোরে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সন্তোষ বিধান করিয়া রাজপুত বীরেরা দুই বারেই স্বরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমবার হিন্দুশোণিত-পিপাসু আলাউদ্দীন বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিলে দ্বাদশটী রাজপুত্র পর্য্যায়ক্রমে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে আত্মবলি দিয়াও রাজ্যরক্ষা করিতে ক্রটী করেন নাই। দ্বিতীয়বার দুর্দ্দান্ত বাহাদুর জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া চিতোর ছারখার করিলে দেবলরাজ চিতোরেশ্বরীর প্রীতির জন্য আপনার দেহ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইবার তৃতীয় সঙ্কটে তরুণবীর আক্‌বরের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করেন, সেরূপ মহাপুরুষ দৃষ্ট হইল না। অত্যল্পকালের মধ্যেই চিতোরনগরী ছারখার হইল, শিশোদীয়-কুলের চিরস্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল, তাঁহাদিগের চিরগৌরব যবন-করে প্রণষ্ট হইল, হতভাগ্য উদয়সিংহের সহিত চিতোরেশ্বরীর দেবীমূর্ত্তিও তিরোহিত হইলেন। যে চিতোর বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় নগর সমূহের শীর্ষস্থল অধিকার করিয়াছিল, যে চিতোর আর্য্যরাজচক্রবর্ত্তিগণের লীলানিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে নগরী এক সময়ে কমলার বাসভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইত, এতদিনে সেই মহানগরী বন্যজন্তু সমূহের আশ্রয়কুহরে পরিণত হইল।

চিতোর হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে আক্‌বর শিবিরশ্রেণী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রধান শিবিরের মধ্যভাগে

একটী মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম "আক্‌বরকা দেওয়া" (আক্‌বরের দীপমন্দির)। অদ্যাপি উহা বিদ্যমান আছে।

উদয়সিংহের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে যদিও চিতোরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির হ্রাস হইয়াছিল, যদিও রাজপুত বীরগণের হৃদয় বীরতেজে তাদৃশ উত্তেজিত ছিল না, তথাপি সেই দুর্দ্দিনে অপরাপর রাজ্য-খণ্ডের রাজপুত বীরেরা চিতোর রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক হইতে চিতোরে সমবেত হইয়াছিলেন। স্বদেশ রক্ষার জন্য—স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য—আর্য্যবীরগণের হৃদয় শতগুণে উত্তেজিত হইয়া উঠে, শতগুণ বলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহারা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আক্‌বর শাহ চিতোরের সম্মুখে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিবামাত্র চরিদিক্ হইতে রাজপুতবীর মহাবিক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অসংখ্য চন্দাবৎসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া শাহিদাস চিতোরের সূর্য্যতোরণ রক্ষার জন্য জীবনান্তকর রণে প্রবৃত্ত হইলেন। যতক্ষণ তাঁহার দেহে প্রাণবায়ু বিদ্যমান ছিল শত্রুসৈন্যের একজনও ততক্ষণ সে দ্বারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। ঐ তোরণদ্বারে যে স্থলে তিনি শোণিতাক্ত-কলেবরে রণশায়ী হইয়াছিলেন, আজিও তথায় তাঁহার চিতাবেদিকা বিরাজিত আছে।

শাহিদাস রণভূমে নিপতিত হইলে সামন্ত সঙ্গের বীরবংশধরগণকে লইয়া নাদেরিয়ার রাবৎদুদা সমরে অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গের বংশধরেরা চন্দাবৎ গোত্রের একটী শাখা, ইহারা সঙ্গাবৎ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। এদিকে বৈদলাও কোতেরা হইতে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বংশজাত দুইজন সামন্তনৃপতি, বিজলি ও সত্রি হইতে প্রমার ঝালাপতি এবং বেদনোরের অধিপতি জয়মল্ল ও কৈলবার

শাসনকর্ত্তা পুত্ত আসিয়া সমরসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে জয়মল্ল ও পুত্ত এই দুই জনেই রাজপুতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কবিগণ ইহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাদিগের গুণে, মহত্ত্বে ও বীরত্বে বশীভূত হইয়া তৎকালীন রাজপুত বীরেরা প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় প্রথমেই ইহাদিগের পবিত্র নাম স্মরণ করিতেন। অদ্যাপি রাজবারা প্রদেশের অনেক স্থলে সেই প্রথা প্রচলিত আছে। রাণা উদয়সিংহ ইহাদিগকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন নাই, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই ইহারা চিতোর-রক্ষণর জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই মহাসমরে স্বরাজ্য রক্ষার উদ্দেশে—স্বধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশে—অনেকগুলি অসূর্য্যম্পশ্যা ক্ষত্রিয়-কুমারীও অসিচর্ম্মধারণপূর্ব্বক বর্ম্মাবৃত কলেবরে রণচণ্ডীবেশে সমর ক্ষেত্রে দর্শন দিয়াছিলেন।

সূর্য্য-তোরণ-রক্ষক শাহিদাস শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলে কৈলবার পুত্ত সেই পদে নিয়োজিত হইলেন। পুত্তের বয়ঃক্রম তখন ষোড়শ বর্ষ। চিতোর রক্ষার জন্য তাঁহার বীর পিতা ইতি-পূর্ব্বে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। পুত্তের প্রতিপালনার্থ তদীয় জননী পতির সহগামিনী হইতে পারেন নাই। আজি তিনি স্বহস্তে পুত্রকে রণশয্যায় সজ্জিত করিয়া চিতোর রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। পুত্রকে রণসাগরে ঝম্পপ্রদানে আদেশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; বীর পুত্রের অনুগমন করিয়া জগতে তিনি বীরবালার জ্বলন্ত উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। পত্নীর জন্য চিন্তা করিয়া রণক্ষেত্রে পাছে পুত্র নিস্তেজ হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রের

বালিকা স্ত্রীকেও এই ভীষণ কঠোর ব্রতে দীক্ষিত করিলেন। কঠিন লৌহবর্ম্মে পুত্রবধূর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হইল; বধূকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রফুল্লবদনে তিনি রণসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। বীরাঙ্গনাদ্বয়ের বীরত্ব দর্শনে চিতোর বীরগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। বীরাঙ্গনাদ্বয়ের কুসুম-সুকোমল হস্তে অসংখ্য যবন বীর নিপতিত হইয়া রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

পুত্রের জননী ও পত্নীর এইরূপ মহাবীরত্ব দেখিয়া চিতোরবাসিনী রাজপুতললনাগণের হৃদয়ে বীর্য্যবহ্নি সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা রণমদে উন্মত্ত হইয়া, জীবনের মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, গগনবিদারী ভীমনাদে রণভূমি বিকম্পিত করিয়া প্রচণ্ডবেগে মোগল-সেনার দিকে প্রধাবিত হইলেন। জীবনস্বরূপিণী চিতোরপুরী রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; চিতোর রক্ষা হইল না।

চরম সাহসে নির্ভর করিয়া রাজপুত বীরাঙ্গনাগণ বীর বিক্রমে যবনব্যূহের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একটী প্রজ্বলিত গুলিকা সবেগে আসিয়া সেনাপতি জয়মল্লের গাত্রে আঘাত করিল; তৎক্ষণাৎ তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। ভীষণ ক্রোধে জয়মল্লের হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল; জিঘাংসা তাঁহার হৃদয় অধীর করিয়া তুলিল। কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করিয়া শত্রুপক্ষ তাঁহাকে আঘাত করিল, যাতনায় বীরবরের হৃদয়-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভবিষ্য ভাগ্যগগনের দিকে আর তিনি নেত্রপাত করিলেন না; স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, চিতোর রক্ষার আর আশা নাই। তখন তিনি জহর ব্রতানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তৎক্ষণাৎ ভীষণ ব্রতের আয়োজন হইল।

এদিকে আট সহস্র রাজপুতবীর একত্র বসিয়া চিরদিনের জন্য শেষ তাম্বুলচর্ব্বণ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। চরমকালীন পীত বস্ত্র ধারণ করিয়া অবিলম্বেই সকলে বিপুলবিক্রমে শত্রু-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

চিতোরের তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইল। ভয়ঙ্করী হত্যার ভীষ মূর্ত্তি যেন চিতোরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। একে একে সমস্ত রাজপুতবীর অম্লানবদনে রণভূমে নিপতিত হইয়া নিঃশঙ্কহৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ একটী মাত্র রাজপুতবীর জীবিত রহিল, ততক্ষণ যবন সেনার কেহই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। জন্মভূমি চিতোর রক্ষার জন্য আপন আপন হৃদয়-শোণিতদানে মোগল সম্রাট্ আক্‌বরের শোণিত পিপাসার শান্তি করিয়া একে একে ত্রিংশৎ রাজপুত বীর অনন্ত নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিলেন; যবনেরা আক্‌বরকে "জগৎগুরু" অভিধানে সম্বো ন করিতেন, সম্রাটের সেই উপাধি আজি সার্থক হইল; অসংখ্য রাজপুতবীরের ছিন্ন মস্তক পদদলিত করিয়া, অসংখ্য নরনারীর হৃদয় শো ণতে পদতল বিধৌত করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে মহাবীর সম্রাট্ আক্‌বর বিষাদময় চিতোর-দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

চিতোরদুর্গ জনশূন্য শোকাবহ বিষাদের তিমিরে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, চিতোর শ্মশানভূমিতে পরিণত! ১৬২৪ সংবতে (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে) ১২ই চৈত্র রবিবার চিতোরের এই সর্ব্বনাশ ঘটিল। বাপ্পার কুলদেব ভগবান দিবাকর এই শেষ রবিবারে তাঁহার হতভাগ্য বংশধরগণের প্রতি বিমুখ হইলেন। চিতোরের সপ্তদশশত আত্মীয়-স্বজন, অসংখ্য সেনাপতি ও অসংখ্য সৈন্য এই

কাল সময়ে চিরদিনের জন্য অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। নয় জন মহিষী, পাঁচজন রাজকুমারী, দুইটী শিশু এবং সামন্তসমিতির অসংখ্য সীমন্তিনী আপন আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধস্থলে বীরত্বের পরিচয় দিয়া, কেহ বা বহ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। পাষাণহৃদয় আক্‌বর কর্ত্তৃক চিতোরের সুন্দর সুন্দর দেবালয় ও সুন্দর সুন্দর প্রাসাদগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইল। নিষ্ঠুর আলাউদ্দীন ও বাহাদুরের বিদ্বেষাগ্নি হইতে চিতোরের যে সমস্ত রাজপ্রাসাদ ও অট্টালিকা নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, আক্‌বর কর্ত্তৃক তৎসমস্তই বিধ্বস্ত হইল। ভারত-আক্রমণকারিগণের মধ্যে তিনিই নৃশংসতম বলিয়া কলঙ্কিত হইয়া রহিলেন।

যে সকল রাজপুতবীর চিতোরের মহাযুদ্ধে রণশায়ী হইলেন, তাঁহাদিগের যজ্ঞোপবীত ওজন করিয়া মহাবীর আক্‌বর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ৭৪॥ মণ হইল। তৎকালে চারি সেরে এক এক মণ ধরা হইত। আক্‌বরের আদেশে প্রত্যেকের লিখিত পত্রে ঐ ৭৪॥ সংখ্যা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। গৃহস্থ, বণিক, শ্রেষ্ঠী, প্রেমিক যিনি যখন আপন আপন অভিপ্রেত ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিবেন, শিরোনামের বিপরীত দিকে ঐ ৭৪॥ সংখ্যা অঙ্কিত থাকিবে; নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন যিনি ঐ পত্র খুলিবেন, তাঁহাকে চিতোর ধ্বংসের পাপ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ দিব্য দিয়া আক্‌বর সর্ব্বত্র ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন। তদবধি আবহমানকাল ভারতের সর্ব্বত্র ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শৈশবে সংযম

মানুষের স্বভাব-চরিত্র-সূত্র যখন জন্মের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়, তখন শৈশবকাল জ্ঞানে সম্পূর্ণ বা অত্যন্ত অভাবের কাল হইলেও, তখনও স্বভাবচরিত্র গঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু স্বভাবচরিত্র গঠন পক্ষে জন্মের পূর্ব্বে যেরূপ কারণ উপস্থিত থাকে, জন্মের পর অজ্ঞানাবস্থায় বা জ্ঞানের বহুল অভাবের সময়, সেরূপ কারণ আর উপস্থিত থাকে না; তখন অন্যরূপ কারণ উপস্থিত হয়। মানুষের উপর বাহ্যপদার্থাদির ক্রিয়া হইতে থাকে। ঐ সকল পদার্থের ক্রিয়া সম্বন্ধে একটী গূঢ় তথ্য আছে। উহাদের ক্রিয়া মানুষের জ্ঞাতসারেও যেমন হইয়া থাকে, অজ্ঞাতসারেও তেমনই হয়। বৃষ্টির জলে ভিজিয়া পীড়িত হইলাম, ইহাতে আমার দেহের উপর বৃষ্টির জলের ক্রিয়া আমার জ্ঞাতসারেই হইল। এইরূপ দেহের উপর অনেক বাহ্যপদার্থের ক্রিয়া আমার জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে। কিন্তু দেহের উপর বাহ্যপদার্থের ক্রিয়া অজ্ঞাতসারেও হয়। কোন একটী স্থান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হইল। ঐ জ্বরের বীজ বাহ্যপদার্থে থাকে। যখন সে স্থানে ছিলাম, তখন ঐ বীজ যে আমার দেহে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই—উহা অজ্ঞাতসারে আমার দেহ অধিকার করিয়াছিল। অনেক রোগের বীজই এইরূপে অজ্ঞাতসারে দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু বাহ্যপদার্থের ক্রিয়া কেবলই যে দেহের উপর অজ্ঞাতসারে হয়, তাহা

নহে ; মনের উপরও হয়। জন্ম হইবামাত্র মানুষ অসংখ্য বাহ্যবস্তুর মধ্যে স্থাপিত হয় এবং তখন হইতেই মানুষের উপর—মানুষের দেহ এবং মন দুয়েরই উপর—ঐ সকল বস্তুর ক্রিয়া হইতে থাকে। দেহের উপর যে ক্রিয়া হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সদ্যোজাত শিশুর দেহে শীতল বায়ু লাগিলে, তাহার অবিলম্বে পীড়া হয়। কিন্তু বাহ্যবস্তুর সংস্রব তখন হইতে যে তাহার মন সম্বন্ধেও নিষ্ফল হয় না তাহাও শীঘ্র বুঝিতে পারা যায়। বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার ফলে যে শিশুর দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে, সে সুস্থকায় শিশুর ন্যায় প্রফুল্ল হয় না। শিশুর প্রফুল্লতা কতটা তাহার শরীরের ধর্ম্ম, কতটা তাহার মনের ধর্ম্ম, তাহা ঠিক করা কঠিন। বোধ হয়, তাহা দুয়েরই ধর্ম্ম। শরীরকে মন হইতে পৃথক্ করা যায় না। মনকেও শরীর হইতে পৃথক্ করা যায় না। শরীর এবং মন পরস্পরের সহিত অতি গূঢ় সম্বন্ধে সংযুক্ত। তত্ত্বজ্ঞানের কথা এই, শরীর মন হইতে পৃথক্ ত নয়ই, প্রকৃতপক্ষে মনের দ্বারাই নির্ম্মিত, অর্থাৎ শরীর মনের ফল মাত্র। সুতরাং বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার ফল কেবলমাত্র দেহে বা কেবলমাত্র মনে নিঃশেষিত হয় না। হাত পুড়িয়া গিয়া যখন জ্বালা করিতে থাকে, তখন মনের ক্রিয়ারও অল্পাধিক ব্যতিক্রম ঘটে এবং দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় মন অভিভূত হইলে শরীরও অল্পাধিক অসুস্থ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ নিয়ম জীবনের সকল সময়েই খাটে। শৈশবে খাটে না, এমন হইতে পারে না। সদ্যোজাত শিশুর শরীর আছে, কিন্তু মন নাই, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। মানুষের যাহা যাহা আছে, মানুষ সে সমস্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর কেবল তাহার উন্নতি অবনতি হ্রাস বৃদ্ধি, বিকৃতি পরিষ্কৃতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

নবজাত শিশুরও দেহ এবং মন দুইই আছে। তাহার দেহের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার যেরূপ পরিষ্কার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মনের উপর ঐ সকল বস্তুর ক্রিয়ার সেরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, ঐরূপ ক্রিয়া হয় না, এ প্রকার অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা অন্যায় ও অযৌক্তিক। জন্মের পর হইতেই শিশুর মনের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া হইতে থাকে; কিন্তু এত গূঢ়, প্রচ্ছন্ন ও সঙ্কীর্ণ ভাবে হইতে থাকে যে তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। অজ্ঞান শিশু যখন কোন বিচার করিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ একজনের কোলে কাঁদে, আর একজনের কোলে শান্তভাবে থাকে, তখন বোধ হয়, তাহার মনের উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার নিদর্শনই লক্ষিত হয়। যে তাহাকে সর্ব্বদা কোলে করিয়া থাকে, তাহাকে স্তন্য পান করায়, দোলাইয়া দোলাইয়া গান করিয়া করিয়া ঘুম পাড়ায়, জননী না হইলেও, সে তাহার কোলে যেমন মনের সুখে থাকে বলিয়া বোধ হয়, অন্যের কোলে তেমন থাকে না। ইহা যেন শিশুর পক্ষপাতিতা বলিয়াই মনে হয়। এ পক্ষপাতিতা যে অভ্যাস-জনিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। অজ্ঞান শিশু স্নেহের কার্য্যের পৌনঃপুন্যে অভ্যস্ত হয় বলিয়াই, এক এক ব্যক্তির পক্ষপাতী হয়। একবার মাত্র একটু স্নেহ বা সহানুভূতি পাইলে, সে কাহারও পক্ষপাতী হয় না; বহুবার স্নেহ বা সহানুভূতির কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে তবে হয়। কিন্তু অভ্যাসে একটু মনের প্রয়োজন। কোন কাজ বার বার করা হইলেও, তাহা যদি মনে না থাকে, স্পষ্টভাবেই হউক, আর অস্পষ্টভাবেই হউক, তাহার যদি কিছুমাত্র স্মৃতি না থাকে, তবে তৎপ্রতি আকৃষ্ট বা পক্ষপাতী হইতে পারা যায় না। অজ্ঞান শিশু যে এক এক

ব্যক্তির পক্ষপাতী হয়, তাহার অর্থ এই যে, তাহাতেও মনের ক্রিয়া হয় ; যতই ছুর্নিরীক্ষ্য হউক তাহাতেও মনের ক্রিয়া হয় এবং তাহাকেও অভ্যাসের ফলগ্রহণ বা স্বীকার করিতে হয়। অজ্ঞান শিশুর যে মনের ক্রিয়া হয় তাহার আরও অনেক প্রমাণ বা নিদর্শন পাওয়া যায় ৮ ছয় মাস, সাত মাস বা আট মাসের শিশুকে লইয়া ভৃত্যেরা অপরাহ্লে বাটীর বাহিরে পথে পথে বেড়ায় বা মুক্ত স্থানে বসিয়া থাকে। দিন কতক এইরূপ করা হইলে, ঐরূপ শিশুদিগকে ঐ সময়ে বাটীর ভিতর রাখিয়া দেওয়া কঠিন হয়—রাখিয়া দিলে তাহারা কাঁদে অথবা অসুখ বা অসন্তোষের অন্য লক্ষণ প্রদর্শন করে এবং বাটীর বাহিরে গেলেই শান্ত হয় ও বেশ একটু উল্লাস প্রকাশ করে। তখন মাতা বা অপর যে স্ত্রীলোকের কাছে তাহারা থাকিতে ভালবাসে, তিনি মধুর সম্ভাষণ করিতে করিতে কোল পাতিলেও তাঁহার কোলে যায় না। ইহাতে শিশুর মনের ক্রিয়া এবং অভ্যাসের বশবর্ত্তিতা দৃষ্ট হয় বলিয়া অনুমান করা অযৌক্তিক নয়।

অজ্ঞান শিশুই যখন মানসিক ক্রিয়ার স্থল এবং অভ্যাসের ফলভোগী, তখন যে শিশুর জ্ঞান অল্লাধিক পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহার মনের অনুরাগ বিরাগ এবং অভ্যাসের বশবর্ত্তিতা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক। সংস্কৃত অভিধানে যোলবৎসরের অনধিক-বয়স্ক বালককে শিশু বলে। বাঙ্গলা অভিধানে আট বৎসরের অনধিক-বয়স্ককে শিশু বলে। সচরাচর শিশু বলিতে আমরা পাঁচ, ছয়, সাত, আট বৎসরের অধিক-বয়স্ক বুঝি না। কিন্তু ঐ বয়সের মধ্যেই শিশুর যেরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে এবং মনের অনুরাগ-বিরাগাদি যেরূপ প্রবল হইতে দেখা যায়, তাহাতে অভ্যাসের ফল অব্যর্থ এবং অনিবার্য্য

হইবারই কথা। অনেক স্থলে সেইরূপ হইতে দেখা গিয়া থাকেও বটে ; সুতরাং সন্তান যাহাতে বড় হইয়া সংযমী হইতে পারে তজ্জন্ত তাহার জন্মের আগে পূর্ব্বপুরুষদিগের সংযমী হইতে হইবে এবং জন্মের পর পিতামাতা প্রভৃতিকে অতি সাবধানে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, সংযমী হইতেই যেন তাহার আনন্দ ও অভিলাষ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে।

এখন কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় কেহই এরূপ করেন না। অনেকেই মনে করেন যে, শিশুকে লইয়া কড়াকড়ি করিবার প্রয়োজন নাই—তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে আল্‌গা রাখায় ক্ষতি নাই—সে বালক হইয়া উঠিলে পর, তাহার শাসন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে। এরূপ মনে করা বড় ভ্রম। জন্মের পর হইতে যখন শিশুর দেহ এবং মন দুয়েরই উপর বাহ্যবস্তুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন সেই সময় হইতেই তাহার দেহ এবং মন উভয়েরই শিক্ষা ও শাসনের কঠিন ব্যবস্থার প্রয়োজন। বাহ্যবস্তু বড় সহজ জিনিস নয়। উহা আমাদের দেহের সহিতও কথা কয়, মনের সহিতও কথা কয়—জন্মকাল হইতেই কথা কয়। উহারা এতই বলশালী যে, উহাদের কথায় আকৃষ্ট, এমন কি, মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। এই জন্য আমাদের ইহ্‌কাল ও পরকাল দুই-ই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব যাহাতে উহাদের অধীন না হইয়া, উহাদিগকে আমাদের অধীনতা স্বীকার করাইতে পারি, তজ্জন্য, উহারা যখন আমাদের সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করে, সেই শৈশবকাল হইতে এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য যে, উহারা আমাদিগকে সুকথা ভিন্ন কুকথা শুনাইতে না পারে। পূর্ব্বে আমরা অনেকটা সেইরূপ করিতাম, এখন প্রায়ই তাহার বিপরীত করি। শিশুর

শরীর যাহাতে শক্ত হয়, হিম-তাপাদিতে ক্লিষ্ট না হয় এবং ক্রমে ক্রমে বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং শ্রমক্ষম হইয়া উঠে, পূর্ব্বে এইরূপে শিশুর পরিচর্য্যা করা হইত। এখন জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতে শিশুকে পশম ফ্ল্যানেল জামা মোজা টুপি প্রভৃতিতে যে ভাবে মুড়িয়া রাখা হয় তাহাতে বিধাতার বায়ু, বিধাতার বারি, বিধাতার রৌদ্র, বিধাতার আলোকের সহিত তাহার দেহের সম্বন্ধ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ত থাকেই না, প্রত্যুত এত দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে যে সৃষ্ট পদার্থের গঠন পক্ষে উহাদের যে প্রভূত কার্য্যকারিতা আছে, তাহা তাহাদের দেহের গঠন-সম্বন্ধে একরূপ নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য, যখন কোন কারণে উহাদের সহিত ঐ দেহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়া পড়ে, তখন উহারা ঐ দেহের সহিত কুকথাই কয়, অর্থাৎ পীড়া প্রভৃতি অনিষ্টোৎপাদন করে। এই রূপ পরিচর্য্যার ফলে এখনকার শিশুর শরীর বড় বেশী মাত্রায় কোমল, সুকুমার বা রোগপ্রবণ হইয়া পড়িতেছে, এবং বড় হইয়া পুরুষোচিত কঠিনতা লাভ করিতে না পারিয়া, দুর্ব্বল, রুগ্ন অথবা নিস্তেজ হইতেছে। যাহাদের দেহ এইরূপ, তাহাদের মনও এইরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা সংযম সাধন করিতে পারে না। এখন আমরা এক বেলা না খাইলে এতই অবসন্ন হইয়া পড়ি যে, বিবাহার্থ কন্যা-সম্প্রদান করিবার ভার অন্যের উপরে অর্পণ করিতে বাধ্য হই। আমরা ছেলেপুলের যে প্রকার নামকরণ করিতেছি, অর্থাৎ কাহাকেও রমণীমোহন, কাহাকেও নলিনীকান্ত, কাহাকেও কিরণশশী, কাহাকেও ননী-গোপাল, কাহাকেও কামিনীরঞ্জন নাম দিতেছি—তাহাতে মনে হয় যেন আমাদের শরীরের ন্যায় মনও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অর্থাৎ, আমাদের শরীর এবং মন দুই-ই বা মেয়েলি রকমের

হইতেছে। ইহাতে সংযম-সাধন আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িতেছে। তাই জন্মের পূর্ব্ব হইতে এবং জন্মমুহূর্ত্ত হইতে সংযমী হইবার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের শিশুদিগের শরীর যাহাতে শক্ত হয়, তজ্জন্য তাহাদের প্রথম পরিচর্য্যা কতকটা পূর্ব্বের প্রণালী মত হওয়া আবশ্যক। তাহারা একটু বড় হইলে, অর্থাৎ তিন চারি বৎসর অতিক্রম করিলে, আমরা তাহাদের পশম ফ্ল্যানেল প্রভৃতি কমাইয়া দিয়া অথবা একেবারে সরাইয়া ফেলিয়া, আর এক প্রকারে তাহাদের দেহ ও মনের অনিষ্ট করিতে থাকি। পশম ফ্ল্যানেলের পরিবর্ত্তে, তাহাদিগকে অতিশয় মিহি জামা প্রভৃতি পরাই। তাহাতে তাহাদের শরীর আরও কোমল হইয়া পড়ে এবং পুরুষোচিত কাঠিন্যলাভের আরও অনুপযুক্ত হয়। তাহারা যেন ননীর পুতুল হইয়া উঠিতে থাকে। ও দিকে তাহাদিগকে আমরা নানা প্রকারে লুব্ধ করিয়া তুলিতেছি। আমারা অন্নকষ্ট স্বীকার করিয়া, এমন কি ঋণ করিয়াও পূর্ব্বের সেই আটপৌরে মোটা কাপড় এবং গড়া এবং পূজা পার্ব্বণের সেই একটু ঢাকাই কাপড় আর চাদরের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে ভাল ভাল জুতা, ভাল ভাল মোজা, সাটিন, মক্‌মল, জরির জামা, পায়জামা, পালকওয়ালা টুপি প্রভৃতি পরাইয়া এবং পূর্ব্বের সেই নির্দ্দোষ পুষ্টিকর মুড়ি-মুড়কি, রসকরা, থইচুর, চন্দ্রপুলি, ঝুনা নারিকেল, শসা, কলা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ঠোঙা ঠোঙা বিষবৎ মিঠাই খাওয়াইয়া তাহাদিগকে এমনই লুব্ধ মুগ্ধ অভিভূত করিয়া ফেলিতেছি যে, বড় হইয়া তাহারা এই সকলের মোহ কাটাইতে পারে না। সুতরাং এই সকলের জন্য তাহারা দিশাহারা, দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে। বাহ্যবস্তু দ্বারা আমাদের শিশুদিগকে আমরা অতিশয়

কুকথা, প্রকৃত মারাত্মক কথা শুনাইতেছি। তাই বাহ্যবস্তর জন্য তাহারা পাগল—ইচ্ছামত বাহ্যবস্ত না পাইলে, তাহাদের উৎপাত, উপদ্রব, দৌরাত্ম্যের সীমা থাকে না—এ সকলের জন্য এদেশে আগে কেহ কখনও যাহা করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না, কখন কখন আত্মহত্যারূপ সেই মহাপাতক পর্য্যন্ত করিতেছে। কিন্তু সে মহাপাতক প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মহাপাতক নয়, আমাদেরই মহাপাতক। আমরা তাহাদিগকে যে কদভ্যাস ও কদাচারের পথে লইয়া গিয়া, লুব্ধ মুগ্ধ অশান্ত এবং অসংযমী করিতেছি, তাহার বিপরীত পথে তাহাদিগকে আনিতেই হইবে। নহিলে কি ঐহিক, কি পারত্রিক, কোন ইষ্টই আমরা লাভ করিব না, মনুষ্যোচিত কোন কর্ম্মই করিতে পারিব না। ঘোর অসংযমী হইয়াছি বলিয়াই এখন আমরা কেবল আড়ম্বর আস্ফালন করিতেছি, আমাদের সকল কর্ম্মেই অজের যুদ্ধ, ঋষির শ্রাদ্ধ, প্রভাতে মেঘাড়ম্বর ও দম্পতির কলহের ন্যায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইতেছে।

আমাদের শিশুদিগকে যে পথে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না। তাহা আমাদের বড় সুপরিচিত পথ। সে পথ যে পরিমাণে ভারতবাসীর, অন্য কাহারও সে পরিমাণে নয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে, বহুযুগযুগান্তর হইতে, তাহা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই সরল প্রলোভনশূন্য, বিনাব্যয়ে গম্য, মনুষ্যত্বাভিমুখী পথ—যে পথে গেলে শিশুর শরীর সুস্থ, শক্ত, কষ্টসহিষ্ণু হইয়া থাকে এবং রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় প্রভৃতি বাহ্যবস্তর নিকট মোহকর কথা না শুনিবার ফলে, সে আপনাকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবার এবং

সংযমশক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হয়, শিশুকে সেই পথে পরিচালিত করিলে, অর্থাৎ, তাহাকে বাহ্যবস্তুর মোহে মুগ্ধ এবং প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইতে না দিলে, সে এখনকার ন্যায় রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি দুরন্ত রিপুর ক্রীড়াস্থল হইবে না। সুতরাং সকল বিষয়ে সংযত ও সুমতিসম্পন্ন হইবার ফলে সুপথে অগ্রসর হওয়া, তাহার পক্ষে সহজ ও সুখকর হইবে; আনন্দ ও উৎসাহ সহকারেই সে সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাহাতে কুপথে চালাইয়া দিয়া অর্থাৎ ব্যহ্যবস্তুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ করাইয়া এবং দুরন্ত রিপুদ্বারা উত্তেজিত করাইয়া দিয়া, আমরা এখন তাহাকে লইয়া যেমন বিপন্ন—ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি, হয় ত তাহাকে যাবজ্জীবন বালাই বিড়ম্বনা মনে করি, তখন আর সেরূপ হইবে না।

এখন ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ। কাজ বড় কঠিন; কারণ, আমরা আপনারাই মানসিক ও শারীরিক শক্তিহীন, বাহ্যবস্তুর মোহে অভিভূত, অত্যন্ত অসংযত। সন্তান-সন্ততিকে সুশাসিত ও সুসংযত করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। কিন্তু সে কাজ আমাদিগকে করিতেই হইবে। করিবার আবশ্যকতা পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিলে, সে কাজে আমাদের মতি ও প্রবৃত্তি হইবে। তখন আমাদের ইচ্ছাশক্তি বাড়িতে থাকিবে, নিদ্রিত পুরুষকার জাগরিত হইলে, আমরা আপনারাও সংযম শিখিব এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আমাদের সন্তান সন্ততিকেও সংযত ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ করিতে সমর্থ হইব। ইহাই এখন আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ, বোধহয় বলিতে পারি, একমাত্র কাজের মতন কাজ। আমরা প্রতিগৃহে, প্রত্যেকে, এই কাজে সিদ্ধিলাভ করিতে

পারিলে, আমাদের সমস্ত জাতি বা সমাজের যে একটা নৈতিক শক্তিমত্তা ও সমুত্থান হইবে, তাহার ফলে আমাদের অন্যান্য গুরুতর কার্য্য স্বাভাবিক সহজ ও সুসাধ্য হইয়া পড়িবে। এখন আমরা অনেক কার্য্যই অস্বাভাবিকভাবে করিতেছি, সুতরাং করিতে পারিতেছি না। এখন কিছুকাল আমরা নীরবে গৃহের ভিতর গোড়ার কাজ করিলে, তবে গৃহের বাহিরে যাইবার উপযুক্ত ও অধিকারী হইব।

চন্দ্রনাথ বসু।

মাৎসর্য্য

অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাৎসর্য্যের পরম ঔষধ। যে যাহাকে ভালবাসে সে কখনও তাহার শ্রী দেখিয়া কাতর হইতে পারে না; ভালবাসার পাত্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে আনন্দেরই বৃদ্ধি হয়, কখন প্রাণে মাৎসর্য্য স্থান পাইতে পারে না। অতএব যাহার শ্রী দেখিলে কাতর হই, তাহার সদ্‌গুণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া যদি কোন প্রকারে হৃদয়ে তাঁহার প্রতি ভালবাসার ভাব আনিতে পারি, তবে কখন তাহার প্রতি মাৎসর্য্যের দ্বারা ক্লিষ্ট হইব না। এইরূপ যতই ভালবাসা অপর লোকের উপর ছড়াইয়া পড়িবে, ততই মাৎসর্য্যের হ্রাস হইবে। এই জন্য যাহাদিগের প্রতি কোনরূপ মাৎসর্য্যের ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের সহিত সর্ব্বতোভাবে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সঙ্কীর্ণতা মাৎসর্য্যের প্রধান পোষক। যে মনে করে সুখ, সম্ভ্রম, সম্পদ যাহা কিছু ছিল অমুক ব্যক্তি ভোগ করিয়া লইল, আমার জন্য ত কিছুই রহিল না, সে পরের সুখ, সম্ভ্রম, সম্পদ দেখিলে প্রাণে কষ্ট পাইতে পারে; কিন্তু যাহার মনে হয় এই প্রকাণ্ড পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে, অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে লোকের সুখী, সম্ভ্রান্ত অথবা সম্পত্তিশালী হওয়ার পথের অন্ত নাই, প্রত্যেকেরই পৃথিবিতে কোন না কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইবার অধিকার আছে, তাহার হৃদয়ে মাৎসর্য্য রাজত্ব করিতে পারে না। যত উদারতার বৃদ্ধি, তত মাৎসর্য্যের নাশ।

পরনিন্দা মাৎসর্য্যের প্রধান সহচর। প্রাণের ভিতরে যত মাৎসর্য্যের অধিকার বিস্তৃত হয়, তত পরনিন্দায় জিহ্বা নৃত্য করিতে থাকে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি যত কমাইতে পারিবেন, মাৎসর্য্যও তত আঘাত পাইবে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি দমনের জন্য দুইটী উপায় উৎকৃষ্ট। (১) নিন্দুক আপনার স্বীয় জীবনের দোষগুলি সর্ব্বদা মনের সম্মুখে রাখিবেন। যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রৎ, সে ব্যক্তি পরের নিন্দা করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারে না। আপনার দিকে তাকাইয়া তাহার মুখ শুকাইয়া যায়, সে আর পরের দোষের আলোচনা করিবে কি? (২) পরের দোষানুসন্ধান না করিয়া পরের গুণানুসন্ধান করিতে করিতে তাহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস যত বৃদ্ধি পাইবে, পরনিন্দার প্রবৃত্তি তত কমিয়া যাইবে। সর্ব্বদা পরের গুণ-কীর্ত্তন যাঁহারা করেন সেইরূপ বালকের সংসর্গ এ সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী। নিতান্ত নিকৃষ্ট পাপীর জীবনেও গুণানুসন্ধান করিয়া তাহার গুণ-কীর্ত্তন করিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। যাঁহার নিন্দা করিতে তোমার মন উৎসুক হইবে, তাঁহার চরিত্রে ক্রমাগত গুণানুসন্ধান করিতে থাকিবে, কতকগুলি গুণ পাইবেই পাইবে, বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যখনই আলাপ হইবে তখনই সেই গুণগুলির বিশেষ উল্লেখ করিবে ও তাহার মহত্ত্ব ঘোষণা করিবে। এইরূপ করিতে থাকিলে ক্রমেই পরনিন্দার ইচ্ছা দূর হইবে ও পর-গুণালোচনার অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে।

যাহাতে প্রাণে ভাল হইবার জন্য প্রগাঢ় আবেগ জন্মে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভাল হইতে যাঁহার বলবতী ইচ্ছা আছে,

ঈর্ষা তাঁহার ভিতরে কার্য্য করিবার অবকাশ পায় না। ভাল হইবার জন্য যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, তিনি সর্ব্বদা পরের গুণ-কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া, পরের ভাল দেখিয়া দেখিয়া, আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন, পরের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাইবার তাঁহার সময় থাকে না ও পরের মন্দ চিন্তা যে নিজের ভাল হইবার পথে কণ্টক, তাহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যে অপর কোন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত, তাহার মন সর্ব্বদা সেই ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহার আর ভাল হইবার অবসর থাকে কোথায়?

যাঁহার হৃদয়ে ভাল হইবার ইচ্ছা প্রবল, তিনি পরের ভাল দেখিলে অমনি সেই ভালটুকু নিজের জীবনে আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট হন, তাঁহার মনে অপরকে অবনত করিয়া আপনার সমান না করিয়া, নিজে উন্নত হইয়া অপরের সমান হইবার জন্য যত্ন হয়। যে ব্যক্তি মাৎসর্য্যের দাস, সে নিজের উন্নতি ভুলিয়া পরের অবনতি কামনা করে, যাঁহার প্রাণে মাৎসর্য্য নাই, তিনি মনে করেন, 'অন্যকে নামাইয়া আমার সমান না করিয়া আমি কেন উঠিয়া তাহার সমান না হই?' তাঁহার ঈর্ষার নাম শুনিতেও লজ্জা হয়।

মাৎসর্য্যের কুফল চিন্তা মাৎসর্য্যদমনের প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি ঈর্ষাগ্নিতে আপনার প্রাণটী আহুতি দেয়, তাহার অবস্থা শোচনীয়। যাহা দেখিলে মনুষ্যের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয় ঈর্ষী তাহাই দেখিয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা পাইতে থাকে। সৌন্দর্য্য, সুখ, সাহস, সদ্‌গুণ দেখিলে কাহার না মনে আনন্দের সঞ্চার হয়? কিন্তু ঈর্ষীর প্রাণে তাহাই নরকাগ্নি প্রজ্বলিত

করিয়া দেয়। 'ভাল যাহার নিকটে মন্দ, সুধা যাহার নিকটে বিষ, স্বর্গ যাহার নিকটে নরক, পূর্ণচন্দ্রের আলোক যাহার নিকটে অমানিশার অন্ধকার, তাহার যে কি দুঃখের অবস্থা তাহা কে বর্ণনা করিবে? সহস্র ব্যক্তি একজনের গুণ গান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিল, ঈর্ষার কর্ণে যাই সেই ধ্বনি প্রবেশ করিল অমনি তাহার প্রাণ যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—বল ইহার ন্যায় হতভাগ্য কে আছে?

যাহার দোষ চিন্তা ও দোষ দর্শনই ব্যবসায়, সে যে কিরূপ হতভাগ্য তাহা মনে করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে ব্যক্তি চন্দ্রে কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছু দেখে না, কুসুমে কীট ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে না, মৃণালে কণ্টক ভিন্ন আর কিছু বুঝে না, তাহার ন্যায় দুঃখী এ জগতে আর কে? ঈর্ষার প্রাণ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন, কণ্টকাকীর্ণ, ক্লেদপূর্ণ। ভগবান্ সকলকে ঈর্ষার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

ঈর্ষা হলাহলের ন্যায় অস্থি পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। ঈর্ষার দিবানিশি প্রাণে অসুখ। সর্ব্বদা তাহার প্রাণে কষ্ট। তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না দয়ের স্বাচ্ছন্দ্য চলিয়া যায়।

এ জগতে বিবাদ বিসংবাদ প্রায় ঈর্ষামূলক দেখিতে পাই। কত কত ব্যক্তি, কত কত জাতি, ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

শিক্ষা

শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না এবং লোকে কোন কার্য্যই ভালরূপে করিতে পারে না। সত্যই "শরীরই ধর্ম্মসাধনের আদি উপায়।"

অতএব শারীরিক শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়। এস্থলে শারীরিক শিক্ষা বলিলে কেবল ব্যায়াম বুঝাইবে না—উপযুক্ত আহারগ্রহণ, উপযুক্ত পরিচ্ছদপরিধান, যথাযোগ্য ব্যায়াম অভ্যাস, আবশ্যকমত বিশ্রাম লওয়া, যথাসময়ে নিদ্রা যাওয়া, প্রভৃতি যে সকল কার্য্যদ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও উৎকর্ষ লাভের বিঘ্ন না হইয়া বরং সহায়তা হয়, তৎসমুদয়েরই অনুষ্ঠান বুঝাইবে।

আহার কেবল দেহরক্ষা ও দেহের পুষ্টিলাভের নিমিত্ত, এবং যে খাদ্য দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহাই গ্রহণ করা যাইতে পারে, এরূপ মনে করা ঠিক নহে। কারণ খাদ্যের ইতরবিশেষে যে কেবল দেহের অবস্থার ইতরবিশেষ হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা মনের অবস্থারও ইতরবিশেষ ঘটে। সত্য বটে, যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "যাহা মুখের অন্তর্গত করা যায় তাহা মানুষকে অপবিত্র করে না, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বহির্গত হয় তাহাই মানুষকে অপবিত্র করে।" এ কথা দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যথাযোগ্য হইয়াছিল। কারণ তৎকালে ইহুদীরা অন্তরে শুচি হওয়ার প্রয়োজন একপ্রকার ভুলিয়া গিয়া কেবল বাহিরে শুচি ও আহারে শুচি হইলেই যথেষ্ট

মনে করিত, এবং তাহাদের শিক্ষার্থে ঐ কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ উপদেশ সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত নহে। দেহতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, খাদ্যের উপর মনের অবস্থা অনেকটা নির্ভর করে, এবং মাংসাশীরা কিছু উগ্রস্বভাব ও স্বার্থপর হয়। মাদক দ্রব্যের গুণাগুণ সকলেই জানেন। তাহা সেবন করিলে অন্ততঃ অল্প কালের জন্য যে চিত্তবিকার জন্মে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং মদ্য মাংস বর্জ্জনীয়। একথা লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মদ্যমাংসের প্রয়োজনাভাব, এবং তাহা অপকার ভিন্ন উপকারক নহে, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। যাহারা জীব-হিংসায় বিরত হওন নিমিত্ত অথবা মনের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত নিরামিষভোজী, তাহাদের ত কথাই নাই, শরীরের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্তও এদেশে মাংস ভোজন নিষ্প্রয়োজন। মৎস্য সম্বন্ধে অধিকতর মতভেদ আছে। মৎস্য অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ ও সুলভ, এবং পরিত্যাগ করিলে তৎপরিবর্ত্তে তুল্য উপকারক খাদ্য পাওয়াও কঠিন। এতদ্ভিন্ন মৎস্যের ক্রীড়ার স্থল জলের ভিতর এবং জল হইতে তুলিলেই মৎস্য মরিয়া যায়, সুতরাং মৎস্য মারিতে দৃশ্যতঃ অধিক নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে হয় না। এই জন্য মৎস্য ত্যাগের নিয়ম তত দৃঢ় করা হয় নাই। পরন্তু কেবল খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিলেই হইবে না, আহারের পরিমাণও অতিরিক্ত হওয়া অনুচিত। মনু কহিয়াছেন—

"অতি ভোজন আরোগ্য, দীর্ঘায়ু, স্বর্গলাভ ও পুণ্য কার্য্যের বাধাজনক এবং লোকের নিকট নিন্দনীয়, অতএব তাহা ত্যাগ করিবে।" এই মনুবাক্য কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি নহে, ইহা

চিকিৎসাশাস্ত্রেরও অনুমোদিত। অতএব আহার কেবল রসনা-তৃপ্তির বা শরীর-পুষ্টির নিমিত্ত নহে। শরীর ও মন উভয়ের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত তাহা শুচি, সাত্ত্বিক, পুষ্টিকর, ও পরিমিত হওয়া উচিত, এই শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন।

পরিচ্ছদ কেবল দেহাবরণের ও শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার নিমিত্ত নহে, পরিচ্ছদের সহিত মনেরও বিলক্ষণ সংস্রব আছে। পরিচ্ছদের মলিনতা ও অসংলগ্নতা পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস না করিলে, ক্রমে অন্যান্য কার্য্যেও পরিচ্ছন্নতা ও সংলগ্নতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যায়। পক্ষান্তরে পরিচ্ছদের শোভার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকিলে ক্রমে বৃথাভিমান বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, সংলগ্নতা, ও সুরুচি শিখান আবশ্যক।

ব্যায়াম বলিলে সহজে মল্লক্রীড়াই বুঝায়, কিন্তু শারীরিক শিক্ষার নিমিত্ত তাহা যথেষ্ট নহে। তদ্দ্বারা বলবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ হওয়া যেমন আবশ্যক, সর্ব্বাংশে কার্য্যকুশল হওয়াও তেমনি আবশ্যক। অতএব হস্তসঞ্চালন দ্বারা লিখন চিত্রকরণাদি শিক্ষা ও পদসঞ্চালন দ্বারা বিনা পদস্খলনে দ্রুতগমন অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। চক্ষুকর্ণাদিও সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে বিজ্ঞানানুশীলন ও জড়জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি হয় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বুদ্ধির ন্যূনাধিক্য অনেক স্থলে দর্শন ও শ্রবণ শক্তির ন্যূনাধিক্য ভিন্ন আর কিছু নহে, এবং দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় যে দেখিবামাত্র ও শুনিবামাত্র সম্পূর্ণরূপে দেখিতে ও শুনিতে পায়, সেই তাহার মর্ম্ম সত্বর বুঝিতে পারে। অতএব চক্ষুকে সত্বর দেখিতে ও কর্ণকে সত্বর শুনিতে

শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কি প্রকারে সেই শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহা স্থির করা সহজ নহে, এবং কোন শিক্ষাই ফলবতী হইবে কিনা এ সন্দেহও উঠিতে পারে। কিন্তু একথা বলা যায় যে শিক্ষার্থী সত্বর দেখিতে ও সত্বর শুনিতে মনোযোগের সহিত বারবার চেষ্টা করিলে, অভ্যাস দ্বারা কিঞ্চিৎ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। এরূপ অভ্যাসের সুফল অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শন ও শ্রবণ শক্তির যে তারতম্যের কথা এখানে বলা যাইতেছে তাহা স্থূল তারতম্যের কথা নহে, সূক্ষ্ম তারতম্যের কথা। তাহার পরীক্ষা নানারূপে হইতে পারে। যথা, পরীক্ষার্থী দর্শকের সম্মুখে কোন বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত একখণ্ড তাস একখানি তক্তায় লাগাইয়া রাখিয়া, মধ্যে বৈদ্যুত চুম্বকে আকৃষ্ট ক্ষুদ্রছিদ্রবিশিষ্ট লৌহফলক ব্যবধান রাখিয়া, চুম্বকের বৈদ্যুতিক তার সংযোগে বিচ্ছিন্ন করিলে, লৌহফলক তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে, এবং পাড়িতে পড়িতে যতক্ষণ তাহার ছিদ্র তাসটুকরার সম্মুখে থাকিবে ততক্ষণ মাত্র সেই টুকরাটি দর্শক দেখিতে পাইবে। সেই অত্যল্পক্ষণের পরিমাণ কত তাহা ফলকের নিম্নগতির পরিমাণ ও ছিদ্রের আয়তনের পরিমাণ হইতে গণনাদ্বারা স্থির করা যাইতে পারে, এবং ছিদ্রের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা সেই ক্ষণকালের পরিমাণেরও হ্রাস বৃদ্ধি ইচ্ছামত করা যাইতে পারে। এইরূপে দেখা গিয়াছে সেই কাল ·০০৫ সেকেণ্ডেরও ন্যূন হইলে কোন দর্শকই সেই রংকরা তাসটুকরা দেখিতে পায় না। শ্রবণ সম্বন্ধে পরীক্ষা আরও সহজ। একটি ঘটিকা যন্ত্রের নিকট হইতে পরীক্ষার্থী শ্রোতাকে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে বলুন, এবং দেখুন কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াও তিনি ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পান ও ঠিক

গণিতে পারেন। সেই দূরত্বের পরিমাণ তাঁহার শ্রবণ শক্তির তীক্ষ্ণতার পরিচায়ক।

ব্যায়াম সম্বন্ধে ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তাহা নিয়মিত অথচ স্বেচ্ছামত, এবং স্বাস্থ্যকর অথচ অন্যদিকেও কার্য্যকর হয়। ব্যায়ামের নিয়মের অধিক বাঁধাবাঁধি থাকিলে তাহা কষ্টকর ও অনিষ্টকর হইয়া পড়ে। আর স্বাস্থ্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম কালে দ্রুত চলিতে পারিবে, কিন্তু কার্য্যার্থে প্রয়োজন কালে দু'পা চলিতে পারিবে না, এরূপ ব্যায়াম শিক্ষার কোন ফল নাই।

নিদ্রা ও বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তবে তাহার পরিমাণ সকলের পক্ষে ও সকল সময়ে সমান হওয়া আবশ্যক নহে। অল্পবয়সে অধিক নিদ্রার প্রয়োজন। বালকেরা সহজেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং অনেকক্ষণ নিদ্রা যায়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, অনিদ্রার ফল দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই অতি অনিষ্টকর। একথা শিক্ষার্থীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

অনেক ছাত্র পরীক্ষার সময় নিকট হইলে পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে। তাহারা বুঝে না যে তদ্দ্বারা পাঠাভ্যাসের প্রকৃত সুবিধা হয় না। অধিক রাত্রি জাগরণে কেবল শরীর অসুস্থ হয় এমত নহে, তাহাতে মনেরও অসুখ জন্মে, এবং কোন বিষয় বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার শক্তির হ্রাস হয়। সুতরাং অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠ করিলে অধিক কার্য্য না হইয়া বরং তার বিপরীত ফল হয়। কিন্তু কেবল ছাত্রদিগের দোষ দেওয়া উচিত নহে, যাঁহাদের উপর পরীক্ষার নিয়ম সংস্থাপনের ও পাঠ্য অবধারণের ভার, তাঁহাদেরও দেখা কর্ত্তব্য যে, ছাত্রদিগের উপর অপরিমিত ভার চাপান না হয়।

নিদ্রার ন্যায় বিশ্রামেরও প্রয়োজন, কারণ বিশ্রাম না করিলে শ্রান্ত হইতে হয়, এবং অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করিতে পারা যায় না; তবে বিশ্রামের অর্থ আলস্য নহে। আলস্যে কোন উপকার হয় না, এবং সত্যই "ক্ষণমাত্রও কেহ একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না।" নিয়মিতরূপে কার্য্যকরা এবং এক প্রকার কার্য্য অনেকক্ষণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই, শ্রান্তি পরিহারের প্রকৃত উপায়।

অনেকে মনে করিতে পারেন জ্ঞানলাভের জন্য এত শারীরিক নিয়ম পালনের প্রয়োজন নাই, বুদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর নিতান্ত অসুস্থ না হয় ততক্ষণ জ্ঞানলাভের কোন বাধা হয় না। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবীর পক্ষে, শরীরের অবস্থা ভাল না থাকিলেও জ্ঞানার্জ্জনের অধিক বিঘ্ন না হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ঘটে না, এবং আহার ও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্রাম, যথা নিয়মে চলিলেই শরীর ও মনের অবস্থা জ্ঞানার্জ্জনের উপযোগী হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও আহার-নিদ্রায় সংযমই শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশস্ত নিয়ম।

সহজ অবস্থায় অনেক শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন সহ্য হয়, এবং অনেক সহজ কার্য্য বিনা শারীরিক শিক্ষায় এক প্রকার চলে, কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক নিয়ম পালন ও শারীরিক শিক্ষা অনাবশ্যক বলা যায় না। নিয়মিত আহার ব্যায়াম ও বিশ্রাম দ্বারা অনেক দুর্ব্বল দেহ সবল হয়। হস্ত ও চক্ষুর সুশিক্ষাদ্বারা লোকে চিত্রকরণে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে শিক্ষা না করিলে চিত্রকরা দূরে থাকুক, একটি দীর্ঘ সরল রেখাও টানিতে পারা যায় না।

মন যেমন শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ, মানসিক শিক্ষাও সেইরূপ শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষা কঠিন বিষয়। এস্থলে মানসিক শিক্ষা বিদ্যাশিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায় সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা জগতের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বুঝায়, কিন্তু মানসিক শিক্ষা তদতিরিক্ত আরও কিঞ্চিৎ বুঝায়, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞানলাভের শক্তি-বর্দ্ধন এই দুইটিই বুঝায়। উপরি উক্ত বিশেষ বিশেষ বিদ্যা শিখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই মানসিক শিক্ষালাভ হয়—যথা, দর্শন বা গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, ইতিহাস শিখিতে গেলে অভ্যাস দ্বারা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শিক্ষার প্রতি পৃথক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কেন না বিদ্যাশিক্ষা যদি অনেক সময়েই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে, কখন কখন আবার তাহা তদ্বিপরীত ফলও উৎপন্ন করে। নিরবচ্ছিন্ন এক বিদ্যা আলোচনা দ্বারা যদিও সেই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু মনের সাধারণ শক্তির তদ্দ্বারা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া যায়, এবং এইরূপে পণ্ডিতমূর্খ বলিয়া যে এক শ্রেণীর বিচিত্র লোক আছে তাহার সৃষ্টি হয়। বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও যদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে এইরূপ পরিহাসভাজন হইতে পারে, তবে সেই অত্যাবশ্যক মানসিক শিক্ষা কি, এবং কিরূপে তাহা লাভ করা যায়?—উৎসুক হইয়া সকলেই এই প্রশ্ন করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানসিক শিক্ষা কেবল বিষয়বিশেষের জ্ঞানলাভ নহে, সকল বিষয়েই জ্ঞানলাভের শক্তিবর্দ্ধন ইহার মূল লক্ষণ।

সেই শক্তিবর্দ্ধনের উপায় নানা বিষয়ের যথাসম্ভব শিক্ষা, এবং সকল বিষয়ই যথাসাধ্য আয়ত্ত করিবার অভ্যাস। সকল বিষয়

সকলের সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইতে পারে না, কিন্তু সকল বিষয়েরই সহজ কথা কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করার শক্তি সকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরই থাকা উচিত, এবং একটু যত্ন করিলেই সে শক্তি লাভ করা যায়। বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি বড়। বিদ্যা কম থাকিলেও লোকের চলে; কিন্তু বুদ্ধি কম থাকিলে চলা ভার। প্রকৃত মানসিক শিক্ষা না হইলে জ্ঞানলাভ সহজে হয় না।

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা অপেক্ষা নৈতিক শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। শরীর সবল ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকিলেও, যাহার নীতি কলুষিত সে নিজে এবং অপর সাধারণের অমঙ্গলের কারণ হয়। চাণক্য যথার্থই বলিয়াছেন—

"দুর্জ্জন বিদ্বান্‌ হইলেও পরিত্যাজ্য। সর্পের মস্তকে মণি থাকিলে কি সে ভয়ঙ্কর নহে?" নৈতিক শিক্ষা যেমন অতি প্রয়োজনীয়, তেমনই অতি কঠিন। সুনীতি কাহাকে বলে এবং দুর্নীতি কাহাকে বলে তাহা স্থির করা প্রায় সহজ। কিন্তু তাহা হইলেও যে নৈতিক শিক্ষা এত কঠিন, তাহার কারণ এই যে, নৈতিক শিক্ষা লাভ, কি সুনীতি কি দুর্নীতি ইহা জানিলেই সম্পন্ন হয় না। কার্য্যতঃ যাহা সুনীতি তাহা আচরণ করা, ও যাহা দুর্নীতি তাহা পরিহার করাই নৈতিক শিক্ষা লাভের লক্ষণ, এবং সেইরূপ কার্য্য করিতে পারা বহু যত্ন ও অভ্যাসের ফল। ফলতঃ নৈতিক শিক্ষা কেবল জ্ঞানবিষয়ক নহে, ইহা প্রধানতঃ কর্ম্মবিষয়ক। তবে নৈতিক শিক্ষা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। যদিও দুর্জ্জন বিদ্যালঙ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু দুর্জ্জনের প্রকৃত জ্ঞানলাভ প্রায়ই ঘটে না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত যে সকল যত্ন ও অভ্যাস আবশ্যক, তদুপযোগী

মনের শান্তভাব দুর্নীত ব্যক্তিদিগের থাকে না। তাহারা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ধীরবুদ্ধি হয় না।

তাহারা সূক্ষ্ম কথা ধরিতে পারে, কিন্তু কোন বিষয়ের স্থূল ও প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। তাহারা কুতর্ক করিয়া কুটিল পথে যাইতে পারে, কিন্তু সুযুক্তিদ্বারা সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। যেখানে কোন দোষ নাই, সেখানে তাহারা দোষ দেখে, যেখানে প্রকৃত দোষ আছে, তাহাদের বক্র দৃষ্টি তাহা দেখিতে পায় না। বোধ হয় এই জন্যই আর্য্যঋষিরা যাহাকে তাহাকে উপদেশ দিতেন না। শান্ত, ঋজু, এবং দম্ভবর্জ্জিত না হইলে কাহাকেও শিষ্য করিতেন না, অর্থাৎ শিষ্য আগে নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেন না। আরও একটি কথা আছে। দুর্নীত ব্যক্তির জড়জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। সুতরাং নৈতিক শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক কষ্ট বৃদ্ধি হয় এবং নীতিশিক্ষা দ্বারা আমাদের অনেক কষ্টের লাঘব হইতে পারে। সত্য বটে নীতিশিক্ষা দ্বারা দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু নিবারিত হয় না, কারণ তদ্দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী দ্রব্য বা রোগোপশমের ঔষধ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। কিন্তু নীতিশিক্ষা যে আলস্য অপব্যয়াদি সম্ভূত দারিদ্র্য এবং অতিভোজন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রাদিজনিত রোগ নিবারণের উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুনীতিসম্পন্ন ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্ন করিয়া দারিদ্র্য ও রোগ নিবারণে সতত তৎপর থাকেন। আবার দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু, দৈবদুর্ঘটনাদি যেখানে অনিবার্য্য, সেখানে তজ্জনিত

দুঃখভার সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিবার ক্ষমতা নীতিশিক্ষা বিনা আর কিছুতেই জন্মে না, এবং সেই ক্ষমতা এই সুখদুঃখময় সংসারে বড় অল্পমূল্যবান সম্পদ নহে।

এতদ্ব্যতীত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় দৈবদুর্ব্বিপাকাদি আমাদের যত দুঃখের মূল, আমাদের দুর্নীতি তদপেক্ষা অল্প দুঃখের মূল নহে। প্রথমতঃ আমাদের নিজের দুর্নীতিতে নিজের অশেষ দুঃখ ঘটে। অতিভোজনাদি অসংযত ইন্দ্রিয়সেবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতে ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। দুরাকাঙ্ক্ষা, অতিলাভ, ঈর্ষা, দ্বেষাদি দুষ্প্রবৃত্তি হইতে আমরা নিরন্তর তীব্র মনোবেদনা সহ্য করি। দ্বিতীয়তঃ পরের দুর্নীতির জন্য, অপমান, বঞ্চনা, চৌর্য্যাদিদ্বারা অর্থনাশ, শত্রুহস্তে আঘাত ও অপমৃত্যু প্রভৃতি নানা প্রকার গুরুতর ক্লেশ ভোগ করি। রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ ও তাহার আনুসঙ্গিক সমস্ত অমঙ্গলও মনুষ্যের দুর্নীতির ফল। অতএব ইন্দ্রিয়সংযম ও দুষ্প্রবৃত্তিদমন শিক্ষা না করিলে, কেবল বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগের ঔষধ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারিলেও মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

১৭৪০ অব্দে বাজিরাওএর মৃত্যু হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বালাজী বাজিরাও পেশওয়ের পদ লাভ করেন। মরাঠা-কুল-মুষল রঘুনাথ বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। অতঃপর নানা প্রসঙ্গে আমরা ইহার ও ইহার গুণধর পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাওএর পরিচয় পাইব।

১৭৪৮ অব্দে সাহুর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দানপত্র লিখিয়া সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা পেশওয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। শিবাজীর বংশধরেরা অতঃপর বৃত্তিভোগী হইয়া রাজোচিত সম্মান মাত্র পাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়।

১৭৫০ হইতে ১৭৬০ অব্দ পর্য্যন্ত মরাঠাদিগের চরম উন্নতির সময়। তাহারা এই দশ বৎসরের মধ্যে উড়িষ্যা জয় করে, নিজামকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রদেশ কাড়িয়া লয়, এবং রাজপুতানায় চৌথ আদায় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

তখন আফগানরাজ আহ্মদ সা আবদালির আক্রমণে দিল্লী ও তন্নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের অতীব দুর্দ্দশা হইয়াছিল। সেই সুযোগে পেশওয়ের ভ্রাতা রঘুনাথরাও দিল্লী আক্রমণ করেন (১৭৫৭) এবং আফগানদিগকে পরাস্ত করিয়া পাঞ্জাব হইতে দূর করিয়া দেন (১৭৫৮)। এইরূপে কাবেরী হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মরাঠাদিগের পদানত হইল; তাহারা

মনে করিতে লাগিল, এখন পেশওয়েকে দিল্লীশ্বরের পদে অভিষিক্ত করিতে পারিলেই হিন্দুজাতির মনস্কাম পূর্ণ হয়।

কিন্তু অচিরে "অভ্যুত্থানং হি পতনায়" এই মহাজনবাক্য সফল হইবার সময় আসিল। পাঞ্জাব হস্তস্খলিত হওয়ায় আহ্মদ সা আবদালি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে তিনি মরাঠাদিগের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন; পেশওয়েও দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত অশুভক্ষণে তাঁহার বিরুদ্ধে সেনা-প্রেরণের সঙ্কল্প করিলেন। সিন্দে, ভোঁসলে, হোলকার, গায়কোয়াড় প্রভৃতি মরাঠা সামন্তগণ স্ব স্ব সেনাবল লইয়া এই অভিযানে যোগ দিলেন, এবং পেশওয়ের পিতৃব্যপুত্র সদাশিব রাও ও জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাস রাও সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া মহাড়ম্বরে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভরতপুরের জাঠ-রাজ সূর্য্যমল্ল এবং রাজস্থানের অনেক নৃপতিও মরাঠাদিগের সহায় হইলেন।

এদিকে অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলা এবং রোহিলাদিগের অধিনেতা নজিবউদ্দৌলা আহ্মদ সার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। লোকে মনে করিতে লাগিল, ভারতবর্ষ হিন্দুর হাতে থাকিবে, কিংবা মুসলমানের হাতে থাকিবে, এবার বুঝি এই প্রশ্নের চরম মীমাংসা হইবে। সমুদয়ে মরাঠা-পক্ষে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ এবং আহ্মদ সার পক্ষে প্রায় আশি হাজার সৈন্য সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল।

সূর্য্যমল্ল, মল্হার রাও হোলকার প্রভৃতি প্রবীণ বীরগণ পরামর্শ দিলেন যে, মরাঠারা তাহাদের চিরন্তন প্রথানুসারে সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া দূরে দূরে থাকিয়া শত্রুদিগের রসদ

বন্ধ করিবার চেষ্টা করুক। তাঁহারা দেখাইলেন যে, এইরূপে শীতকালটা অতিবাহিত করিতে পারিলে, গ্রীষ্মারম্ভে আহ্মদ সাকে স্বাস্থ্যহানির ও খাদ্যাভাবের ভয়ে আফগানিস্তানে ফিরিতেই হইবে। কিন্তু মদোদ্ধত সদাশিব এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি মল্হর রাওএর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "ভেড়ী-ওয়ালার পরামর্শ শুনিলে যুদ্ধ করা চলে না।" ফলতঃ সদাশিব ভাবিলেন, সম্মুখযুদ্ধে শত্রুসংহার করিতে পারিলেই গৌরবের পরাকাষ্ঠা হইবে, তাঁহার নিজের যেরূপ সেনাবল, তাহাতে বিজয়শ্রী তাঁহাকেই বরণ করিবেন।

সদাশিব দিল্লী অধিকার করিলেন এবং ভাবিলেন, এখনই বিশ্বাস রাওকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিয়া মরাঠা জাতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যাউক। কিন্তু মোগলবংশের পদগৌরব তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সূর্য্যমল্ল প্রভৃতি অনেকে সদাশিবের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না, কাজেই তিনি আপাততঃ অভিষেক-ক্রিয়া স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক পুরুষেরা নগর-লুণ্ঠনে ও বিচিত্র হর্ম্যগুলির ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইল। ইহা দেখিয়া ও সদাশিবের উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া জাঠ ও রাজপুত সেনানীগণ স্ব স্ব দেশে ফিরিয়া গেলেন।

পাণিপথের সেই দারুণ প্রান্তরে মরাঠা ও আফগানগণ শিবির সন্নিবেশ করিয়া পরস্পরের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আহ্মদ সা চতুর্দ্দিকে দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়া মরাঠাদিগের রসদ বন্ধ করিলেন। শেষে এমন হইল যে, তাহারা শিবিরের বাহিরে যাইতেও সাহস করিত না। দীর্ঘকাল এভাবে

আবদ্ধ থাকায় মরাঠাদিগের খাদ্যাভাব ঘটিল ও স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইল; বহুসংখ্যক মনুষ্য ও অশ্ব নানা রোগে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তাহাদের গলিত শবের দুর্গন্ধে সেনাকটক নরকে পরিণত হইল (১৮৬০)।

সদাশিব দেখিলেন, তাঁহার কষ্টের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, আর সহ্য করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার অনুচরেরা বলিতে লাগিলেন, অনাহারে অবরুদ্ধ অবস্থায় শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় পঞ্চত্বপ্রাপ্তি অপেক্ষা সম্মুখাহবে বীরজন-বাঞ্ছিত মৃত্যুশয্যায় শয়ান হওয়া শতগুণে শ্রেয়স্কর। অতএব তাঁহারাই আফগানদিগকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

১৭৬১ অব্দের ৭ই জানুয়ারী; সূর্য্য কেবল উদিত হইয়াছে, এমন সময়ে "হর হর মহাদেব" বলিতে বলিতে মরাঠারা আফগানদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল। আফগানেরাও প্রস্তুত ছিল। হোলকার ও গায়কোয়াড় যুদ্ধারম্ভেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, অন্যান্য সেনানীরা কিন্তু পলায়ন করিলেন না। বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিল, শেষে মরাঠাদিগেরই পরাভব হইল। সদাশিব রাও এবং বিশ্বাস রাও নিহত হইলেন; সিন্দেবংশ প্রায় নির্ম্মূল হইল। আফগানেরা পলায়নপর মরাঠাদিগকে অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিতে লাগিল। যাহারা বন্দী হইল, তাহারাও পরিত্রাণ পাইল না। ফলতঃ মরাঠাদিগের সেই বিপুল বাহিনীর পঞ্চাশ সহস্র লোকও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিল কি না, সন্দেহ।

সদাশিবের সাহায্যার্থ পেশওয়ে স্বয়ং অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি গোদাবরীতীরে এই মহাপতনের সংবাদ পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল, "দুইটী মুক্তা ভস্মীভূত হইয়াছে, বাইশটী মোহর বিনষ্ট

হইয়াছে, আর রৌপ্য ও তাম্র যে কত গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।"

এই বিষম বিপৎপাতে সমগ্র মরাঠাজাতির মনে যে বিষাদের কালিমা পড়িল, তাহা বর্ণনাতীত। মরাঠাদেশে এমন পরিবার ছিল না, যেথানে ক্রন্দনের রোল উঠে নাই। বালাজী বাজিরাও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন, হোলকার প্রভৃতি সময় পাইয়া স্ব স্ব-প্রধান হইলেন। মুসলমানেরা আবার পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, আহ্মদ সাও এদেশে রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা না করিয়া আফগানিস্তানে ফিরিয়া গেলেন। কাজেই সর্ব্বত্র অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইল। মোগলের মহিমা বিলুপ্ত হইল, মরাঠারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল, বিধাতা ইংরাজদিগকে এই হতভাগ্য দেশের উদ্ধার-সাধনে নিযুক্ত করিলেন। মরাঠা ও আফগান যখন পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদনে নিরত, ঠিক সেই সময়েই ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে পরাভূত করিয়া প্রবল হইয়া উঠিলেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

জর্জ ওয়াসিংটনের দেহত্যাগ

খ্রীষ্টীয় ১৭৯৭ অব্দের মার্চ্চ মাসে ওয়াসিংটন সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। এতকাল তাঁহার ভাগ্যে বিশ্রামসুখ ঘটে নাই; কঠোর স্বদেশহিতব্রতে তিনি কখনও সমরাঙ্গনে, কখনও বা রাজপদে,—অনাহারে, অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায়, উৎকণ্ঠায় প্রায় সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বড়ই সাধ ছিল যে, জীবনের অবশিষ্ট কাল পরিজনবর্গের মধ্যে শান্তি-সুখ-ভোগে অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন; তিনি পূর্ণ দুই বৎসর কালও এই সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না।

১৭৯৯ অব্দের ডিসেম্বর মাস। আর কয়েকটা দিন গেলেই, বৎসর, সেই সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীও কাটিয়া যায়; কালসমুদ্রের অপর একটী মহোর্ম্মি আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিধাতৃবিধানে ওয়াসিংটনের আর এ কয়েকটী দিন কাটিল না; নববর্ষ আসিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

১২ ডিসেম্বর ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিন। একে হিমপ্রধান দেশের শীতকাল; তাহাতে আবার দিঙ্মণ্ডল ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন;—বায়ুর প্রবল বেগ, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টি ও তুষার-পাত। ওয়াসিংটন প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া ভৃত্যদিগের কার্য্যপরিদর্শনার্থ বাহিরে যাইতেন। আজও সেই উদ্দেশ্যে সজ্জিত হইতেছেন দেখিয়া মার্থা কহিলেন, "আমি ত এরূপ দুর্দ্দিনে কিছুতেই

ঘরের বাহির হইতে সাহস করি না। আমার ভয় হইতেছে পাছে হিম লাগিয়া আপনার কোন অসুখ হয়। এ বয়সে ঝড় বৃষ্টির সময়ে বাহিরে না গিয়া গৃহে অগ্নিসেবা করাই আপনার পক্ষে সুঙ্গত।"

ওয়াসিংটন বলিলেন, "বাগানে ভৃত্যেরা একটা নূতন কাজ আরম্ভ করিয়াছে; আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ না করিলে উহা সুসম্পন্ন হইবে না। বিশেষতঃ ঝড় বৃষ্টিও তত বেশী হইতেছে না; সুতরাং অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে গেলে অসুখ হইবার কোন আশঙ্কা নাই।"

মার্থা দ্বিরুক্তি করিলেন না; ওয়াসিংটন গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বহুক্ষণ বাহিরে থাকিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের প্রাক্কালে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার পরিচ্ছদ জলসিক্ত হইয়াছে এবং কেশে বরফ জমিয়া রহিয়াছে। মার্থা বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ওয়াসিংটন তাহা শুনিলেন না, কহিলেন, "তুমি ইহার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? কিছুক্ষণ আগুনের কাছে বসিলেই কাপড় শুকাইয়া যাইবে।"

প্রতিদিন সায়ংকালে পরিজনবর্গ অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইত; ওয়াসিংটন স্বয়ং কোন না কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সকলে তাহা শ্রবণ করিত। আজও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় পাঠ করিলেন; কিন্তু শ্রোতাদিগের বোধ হইল, যেন অন্যান্য দিন অপেক্ষা তাঁহার স্বর কিছু ভারী হইয়াছে।

পরদিন ঝটিকার বেগ আরও বাড়িল; ওয়াসিংটন একটু সর্দ্দি বোধ করিলেন; সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহে রহিলেন; কিন্তু সন্ধ্যাকালে পুস্তক পাঠ বন্ধ করিলেন না। কেহ কেহ তাঁহাকে ঔষধ খাইতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি ঔষধ

খাইলেন না, কহিলেন, "আমি সর্দ্দিতে ঔষধ খাই না ; এ রোগ আপনা হইতেই সারিয়া যায়।"

রাত্রি ৩টার সময় ওয়াসিংটনের নিদ্রাভঙ্গ হইল, কম্প দিয়া জ্বর আসিল, কিন্তু পাছে মার্থার অসুখ করে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাকে জাগাইলেন না ; স্বয়ং এক জন ভৃত্য ডাকিয়া অগ্নি জ্বালাইলেন এবং রক্ত-মোক্ষণের নিমিত্ত বৈদ্য আনাইলেন। তৎকালে রক্ত-মোক্ষণ দ্বারা রোগ দমন করা চিকিৎসাপদ্ধতির একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। ওয়াসিংটন ভাবিলেন, কিছু রক্ত নিঃসারিত করিলেই রোগের উপশম হইবে।

বৈদ্যরাজ এতকাল নিগ্রো দাসদিগের রক্তমোক্ষণ করিয়াছিলেন ; আজ ওয়াসিংটনের শরীরে নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে প্রথমে তত সাহস করিলেন না। এদিকে মার্থাও জাগিয়াছিলেন ; তিনি সনির্ব্বন্ধভাবে রক্তমোক্ষণে বাধা দিতে লাগিলেন ; কহিলেন, "পীড়া হইলে রোগীর বলাধানের চেষ্টা করাই উচিত ; রক্তপাত দ্বারা বলক্ষয় করিলে উপকারের আশা দূরে থাকুক, অপকার হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা।" কিন্তু রক্তমোক্ষণের উপকারিতা সম্বন্ধে ওয়াসিংটনের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল ; তিনি মার্থার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বৈদ্যকে কহিলেন, "আপনি ভয় পাইতেছেন কেন ? ছিদ্রটা যেন বড় হয় ; নচেৎ বেশী রক্ত বাহির হইবে না।"

কিন্তু রক্তমোক্ষণ বিফল হইল—অথবা উহার বিষময় ফল ফলিল ; ওয়াসিংটন শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রত্যুষে একজন ভাল চিকিৎসক আনাইবার জন্য লোক প্রেরিত হইল, এদিকে ওয়াসিংটন তাঁহার মুহুরী লিয়ার সাহেবকে কহিলেন,

"আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না, প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি এবার আমায় যমে ধরিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া মুহরী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, প্রভু? ভগবানের কৃপায় আপনি শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবেন। চিকিৎসক আসিতেছেন; দুই একবার ঔষধ খাইলেই আপনার যন্ত্রণা কমিয়া যাইবে।" কিন্তু ওয়াসিংটন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে হিসাব পত্র ঠিক করিতে আদেশ দিলেন।

ক্রমে তিন জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনীত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা বহু চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। ওয়াসিংটন তাঁহাদিগের যত্নে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "আপনারা আমার জন্য বড় কষ্ট পাইলেন; কিন্তু আমার এ পীড়া সারিবার নহে; বোধ হয় মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই; অতএব অনুরোধ করি, যেন অন্তিম কালে ঔষধ প্রয়োগে আমার শান্তির বিঘ্ন না ঘটে।"

রাত্রি আটটার সময় বাক্‌রোধ হইল; কিন্তু জ্ঞানের কোন বিকৃতি জন্মিল না। তিনি পার্শ্বস্থ শুশ্রূষাকারীদিগের দিকে সকৃতজ্ঞভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ওয়াসিংটন কথা কহিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অতিকষ্টে লিয়ার সাহেবকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নাই; দেখিবেন যেন তিন দিনের মধ্যে আমার দেহ সমাহিত করা না হয়।" অনন্তর হঠাৎ যেন রোগের উপশম হইল; প্রশ্বাসের কষ্ট দূর হইল; রোগীর মুখমণ্ডলে যমযন্ত্রণার কোন চিহ্নই দেখা গেল না। তিনি নিজের নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে হস্ত অবসন্ন হইয়া শয্যাতলে পড়িয়া গেল; লিয়ার উহা উত্তোলন করিয়া নিজের বক্ষঃস্থলে সংস্থাপিত করিলেন; একজন চিকিৎসক

তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়া দিলেন ; ওয়াসিংটন বিনা যন্ত্রণায় ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী এতক্ষণ নিঃশব্দে পতির পদতলে বসিয়াছিলেন ; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবিতেশ্বর কি ইহলোক ত্যাগ করিলেন ?" কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন শোকের বেগ এত প্রবল যে, কাহারও কথা কহিবার শক্তি ছিলনা। লিয়ার ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে, ওয়াসিংটন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

মার্থা অতি ধীরভাবে কহিতে লাগিলেন, "তা ভালই হইয়াছে ; আমিও শীঘ্র তাঁহার অনুগমন করিব। আজ আমার সব ফুরাইল। যে কয়েক দিন বাঁচিব, এরূপ যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবে না।"

তখন রেল ছিল না ; তার ছিল না ; তথাপি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই শোক-সংবাদ সম্মিলিত রাজ্যসমূহের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি লোকের কর্ণগোচর হইল ; সকলেই ওয়াসিংটনের বিয়োগে নিতান্ত অভিভূত হইলেন ; সকলেই মনে করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহারা পিতৃহীন হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে মহাসভার সভ্যগণ তদানীন্তন সভাপতি এডাম সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

"এরূপ বিপত্তিতে ক্রন্দনই মনুষ্যত্ব। ওয়াসিংটনের ন্যায় মহাপুরুষের লোকলীলাসংবরণে শুদ্ধ এদেশ কেন, সমগ্র ভূমণ্ডল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তবে এরূপ ভয়ঙ্কর দুঃখসাগরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াও আমরা এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইতেছি যে, মানব-জীবনে সৎকার্য্যসম্পাদন দ্বারা যতদূর যশোলাভ হইতে পারে, আমাদের ওয়াসিংটন পূর্ণমাত্রায় তাহার অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। যদি

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই মহাজন-বাক্যে অণুমাত্র সত্য থাকে, তাহা হইলে ওয়াসিংটন মরিয়াও জীবিত আছেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক যশোরাশি ও পবিত্র চরিত্র কল্পান্ত পর্য্যন্ত মানব-মণ্ডলীর উৎসাহের আকর বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি স্বর্গারূঢ় হইয়াও মর্ত্ত্যবাসীদিগের সৎকার্য্যসাধনে প্রবৃত্তি জন্মাইবেন।"

ডিসেম্বরের ১৮ই তারিখে শব সমাধিস্থ হইল। চতুষ্পার্শ্বের বহু যোজন দূর হইতে বিস্তর লোক একবার চিরকালের জন্য এই নরদেবের মুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ভার্ণন শৈলে সমবেত হইলেন। সার্দ্ধযোজন দূরস্থিত সেকেন্দ্রিয়া নগরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সমগ্র অধীবাসী, নয়টী কামান এবং একখানা জাহাজ লইয়া ওয়াসিংটনের আবাসস্থলে আগমন করিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে এই জাহাজ হইতে মুহুর্মুহুঃ শোকসূচক তোপধ্বনি হইতে লাগিল। সম্মিলিত রাজ্যসমূহের সমস্ত সভাসমিতি, বিদ্যালয়, বিচারালয়, বাসগৃহ ও পণ্যশালা শোকচিহ্নে মণ্ডিত হইল। কেবল সম্মিলিত রাজ্যের লোকে কেন, য়ুরোপবাসীরাও ওয়াসিংটনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সমুচিত শোকচিহ্নধারণপূর্ব্বক মহাপুরুষের পূজা করিলেন। ইংল্যাণ্ডের রণতরীসমূহের পতাকা শোকভারে অবনত হইয়া ইংরাজজাতির হৃদয়ের গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিল; ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অধিনেতা ভুবনবিখ্যাত নেপোলিয়ান স্বকীয় কর্ম্মচারীদিগকে দশ দিন কৃষ্ণ পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। যিনি বীর, তাঁহারই নিকটে বীরত্বের আদর; যিনি মহৎ, তিনিই মহৎকে সম্মান করিতে জানেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের উক্তি

বিভীষণ ধর্ম্মর লক্ষ্মণকে লইয়া হৃষ্টমনে ত্বরিতপদে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে যাগস্থান দেখাইলেন এবং নীলমেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং আভিচারিক কার্য্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া, শত্রুগণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর বটমূলে যায় নাই। এই সময়ে তুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত উহাকে বধ কর।

তখন লক্ষ্মণ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিবৎ উজ্জ্বল রথে নিরীক্ষিত হইল। লক্ষ্মণ ঐ দুর্জ্জয় বীরকে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস! আমি তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তুমি এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ তথায় বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, রে নির্ব্বোধ! তুই এই স্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস্। তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল্ এক্ষণে পিতৃব্য হইয়া কিরূপে ভ্রাতৃপুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি? রে ধর্ম্মদ্রোহিন্! সৌহার্দ্দ, জাত্যভিমান, সোদরত্ব ও ধর্ম্ম তোর কার্য্যাকার্য্যের নিয়ামক নয়। তুই যখন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস্, তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ

নাই। কোথায় স্বজন-সংশ্রব আর কোথায়ই বা পর-সংস্রব; তুই নির্ব্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিস্ না। পর যদি গুণবান্ হয় এবং স্বজন যদি নিগু´ণ হয়, তাহা হইলে ঐ নিগু´ণ স্বজন, পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষকে আশ্রয় করে, সে স্বপক্ষ ক্ষয় হইলে পশ্চাৎ পর পক্ষ দ্বারা বিনষ্ট হয়। রে রাক্ষস! তুই আমাদের আপনার জন, আমায় বধ করিতে তোর যেরূপ নির্দ্দয়তা আর এই কার্য্যে তোর যেরূপ যত্ন, ইহা তদ্ব্যতীত আর কে করিতে পারে?

তখন বিভীষণ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি কি আমার স্বভাব জান না? বৃথা কেন ঐইরূপ গর্ব্ব করিতেছ? তুমি অসাধু, পিতৃব্যের গৌরব রক্ষার্থ এই রুক্ষ ভাব দূর করা তোমার কর্ত্তব্য। আমি যদিও ক্রূর রাক্ষস-কুলে জন্মিয়াছি, কিন্তু যাহা মনুষ্যের প্রথম গুণ সেই রাক্ষস-কুল-দুর্লভ সত্বই আমার স্বভাব। আমি কোন দারুণ কার্য্যে হৃষ্ট হইনা এবং অধর্ম্মেও আমার অভিরুচি নাই। বৎস! বল দেখি, ভ্রাতা বিষমশীল হইলেও কি ভ্রাতা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক ও পাপমতি, করস্থিত সর্পের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সুখ হইতে পারে। পরস্বাপহারী ব্যক্তি জ্বলন্ত গৃহবৎ সর্ব্বতোভাবেই ত্যাজ্য। যে দুরাত্মা পরস্বাপহরণে রত এবং যাহার জন্য সুহৃদ্‌গণের সর্ব্বদাই শঙ্কা হয়, সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে ভীষণ ঋষি-হত্যা, দেবগণের সহিত বৈরিতা, অভিমান, রোগ ও প্রতিকূলতা এই কয়েকটি দোষ আমার ভ্রাতা রাবণকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। মেঘ যেমন পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ এই

সমস্ত দোষ তাঁহার যাবতীয় গুণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বৎস! রাবণকে পরিত্যাগ করিবার ইহাই প্রকৃত কারণ। এইক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি ও রাবণ তোমরা সকলে অচিরাৎ ছারখার হইয়া যাইবে। তুমি অভিমানী, দুর্ব্বিনীত ও বালক, তোমার মৃত্যু আসন্ন, এক্ষণে যা তোমার ইচ্ছা আমাকে বল। তুমি পূর্ব্বে যে আমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিলে, সেই কারণেই এই স্থানে ঘোর বিপদে পড়িয়াছ। এক্ষণে বটমূলে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে দুষ্কর। আজ তুমি লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ কর, ইহার হস্তে আজ তোমার নিস্তার নাই। তুমি দেহান্তে যমালয়ে গিয়া দৈবকার্য্য করিবে। তুমি স্ববিক্রম দেখাইয়া সঞ্চিত সমস্ত শরই ব্যয় কর, কিন্তু আজ সুসৈন্যে প্রাণ লইয়া কিছুতেই ফিরিতে পারিবে না।

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

হিমালয়ের পথে

আমি ২৫ জ্যৈষ্ঠ আরও উত্তর হিমালয় দর্শনের নিমিত্ত শিমলা হইতে যাত্রা করি, প্রায় বিশ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়া বারকাণ্ডা নামক পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত হই। যদিও উষ্ণ বস্ত্রই গাত্রে ছিল, তথাপি তথাকার শীতল বায়ুতে শীত অনুভব হইতে লাগিল। পরদিবসে প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনার পর চা এবং দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বনকে ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে অতি জীর্ণশরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া, কোন কোন বৃক্ষ সমূলে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত রহিয়াছে, কত তরুণবয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। এ যানকে এখানকার লোকেরা ঝাঁপান বলে। বাস্তবিক ইহা একটি বড় কেদারা, দুই পার্শ্বে দুই দীর্ঘ বরগাতে সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে এবং তাহা চারিজন লোকে বহন করে। এখানকার যান পর্য্যন্ত নূতন ব্যাপার। উপমা দ্বারা বুঝান ভার। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্ব্বতের উপরে

আরোহণ করিতে করিতে তাহার অধোতে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিৎবর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষ সকল দেখিতে পাই, তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই, কেবল কেলু নামক বৃহৎ বৃক্ষে হরিৎবর্ণ এক প্রকার ফল দৃষ্ট হয় তাহা কোন পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রে বিবিধ প্রকার তৃণলতা যে জন্মে তাহারই শোভা চ

তাহা হইতে যে কত জাতির পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে তাহা সহজে গণনা করা যায় না। স্বর্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। সেই পুষ্পসকলের কোমল আকৃতি, তাহাদিগের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হয়। যদিও তাহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, তথাপি এই বনমধ্যে একেবারে আঘ্রাণ সুখ হইতে বঞ্চিত না হই, এহেতু সেই করুণাময়ের শাসনে ইহার স্থানে স্থানে এক প্রকার শ্বেতবর্ণের গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া স্বীয় গন্ধ অকাতরে বিতরণ করিয়া সমুদয় বনকে আমোদিত করিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। এই আকৃতির ঈষৎ রক্তবর্ণ গোলাপও অনেক স্থানে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার গন্ধ নাই। ইহার মধ্যে মধ্যে ষ্ট্রাবেরি (strawberry) ফল রক্তবর্ণ খণ্ড খণ্ড উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধদান করিতেছে। আমার এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে প্রদান করিল। তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মন সেই

সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া গেল। বারকাণ্ডা হইতে বারক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া ৩০ জ্যৈষ্ঠ সুন্ন্রী নামক পর্ব্বত চূড়ায় উপস্থিত হইলাম, এই অতীব উচ্চস্থান হইতে পরস্পর অভিমুখস্থিত দুই পর্ব্বতশ্রেণীর শোভা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে পর্ব্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান, কেবল পর্ব্বতের আপাদমস্তক পক্ক গোধুম ক্ষেত্রের দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক এক গ্রামে দশ বারটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য্যকিরণে দীপ্তি পাইতেছে। কোন পর্ব্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্ব্বতের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি পর্ব্বতই মহোচ্চতার অভিমানে পশ্চাতে হেলিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজ-ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত, একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই; সায়ংকাল অবসান হইয়া অন্ধকার ক্রমে সমুদয় ভুবন আচ্ছন্ন করিল। তখনও আমি সেই নির্জ্জন পর্ব্বত শৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি। দূর হইতে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্য বসতির পরিচয় দিতেছে। পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্ব্বতশ্রেণী মধ্যে যে পর্ব্বত বনাকীর্ণ সেই পর্ব্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনই সহজ। এ পর্ব্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন। ইহাকে ত বন বলা উচিত নহে; ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভাল। কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ, তাহার শাখা সকল তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং ঝাউগাছের পত্রের ন্যায় অথচ সূচীপ্রমাণ দীর্ঘ, মাত্র ঘন পত্র

তাহার ভূষণ হইয়াছে। শীতকালে এই ঘন পত্রাবৃত শাখা সকল বহু তুষার ভার বহন করে। অথচ ইহার পত্র সকল সেই তুষার মধ্যে জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয়। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য না আশ্চর্য্য! পর্ব্বত তল হইতে তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এই সকল বৃক্ষ সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ত্ব আর সৌন্দর্য্য কি মনুষ্যকৃত কোন উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা! এই কেলু বৃক্ষে কোন পুষ্প হয় না এবং ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই, ইহাতে আল্‌কাত্রা জন্মে। কতকদূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষারে পরিণত হিমজলে স্নান করিয়া নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিলাম এবং পদব্রজেই অগ্রসর হইলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম। মধ্যে মধ্যে অহিফেনেরও ক্ষেত্র রহিয়াছে। এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্নমনে পক্ক শস্য কর্ত্তন করিতেছে। অন্যক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবি ফল প্রত্যাশায় হল বহন দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রের জন্য পুনর্ব্বার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময়ে কেয়ালি নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। সুঙ্গ্রী হইতে ইহা অনেক নিম্ন। এই পর্ব্বতের তলে নগরী নদী এবং ইহার নিকটস্থ অন্য অন্য পর্ব্বতের তলে শতদ্রু নদী বহিতেছে। কেয়ালিয়া পর্ব্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত এবং নগরী নদীকে অর্দ্ধ হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে। এই শতদ্রু নদীর তীরে রামপুর নামে যে এক নগরী আছে তাহা এখানে বড় প্রসিদ্ধ, যেহেতু এই সকল পর্ব্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর

তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্ব্বতের উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা ইহার সন্নিকট, তথাপি তথায় বহুপথ ভ্রমণ করিয়া যাইতে হয়। শতদ্রু নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রাণার রাজধানী শোধিনী হইয়া তাহার নিম্নে বিলাসপুরে যাইয়া পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে। গত মাঘ মাসে ভজ্জীর রাণা তাঁহার নিবাস স্থান শোধিনীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শিমলা হইতে প্রায় দেড়দিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে চলিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় যাইয়া পর্ব্বত তলে কৃষ্ণনগরের জলঙ্গী নদীর মত এখানকার শতদ্রু নদীর প্রশস্ততা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ইহার জল সমুদ্র জলের মত নীলবর্ণ, উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার। এখানকার শতদ্রু নদীর পরিষ্কার জলের উপমা বাল্মীকি কবির তমসা নদীর উপমা "সজ্জনানাং যথামনঃ।" আমি চর্ম্মময় মশকের উপর চড়িয়া ঐ নদীর পারেও গিয়াছিলাম। ইহাতে মশক ভিন্ন আর গতি নাই, ইহার জলমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর মগ্ন থাকাতে নৌকা চলিতে পারে না। পার হইয়া তাহার তীরে উষ্ণ জলকুণ্ড দেখিলাম। তাহার বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, বর্ষাকালে যেমন নদী বৃদ্ধি হইয়া তাহার আয়তন প্রশস্ত হইতে থাকে, এবং উষ্ণ কুণ্ডের স্থল অধিকার করিতে থাকে উষ্ণ জল কুণ্ডও তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে তত অগ্রসর হইতে থাকে কথনও তাহার তীরের আশ্রয় পরিত্যাগ করে না। এই পর্ব্বতবাসী ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে প্রধান রাজা, পরে রাণা, পরে ঠাকুর, অবশেষে জমীদার; এখানকার জমীদারেরাই কৃষক। হিন্দুস্থানের জমীদারদিগেরও এই দশা। পর্ব্বতে রাজা ও রাণাদিগের ক্ষমতা অধিক, ইহারাই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা।

গত কল্য যেমন রুদ্রী হইতে ক্রমিক অবরোহণ করিয়া বোয়ানিতে আসিয়াছিলাম অদ্যও তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া প্রায় মধ্যাহ্ন কালে নগরী নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহাবেগবতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায় তুল্য প্রস্তরে আঘাত পাইয়া রোষান্বিতা ও ফেনময়ী হইয়া গম্ভীর শব্দ করত সর্ব্ব নিয়ন্তার শাসনে সমুদ্র সমাগমে গমন করিতেছে। ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্ব্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্য্যন্ত সমান উঠিয়া পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না। আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্য্যে মন মগ্ন করিয়া তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান"—পর্ব্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও তত ক্রমে ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায়, নক্ষত্রবেগে, শতসহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্য্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষ সকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদয় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল, এবং অন্ধ অন্ধকার সেস্থান হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে নদীর সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইলাম এবং যে দেবতা অগ্নিতে এবং জলেতে বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি পূর্ব্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষ সকল দেখিয়াছি এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্ব্বতের প্রজ্জলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, উন্নতি,

ও নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বড় উল্লাসিত হইলাম। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল, রাত্রিতে যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনই তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইতেছে এবং উৎসব রজনীর প্রভাত কালের অবশিষ্ট দিব্যলোকের ন্যায় মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভুক্ লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া প্রজ্বলিত রহিয়াছে। আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। যদিও কেবল একটি খালের মত তাহার প্রশস্ততা, তথাপি তাহার জলের এমত প্রবল বেগ, যে তাহাতে অবগাহন করিবার সুবিধা নাই। ঘটি করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম, সে জল এমনই হিম, যে বোধ হইল যেন মস্তকের মস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি ক্রমিক আরোহণ করিয়া দুই প্রহর সময়ে দারুণঘাট নামক দারুণ উচ্চ পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সম্মুখে অন্য এক নিদারুণ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া উন্নত মুখে "উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয়" ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দারুণঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্ব্বত-শৃঙ্গের আশ্লিষ্ট মেঘাবলী হইতে তুষার বর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাঢ় মাসে তুষার বর্ষণ শিমলা বাসীদিগের পক্ষেও আশ্চর্য্য, যেহেতু সে স্থান চৈত্র মাস শেষ হইতে না হইতেই তুষারজীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্ত বেশ ধারণ করে। ২রা আষাঢ় এই পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিরাহোন্ নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাজার একটি অট্টালিকা আছে। গ্রীষ্মকালে রামপুরে

অধিক উত্তাপ হইলে, কখন কখন শীতল বায়ু সেবনার্থ রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। ৪ঠা আষাঢ় এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঈশ্বর প্রসাদাৎ ১৩ই আষাঢ় নির্ব্বিঘ্নে শিম্‌লায় পৌঁছিয়া পথশ্রান্তি দূর করিলাম।

১ শ্রাবণ }
১৭৮০ সাল। }

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংযমের উপদেশ

এখন হইতে প্রায় তের শত বৎসর পূর্ব্বে, তখনও হজরৎ মহম্মদ মর্ত্ত্যধামে স্বশরীরে বিরাজমান। সমগ্র আরবদেশে তিনি খোদার পয়গম্বর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পারস্যরাজ-সকাশে, রোমক-সম্রাট্-সমীপে, মিশরের শাসন-কর্ত্তার কাছে এবং আবিসিনিয়ার অধিপতির নিকটে, তাঁহাদের রাজ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করিবার জন্য মহম্মদ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। কেবল তাঁহার শ্রীমুখ-সন্দর্শন-জন্য সহস্র সহস্র নরনারী নিত্য মদিনায় আগমন করে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া জীবন সফল হইল মনে করিয়া আপন আপন আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করে; শত শত নরনারী তাঁহার শ্রীমুখের একটি উপদেশ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠ হইয়া বসিয়া থাকে, কত লোক কত রূপ প্রার্থনা করে, সকলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া হৃষ্ট মনে ফিরিয়া যায়।

সেই সময়ে মদিনা-ধামে ঈশ্বর-পরায়ণ এক ঘর দরিদ্র গৃহস্থ ছিল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও তাহাদের একমাত্র শিশু-সন্তান। দম্পতী দীনহীন, দিন-মজুরি করিয়া কথঞ্চিৎরূপে দিনপাত করে; উদর পূরিয়া অন্ন দু'বেলা তাহাদের সব সময় জুটে না; বুড়া-বয়সে বেশী খাটিতে পারে না। বুড়া বয়সের সন্তান বড়ই আদরের ধন, কিন্তু এই সন্তানের সুখে তাহাদের বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ছেলেটি সন্দেশ খাইতে বড় ভালবাসে; এত ভালবাসে যে, তাহার সন্দেশ জোগাইতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কোন

কোন দিন এক বেলা, কোন দিন দুই বেলাই খাওয়া হয় না। বুড়া বয়সের ছেলে, তাহার আব্দার রক্ষা না করা তাহাদের প্রাণে বড় কষ্টকর হয়; রক্ষা করিলেও আপনাদের আহার জুটে না। ছেলেকে তাহারা কত রূপে বুঝায়, পোড়া ছেলে কিছুতেই সন্দেশ খাওয়া কমায় না, বরং ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল, তাহাকে বেশী সন্দেশ দিতে হইতেছিল। এমন করিয়া দিন ত আর যায় না।

বৃদ্ধা একদিন বৃদ্ধকে বলিল, "হজরৎ ত সকলেরই আবেদন-আব্দারে কর্ণপাত করিতেছেন, সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতেছেন, সকলেরই দুঃখ দূর করিতেছেন,—আমরাই বা কেন আমাদের দারুণ দুঃখের কথা তাঁহাকে না জানাইব? তিনি দীনদয়াল, সকলেরই উপর তাঁহার সমদৃষ্টি, আমাদের দুঃখের কাহিনী তাঁহাকে জানাইলে তিনি অবশ্যই একটা প্রতিকার করিবেন।" বৃদ্ধ একটু বিমর্ষ হইয়া, একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "এ কথাও কি হজরৎকে জানান যায়? ছেলেটিকে আমরা আব্দার দিয়া নষ্ট করিয়াছি; আমাদের কৃত কার্য্যের ফল আমরাই ভোগ করিতেছি। ঈশ্বরের নিয়মই এইরূপ; হজরৎ কি সেই নিয়মের অন্যথা-সাধন করিবেন?" বৃদ্ধা বলিল, "ও সকল কথা ভাল বুঝি না; বুঝি হজরৎ মহম্মদ দীনদয়াল, তাঁহাকে জানাইলে অবশ্য একটা প্রতিকার হইবে।"

দুই এক দিন এইরূপ জল্পনার পর বৃদ্ধ আরব মহম্মদের দরবারে গিয়া উপস্থিত হইল; সম্ভ্রমে সেলাম অভিবাদন করিয়া দরবারের এক নিভৃত কোণে স্থির হইয়া মস্তক নত করিয়া বসিয়া রহিল। হজরতের সকল দিকেই সমদৃষ্টি আছে, তিনি বর্ষীয়ানের এইরূপ

ভঙ্গী লক্ষ্য করিলেন। কত জনে কতরূপ আবেদন-নিবেদন করিল, মহম্মদ সকলকেই শান্ত করিয়া বা সান্ত্বনা দান করিয়া বিদায় দিলেন। ক্রমে সভা ভঙ্গ হইল, বৃদ্ধ সেই ভাবেই বসিয়া আছেন। মহম্মদ স্বয়ং বর্ষীয়ানের নিকট অগ্রসর হইয়া গিয়া, তাঁহার কোন কথা আছে কি না এবং কি কথাই বা আছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধ বলিল, "আমার কথা বলিবার নয়, অথচ আমি বলিতেই আসিয়াছি। আমাদের বুড়া বয়সের শিশু-সন্তান সন্দেশের জন্ত বড় আব্দার করে, আব্দার না রাখিলে আমাদের প্রাণে আঘাত লাগে, অথচ আব্দার রাখিতে গিয়া অর্থাভাবে আমাদের এক এক দিন আহার হয় না।" বৃদ্ধ আবার মস্তক নত করিল। মহম্মদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সপ্তাহ পরে ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া আনিও, আমি একবার দেখিব—কিছু করিতে পারি কি না। তাহার সাক্ষাতে কোন কথা বলিও না।" বৃদ্ধ শ্রীমুখের কথায় নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ গৃহে গিয়া সকল কথা বলিল, বৃদ্ধা গম্ভীর মুখে সকল কথা শুনিল। দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল। অষ্টম দিনে ছেলেটিকে পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার করিয়া বৃদ্ধ সঙ্গে করিয়া চলিল, পথে আদব-কায়দার কথা শিক্ষা দিতে লাগিল। বালক প্রফুল্লমনে পিতার অঙ্গুলি ধরিয়া পয়গম্বরের দরবারে উপনীত হইল। ধীরে ধীরে অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া বৃদ্ধ পূর্ব্ব দিনের সেই কোণে গিয়া ছেলেটিকে লইয়া বসিয়া রহিল। মহম্মদ লক্ষ্য করিয়াছেন।

সেইরূপ সভা ভঙ্গ হইলে পর মহম্মদ অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, ছেলেটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বৃদ্ধ, তোমার সন্তান বেশ শিষ্ট, শান্ত, স্থিরভাবে বসিয়া রহিয়াছে; উহাকে আজ

লইয়া যাও, এক মাস পরে আমার কাছে লইয়া আসিও।" বৃদ্ধ ছেলেটিকে দিয়া সেলাম করাইয়া তাহাকে কোলে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

বৃদ্ধ এক মাস পরে ছেলেটিকে সেইরূপে মহম্মদ-সকাশে লইয়া গেল। এবার সভা ভঙ্গের পর মহম্মদ আসিয়া ছেলেটিকে নিজ অঙ্কে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন, "ভাই, তুমি সন্দেশ খাইতে ভালবাস, তা সন্দেশ ভাল সামগ্রী বটে, কিন্তু এখন তোমার জ্ঞান হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছ তোমাকে সন্দেশ দিতে গিয়া তোমার পিতা-মাতার আহারের হয় ত সঙ্কুলান হয় না। তা ভাই, সন্দেশ যতই ভাল লাগুক, তোমাকে সন্দেশ খাওয়া কমাইতে হইবে, নহিলে তোমার বাপমার কষ্ট হয়, সেটা কি ভাল?" বালক কথাগুলি কাণ পাতিয়া শুনিল, পিতা তাহাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

কিছুদিন পরে ছেলে আর সন্দেশ খাইতে চায় না, কিনিয়া দিলেও খায় না—পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ মহা হৃষ্ট হইল, হজরতের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা বলিল, "তোমাকে আর এক দিন হজরৎ সকাশে যাইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে হইবে পুত্র-দর্শনের পর হজরৎ এক মাস পরে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন কেন? তাঁহার কৃপাকটাক্ষে যাহা হয়, তাহার জন্য সময় লইলেন কেন?"

বৃদ্ধ গিয়া অনুনয় করিয়া মহম্মদকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল। মহম্মদ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "দেখ বৃদ্ধ, নিজে সংযমী না হইয়া পুত্রকে, শিষ্যকে বা কাহাকেও সংযমী করা যায় না। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি সন্দেশ অত্যন্ত ভাল-বাসিতাম। প্রত্যহ দুই বেলা সন্দেশ খাইতাম। এক মাস ধরিয়া

বিশেষ চেষ্টা করিয়া সন্দেশ ভালবাসা কাটাইয়া উঠি ; তাহার পর তোমার সন্তানকে সন্দেশ-আহারে সংযমী হইতে বলি,—বড়ই আহ্লাদের কথা আমার সেই উপদেশ সফল হইয়াছে। আমি সংযম সাধনা করিতে না পারিলে আমার উপদেশের কোন ফলই হইত না।” বৃদ্ধ নতজানু হইয়া বলিল, “আমার পুত্রের কল্যাণে সংসারে আমার বিচিত্র শিক্ষা হইল।”

অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

জড়-ভরত

প্রাচীন কালে ভরত নামে এক প্রবলপ্রতাপ সম্রাট ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। তখন শাস্ত্রের শাসনানুসারে, বৃদ্ধ হইলে সকল আর্য্য সন্তানকেই সংসার ছাড়িয়া নিজ পুত্রের উপর সংসারের সমুদয় ভার—ঐশ্বর্য্য ধনসম্পত্তি সব তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া—বান-প্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। তথায় তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ আত্মার তত্ত্বচিন্তায় কাল ক্ষেপণ করিতে হইত—এইরূপে তিনি সংসারের বন্ধন ছেদন করিতেন। রাজাই হউন, পুরোহিতই হউন, কৃষকই হউন, দাসই হউন, পুরুষই হউন বা স্ত্রীই হউন, কাহারও এই শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিবার সাধ্য ছিল না।

রাজা ভরত বৃদ্ধ হইলে পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া বনে গমন করিলেন। এক সময়ে যিনি লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন, যিনি স্বুবর্ণ রজত খচিত মর্ম্মর প্রাসাদে বাস করিতেন, যাঁহার পান পাত্র নানাবিধ রত্নখচিত ছিল, তিনি হিমারণ্যের এক স্রোতস্বিনী তীরে কুশ ও তৃণ যোগে স্বহস্তে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং তথায় বাস করিয়া স্বহস্তে বন্য ফল মূল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। মানবাত্মায় যিনি অন্তর্য্যামিরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই পরমাত্মার অহরহঃ স্মরণ মননই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইল। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। একদিন রাজর্ষি নদীতীরে বসিয়া উপাসনা

করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় এক হরিণী জলপানার্থ সমাগত হইল। ঠিক সেই সময়েই কিছুদূরে একটী সিংহ প্রবল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হরিণী এত ভীতা হইল যে, সে পিপাসা শান্তি না করিয়াই, নদী পার হইবার জন্ত উচ্চ লম্ফ প্রদান করিল। হরিণী আসন্নপ্রসবা ছিল; এইরূপে হঠাৎ ভয় পাওয়াতে এবং লম্ফ প্রদানের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তৎক্ষণাৎ সে একটী শাবক প্রসব করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হরিণশাবকটী প্রসূত হইয়াই জলে পড়িয়াছিল—নদীর প্রবল তরঙ্গে তাহাকে প্রবলবেগে একদিকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে রাজার দৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হইল। রাজা নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া হরিণশাবকটীকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন, পরে নিজকুটীরে লইয়া গিয়া অগ্নিসেকাদি বিবিধ যত্ন ও শুশ্রূষা সহকারে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। করুণহৃদয় রাজর্ষি অতঃপর হরিণ শিশু-টীর লালন পালনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, প্রত্যহ তাহার জন্ত সুকোমল তৃণ ও ফলমূলাদি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সংসারোপরত রাজর্ষির জনকসুলভ যত্নে হরিণশিশুটী দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—পরিশেষে সে একটী সুন্দরকায় হরিণ হইয়া দাঁড়াইল। যে রাজা নিজ মনের তেজে পরিবার, রাজ্যসম্পদ, অতুল বিভব ও ঐশ্বর্য্যের উপর চিরজীবনের মমতা কাটাইয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে নদী হইতে তৎকর্তৃক রক্ষিত মৃগটীর উপর আসক্ত হইয়া পড়িলেন। হরিণের উপর তাঁহার স্নেহ যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তিনি ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিতে অক্ষম হইতে লাগিলেন। বনে চরিতে গিয়া যদি হরিণটীর ফিরিতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে রাজর্ষির মন

তাহার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইত। তিনি ভাবিতেন,—"আহা, বুঝি আমার প্রিয় হরিণটীকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া থাকিবে, অথবা হয়ত তাহার অন্য কোন রূপ বিপৎপাত হইয়াছে, নতুবা তাহার ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন ?"

এইরূপে কয়েক বর্ষ কাটিয়া গেল। অবশেষে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে রাজর্ষির মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার মন মৃত্যুকালেও আত্মতত্ত্বধ্যানে নিযুক্ত না হইয়া হরিণটীর চিন্তায়ই নিযুক্ত ছিল। নিজ প্রিয়তম মৃগটীর কাতর নয়নের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার জীবাত্মা দেহত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে হরিণ ভাবনার ফলে পরজন্মে তাঁহার হরিণ জন্ম হইল। কিন্তু কোন কর্ম্মই একেবারে ব্যর্থ হয় না। সুতরাং রাজর্ষি ভরত গৃহস্থাশ্রমে রাজারূপে এবং বানপ্রস্থাশ্রমে ঋষিরূপে যে সকল মহৎ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহারও ফল ফলিল—যদিও তিনি বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়া পশুশরীর পরিগ্রহ করিলেন, কিন্তু তিনি জাতিস্মর হইলেন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সমুদয় কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত রহিল। তিনি নিজ সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বসংস্কারবশে ঋষিগণের আশ্রমের নিকট চরিতে যাইতেন, যথায় প্রত্যহ যাগ হোম ও উপনিষদালোচনা হইত।

মৃগরূপী ভরত যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পরজন্মে কোন ধনী ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মেও তিনি জাতিস্মর হইলেন—সুতরাং পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকাতে, তাঁহার বাল্যকাল হইতেই এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইল যে, তিনি আর সংসারের পাপপুণ্যে জড়িত হইবেন না। শিশুর ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইলেন,

কিন্তু কাহারও সহিত একটীও বাক্যালাপ করিতেন না—পাছে সংসারজালে জড়িত হইয়া পড়েন এই ভয়ে তিনি জড় ও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মন সেই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে সর্ব্বদা সংলগ্ন থাকিত, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্যই তিনি জীবন ধারণ করিতেন। কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইল, পুত্রগণ পিতার সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন,—তাঁহারা তাঁহাদের ঐ সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জড় ও অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়া তৎপ্রাপ্য সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া তাহা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ভ্রাতার প্রতি এইটুকু মাত্র অনুগ্রহ করিলেন যে, তাঁহাকে দেহ ধারণোপযোগী আহার মাত্র দিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃজায়াগণ সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিতেন,—তাঁহাকে সর্ব্বদা গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, আর যদি তিনি তাঁহাদের সকল কার্য্য খুঁটাইয়া করিতে অক্ষম হইতেন, তবে তাঁহাকে ঘোরতর নির্য্যাতন করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি বা ভয় হইত না, তিনি একটী মাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতেন না। যখন অত্যাচারের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত হইত, তখন তিনি গৃহ হইতে নিস্তব্ধভাবে বাহির হইয়া গিয়া তাঁহাদের ক্রোধোপশম পর্য্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃক্ষমূলে বসিয়া থাকিতেন—তাঁহাদের রাগ পড়িয়া গেলে আবার শান্তভাবে গৃহে ফিরিয়া যাইতেন।

একদিন জড়-ভরতের ভ্রাতৃবধূগণ তাঁহাকে অতিরিক্ত তাড়না করিলে তিনি গৃহের বাহির হইয়া গিয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই দেশের রাজা শিবিকাযোগে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একজন

শিবিকাবাহক অসুস্থ হইয়া পড়িল,—তখন রাজানুচরবর্গ তাহার স্থানে শিবিকা-বহন-কার্য্যের জন্য আর একজন লোক অন্বেষণ করিতে লাগিল ও অনুসন্ধান করিতে করিতে জড়-ভরতকে বৃক্ষতলে দেখিতে পাইল। তাঁহাকে সবল যুবাপুরুষ দেখিয়া তাহারা তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাজার এক শিবিকাবাহকের পীড়া হইয়াছে,—তুমি তাহার পরিবর্ত্তে রাজার শিবিকাবহন করিতে প্রস্তুত কিনা?" ভরত তাহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। রাজানুচরগণ দেখিল, এ ব্যক্তি বেশ হৃষ্টপুষ্ট,—ইহা দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিল। ভরতও নীরবে শিবিকাবহন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা দেখিলেন, শিবিকা বিষম ভাবে চলিতেছে। শিবিকার বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি নূতন বাহককে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মূর্খ,—কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর্, যদি তোর স্কন্ধে বেদনা বোধ হইয়া থাকে, তবে কিছু বিশ্রাম কর্।" তখন ভরত স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া জীবনের মধ্যে এই প্রথম মৌনভঙ্গ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হে রাজন্, আপনি মূর্খ কাহাকে বলিতেছেন? কাহাকে আপনি শিবিকা নামাইতে বলিতেছেন? কাহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? হে রাজন্ 'তুই' শব্দের দ্বারা যদি আপনি মাংসপিণ্ড দেহটাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন তবে দেখুন, আপনার দেহও যেমন পঞ্চভূতনির্ম্মিত, এই দেহও তদ্রূপ। আর দেহটা ত অচেতন, জড়, উহার কি কোন প্রকার ক্লান্তি বা কষ্ট থাকিতে পারে? যদি মন আপনার লক্ষ্য হয়, তবে আপনার মন যেরূপ, আমারও ত তাহাই—উহা ত সর্ব্বব্যাপী,

আর যদি 'তুই' শব্দে দেহমনেরও অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত উহা সেই আত্মতত্ত্ব—আমার যথার্থ স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে—তাহা আপনাতেও যেমন, আমাতেও তদ্রূপ বর্ত্তমান—জগতের মধ্যে উহাই সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং"-তত্ত্ব। রাজন্, আপনি কি বলিতে চাহেন,—আত্মা কখনও ক্লান্ত হইতে পারেন? আপনি কি বলিতে চাহেন,—আত্মা কখন আহত হইতে পারেন? হে রাজন্, আমার এই দেহটার—অসহায় পথসঞ্চারী কীটগুলিকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা ছিল না—সেই কারণে যাহাতে তাহারা পদদলিত না হয়, এইভাবে সাবধান হইয়া চলাতেই শিবিকা বিষম হইয়াছিল। কিন্তু আত্মা ত কখনও ক্লান্তি অনুভব বোধ করে নাই—উহা কখন দুর্ব্বলতা বোধ করে নাই। কারণ, আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্।" এইরূপে তিনি আত্মার স্বরূপ, পরাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক উপদেশ দিলেন। রাজা পূর্ব্বে বিদ্যা ও জ্ঞান গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন—তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইল। তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া ভরতের চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে মহাভাগ, আপনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহা না জানিয়াই আপনাকে শিবিকা বহন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম—তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।" ভরত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ও পূর্ব্ববৎ আপন ভাবে নীরবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যখন ভরতের দেহপাত হইল, তিনি চিরদিনের জন্য জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ।

সৌভ্রাত্র

রামের ন্যায় তাঁহার অনুজগণও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। সকলে যথাসাধ্য রামের গুণের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। রামের শিক্ষা, রামের বিনয়, এবং রামের চরিত্রকে তাঁহারা আদর্শস্বরূপ মনে করিতেন।

ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রামের বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। রাম সর্ব্বদা তাঁহাদের শুভানুধ্যান করিতেন; তাঁহারাও রামের সস্নেহ ব্যবহারে আসক্ত হইয়া ভক্তিকুসুমে নিরন্তর রামের পূজা করিতেন।

ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পর অলৌকিক প্রীতি থাকিলেও লক্ষ্মণ রামের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন। রামলক্ষ্মণের অনুপম সৌহার্দ্দ দেখিলে মনে হইত, রাম চন্দনতরু, লক্ষ্মণ তাঁহার সৌরভ; রাম চন্দ্রমণ্ডল, লক্ষ্মণ তাঁহার কিরণকলাপ; রাম দেহযষ্টি, লক্ষ্মণ তাঁহার প্রতিবিম্ব! রাম যখন যে কার্য্য করিতেন, লক্ষ্মণ অযাচিতভাবে তাহাতে রামের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

বিশ্বামিত্র, রাক্ষসবিনাশার্থ রামকে লইয়া যাইতে আসিলে দশরথের আদেশানুসারে রাম মুনির সঙ্গে গমন করিলেন, লক্ষ্মণ ছায়ার ন্যায় রামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। রামের স্নেহে লক্ষ্মণ এরূপ আসক্ত হইয়াছিলেন, রামের গুণে লক্ষ্মণ এতদূর বদ্ধ হইয়াছিলেন।

পিতার আদেশে বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাম জননীর অনুমতি গ্রহণের নিমিত্ত তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আমূল

সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে, কৌশল্যার হৃদয়ে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল, অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে যেন দৃষ্টি আবৃত করিল, কল্পান্ত সময়ের কালানলে যেন হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল,—কৌশল্যা হাহারবে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের হৃদয়ে ধূমায়িত ক্রোধবহ্নি আর প্রচ্ছন্ন রহিল না,—দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পিতার কার্য্যের নিন্দাবাদ করিয়া বাহুবলে রাজ্যগ্রহণ করিতে রামকে অনুরোধ করিলেন। রাম বনে গমন করিলে লক্ষ্মণ যে গৃহে অবস্থান করিতে পারিবেন না, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিলেন। তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন,—"প্রজ্বলিত হুতাশনেই হউক, আর অরণ্যেই হউক, রাম যেখানেই প্রবেশ করিবেন, আপনি জানিবেন, আমি অগ্রেই সেখানে প্রবেশ করিয়াছি।" রামের সন্তুষ্টিবিধান বা মঙ্গলসাধনার্থ লক্ষ্মণ না করিতে পারিতেন, এমন কার্য্য ছিল না।

যখন লক্ষ্মণ দেখিলেন, সত্যব্রত রাম পিতৃসত্যপালনার্থ বন গমনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার আর কোন উপায় নাই, তখন বাষ্পপর্য্যাকুললোচনে অগ্রজের চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া তাঁহার অনুগমনে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন,—"আমি দেবলোকের আধিপত্য প্রার্থনা করি না, অমরত্ব কামনা করি না, আপনাকে ছাড়িয়া ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যেও অভিলাষ করি না।"

রাম নানাপ্রকার উপদেশদ্বারাও লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, অনন্যোপায় হইয়া অনুগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ ফলমূলাহারী হইয়া, জটাবল্কল ধারণ করিয়া ভৃত্যের ন্যায়,

চতুর্দ্দশ বর্ষ রামের সেবা করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন।

রামের স্নেহপাশে লক্ষ্মণ এরূপ বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর কোন প্রকার প্রলোভন সেই পাশ ছিন্ন করিতে পারে নাই। রামের অভাবে সমস্ত জগতের সুখ-সম্পদ লক্ষ্মণের চক্ষে বিষবৎ প্রতিভাত হইত। সেই জন্যই শ্বাপদাকীর্ণ বনভূমি লক্ষ্মণের নিকট রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি-প্রদায়িনী হইয়াছিল, সেই জন্যই কটু-তিক্ত-কষায় ফলমূলাদি লক্ষ্মণের পক্ষে রাজভোগের মধুরাস্বাদ অপেক্ষাও অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছিল।

ভরতও রামগতহৃদয় ছিলেন। মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় সমাগত হইয়া ভরত পিতৃনিধন ও রাম-বনবাসের সংবাদ শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখসন্তপ্ত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণের বিচ্ছেদে ভরত নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন, নিরন্তর মর্ম্মে মর্ম্মে শঙ্কুবেধযাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

ভরত, জননীর অপকার্য্যে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন; অসহ্য দুঃখাবেগ সংবরণ করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন; এবং স্বয়ং রামকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। পুরোহিত অভিষেকের প্রস্তাব করিলে, ভরত শোকে পরিপ্লুত হইয়া বাষ্পাকুল বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমি ধর্ম্ম-পরায়ণ রামের রাজ্য কিরূপে অপহরণ করিব? রাজ্য রামের, আমিও রামের; তিনি জ্যেষ্ঠ, পূজ্য। পিতার ন্যায় তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার যোগ্য পাত্র। আর্য্যজনবিগর্হিত, অধর্ম্মকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ইক্ষ্বাকু-কুল কলঙ্কিত করিতে আমার প্রতি

আদেশ করিবেন না। আমি বনে যাইয়া অগ্রজকে প্রত্যাবৃত্ত করিব; যদি একান্তই তিনি প্রত্যাবর্ত্তনে অস্বীকৃত হন, তবে লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও বনে বাস করিব।" ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের ইহা অপেক্ষা অধিকতর নিদর্শন আর কি হইতে পারে? অখণ্ড সাম্রাজ্যের আধিপত্য যাঁহার ভ্রাতৃবিরহানলদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিতে পারিল না, পার্থিব সুখসমৃদ্ধিলাভের আশা স্বকীয় বিজয়িনী শক্তির প্রভাবে যাঁহার ভ্রাতৃভক্তির স্থান অধিকার করিতে পারিল না, তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি, কি প্রকার বদ্ধমূল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

ভরত রাম-বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া সৈন্য ও পরিজন-বর্গের সহিত বনে প্রস্থান করিলেন। রামবিচ্ছেদে যাঁহারা কাতর, সকলেই ভরতের অনুগমন করিলেন। শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইয়া ভরত, নিষাদরাজ গুহের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। গুহ, ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য সুখশয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিতে বলিলে, ভরত বলিলেন,—"রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ভূমিতলে শয়ন করিতেছেন, আমি কিরূপে শয্যায় শয়ন করিব? কিরূপে সুখভোগ করিব, কিরূপে জীবনধারণ করিব?"—বলিতে বলিতে রামচিন্তাময় মহাশোক ভরতের হৃদয় অধিকার করিল। কোটরগত বহ্নিসন্তাপে দাবাগ্নিবিশুষ্ক পাদপের ন্যায়, রামশোকে ভরত-হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

গুহপ্রদর্শিত রামের পর্ণনির্ম্মিত শয্যা অবলোকন করিয়া ভরত মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"হায়, আমি কি হতভাগ্য! আমার জন্য সার্ব্বভৌম-কুল-ভূষণ, সর্ব্বলোক-প্রীতিবর্দ্ধন, ইন্দীবরশ্যাম রাম অনাথের ন্যায় ঈদৃশ শয্যায় শয়ন

করিয়াছিলেন ! যিনি সুখের কোমল ক্রোড়ে নিরন্তর লালিত, দুঃখের তীব্র যাতনা যিনি কখনও অনুভব করেন নাই, তাঁহার কি এই শয্যা ! অদ্য হইতে আমি ভূতলশয়নে বা তৃণ-শয্যায় শয়ন করিব, জটাবল্কল ধারণ করিব, ফলমূলাশন হইয়া জীবন যাপন করিব এবং পিতৃসত্য পালনার্থ শত্রুঘ্নের সহিত স্বয়ং বনে বাস করিব। রাম, লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় যাইয়া রাজত্ব করুন। দেবগণ আমার এই মনোরথ পূর্ণ করিবেন কি? যদি একান্তই তাহা না হয়, তবে আমিও অগ্রজের সহিত বনে বাস করিব।"

এইরূপে বিলাপ করিয়া ভরত রামের উদ্দেশে ভরদ্বাজাশ্রমে গমনপূর্ব্বক চিত্রকূট গিরিতে তাঁহার অবস্থানের বিষয় অবগত হইলেন। একদিবস মাত্র ভরদ্বাজাশ্রমে বিশ্রাম করিয়া তিনি সসৈন্যে চিত্রকূটাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রাম সৈন্যকোলাহল শ্রবণ করিয়া কাহার সৈন্য আসিতেছে জানিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ লক্ষণ দ্বারা ভরতের সৈন্য চিনিতে পারিলেন। রামের অনিষ্ট সাধনার্থ ভরত আসিতেছেন, লক্ষ্মণ এরূপ কল্পনা করিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং রামের নিকট উপস্থিত হইয়া মনোভাব প্রকাশপূর্ব্বক সসৈন্য ভরতের প্রাণ সংহার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

ভ্রাতৃগতপ্রাণ রাম লক্ষ্মণকে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"যদি ভরত বিরুদ্ধাচরণ করিতে আসিয়া থাকে, তাহাকে বধ করিয়া কি করিব? বান্ধব বা মিত্রগণকে বিনাশ করিয়া যাহা লাভ করিতে হয়, বিষময় খাদ্যের ন্যায় তাহা আমি গ্রহণ করিব না। আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বা পৃথিবী এই সমস্তই

তোমাদিগের জন্য ; তুমি নিশ্চয় জানিবে, ভ্রাতৃগণের সুখসংবর্দ্ধনার্থই আমার রাজ্য-গ্রহণ। পৃথিবীর আধিপত্যগ্রহণে আমি অসমর্থ নহি ; অধর্ম্মাচরণ করিয়া পৃথিবীর রাজত্ব কেন ইন্দ্রত্বও আমি অভিলাষ করি না। ভরত, শত্রুঘ্ন ও তোমার অভাবে, যে বস্তু আমার সুখোৎপাদন করিবে, তা অগ্নিতে দগ্ধ হউক।"

ক্ষণকাল পরে জটাচীরধারী ভরত রামসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নয়নবারিতে রামের চরণযুগল প্রক্ষালিত করিলেন, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাম কোনক্রমেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া ভরতও বনবাসে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পরে বনবাসী ঋষিগণের উপদেশে এবং সান্ত্বনায়, ভরত রামের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; এবং নন্দিগ্রামে পাদুকাযুগলকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রামের সেবকের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

যখন অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া রাম প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন রামের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবনধারণ নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া লক্ষ্মণ সরযূজীবনে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। লক্ষ্মণের বিরহে রাম, ভরত, ও শত্রুঘ্নেরও জীবনধারণ অসম্ভব বোধ হইল, লক্ষ্মণের বিচ্ছেদবহ্নি নিরন্তর তাঁহাদিগের হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল, তাঁহারাও সরযূর শান্তিময় পবিত্র সলিলে দেহত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদানল প্রশমিত করিলেন।

ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের ন্যায় ভ্রাতৃভক্ত এবং রামের ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল, মনুষ্যলোকে কেন, দেবলোকেও দুর্লভ। রাম নিরন্তর

স্নেহসুধা বর্ষণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতেন, ভ্রাতৃগণও রামস্নেহামৃতের মধুর আস্বাদে মুগ্ধ হইয়া, রামের স্নেহময়, প্রেমময়, মধুময় মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। রামের অনুজস্নেহ যেমন অনুপম, অনুজগণের ভ্রাতৃভক্তিও তেমনি অনুপম ছিল।

শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ।

লক্ষ্মীবাই

লক্ষ্মীবাই খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রকৃত বীর-রমণী। যখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, যখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ড দৃপ্ত ব্রিটনের বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত, তখন লক্ষ্মীবাই বদ্ধমূল ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া স্বাধীনতার গৌরব রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হন এবং আপনার লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলেন। লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয় যেমন কমনীয় কামিনীজনোচিত মধুরতা ও স্নিগ্ধতায় আর্দ্র ছিল, তেমনি স্থিরতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতায় উহা অটল হইয়া উঠিয়াছিল। যদি কেহ মাধুর্য্যময় কোমল সৌন্দর্য্যের সহিত ভয়ঙ্কর ভাবের সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রভাতকমলের অঙ্গ-বিলাসের সহিত বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতে চাহেন, যদি কেহ কোমল বীণাধ্বনির সহিত লোকারণ্যের পর্ব্বত-বিদারক ভৈরব রব শুনিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে লক্ষ্মীবাই তাঁহার নিকট অনুপম স্বর্গীয় ভাবের অদ্বিতীয় আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এই লাবণ্যময়ী বীরাঙ্গনার বীরত্ব-কাহিনী শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

লক্ষ্মীবাই কে? তিনি কি জন্য ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন? যে শক্তির প্রভাবে দিগ্বিজয়ী মহারাট্টারা মস্তক অবনত করিয়াছিল, পাঞ্জাব-কেশরীর পঞ্চনদ পূর্ব্ব-গৌরব-ভ্রষ্ট

হইয়াছিল, বাঙ্গালা ও বিহারের শ্যামল ভূমিতে, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর সমৃদ্ধ স্থলে, সিন্ধু ও মধ্য ভারতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পতাকা অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বিকাশ পাইতেছিল, এবং ইঙ্গ্লণ্ডের বণিক সমাজের এক জন কর্ম্মচারীর ক্ষমতা বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য, অশোক বা ভোজের ক্ষমতার গৌরব-স্পর্দ্ধিনী হইতেছিল, কি জন্য সেই মহাশক্তি পর্য্যুদস্ত করিতে উদ্যত হন, এস্থানে তাহার উল্লেখ করা উচিত হইতেছে।

ভারতের মানচিত্রের মধ্যস্থলে বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝাঁসি নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অবস্থান দেখা গিয়া থাকে। ঝাঁসি প্রকৃতির রমণীয় স্থানে অবস্থিত। উহার উত্তর ও দক্ষিণ, দুই দিকেই সমুন্নত পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশ হরিদ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। স্থানে স্থানে প্রশস্ত জলাশয় অপূর্ব্ব গ্রাম্য শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিমাণ ১,৫৬৭ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে ঝাঁসি মহারাষ্ট্র-কুল-গৌরব পেশবার আশ্রিত ও অনুগত মহারাষ্ট্র বংশীয়ের শাসনাধীন ছিল, পরে ১৮১৭ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত উহার সংশ্রব জন্মে। ঝাঁসির শেষ অধিপতির নাম গঙ্গাধর রাও। ইনি ১৮৩৮ অব্দে ঝাঁসির গদীতে আরোহণ করেন। লক্ষ্মীবাই এই গঙ্গাধর রাওর পত্নী।

১৮৫৩ অব্দে গঙ্গাধর রাওর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে যথানিয়মে একটি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কহেন, "আমি এখন সাতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। একটি ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহে থাকাতেও এতদিনের পর আমার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম

বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া, আমার বড় মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে। আমি এইজন্য, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের যে সন্ধি হয়, তাহার দ্বিতীয় ধারা অনুসারে আনন্দ রাও নামে আমার একটি পঞ্চম বর্ষীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় ও আপনার গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমি রোগ হইতে মুক্ত হই, আমি যেরূপ তরুণবয়স্ক, তাহাতে যদি আমার কোন পুত্র-সন্তান জন্মে তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্য করিব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহা হইলে আমার বিশ্বস্ততার অনুরোধে যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বালকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া বালকের মাতা ও আমার বিধবা পত্নীকে আজীবন সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী করেন। তাঁহার প্রতি যেন কখনও কোনরূপ অসদ্ব্যবহার প্রদর্শিত না হয়।"

মুমূর্ষু গঙ্গাধর রাওর লেখনী হইতে এইরূপ বিনয়-নম্র বাক্য বহির্গত হইয়াছিল, এইরূপ সৌজন্য তাঁহার জীবনের শেষ লিপির প্রতি অক্ষর উদ্ভাসিত করিয়াছিল। কিন্তু মুমূর্ষুর এই শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইল না। এই সময়ে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। যিনি রণজিতের রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন, যাঁহার রাজনীতির মহিমায় সেতারা রাজ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-বংশীয়ের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়, এক্ষণে ঝাঁসির বিচারভার তাঁহারই হাতে আসিল। ডালহৌসী অবসর বুঝিয়া সেতারার ন্যায় ঝাঁসি গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্প-সিদ্ধির পক্ষে বিলম্ব হইল না। অবিলম্বে আদর্শলিপি প্রচারিত হইল। ঝাঁসি ডালহৌসীর সর্ব্বসংহারিণী লেখনীর আঘাতে রাওবংশীয়ের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল।

ঝাঁসি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত হইল বটে, কিন্তু তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত হইলেন না। তাঁহার রাজ্য পর-হস্তগত হইয়াছে, পরদেশীয় পরপুরুষ অবলীলায়—অম্লানভাবে তাঁহার দত্তক-পুত্রের অধিকার বিলুপ্ত করিয়াছে, ইহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। এ মর্ম্মজ্বালা অমনি নিবারিত হইল না। লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয় অতি উচ্চভাবে পূর্ণ ছিল। মেজর মালকমের ন্যায় ব্যক্তিও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "লক্ষ্মীবাই সাতিশয় মাননীয়া ও রাজপ্রতিনিধিত্বের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্রী। তাঁহার স্বভাব অতি উচ্চভাবের পরিচায়ক। ঝাঁসির সকলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় সম্মান দেখাইয়া থাকে।" এই উচ্চ প্রকৃতির বীরাঙ্গনা স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন; সন্ধির নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত ও দত্তকগ্রহণের বিধি দেখাইয়া ঝাঁসির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আগ্রহ সহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রার্থনা বা সেই চেষ্টা ফলবতী হইল না। এই অবিচারে ও অবমাননায় লক্ষ্মীবাই সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়গত ব্যথা কেবল নয়ন-জলের সহিত বিলীন হইল না, অবিলম্বে উহা হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যাঁহার প্রকৃতি উন্নত করিয়াছে, অটলতা যাঁহার হৃদয় অবিচলিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং অধ্যবসায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তির আক্রমণ সহ্য করিবার উপযোগিনী করিয়া তুলিয়াছে, তিনি কখনও কোন প্রকার বিপদে কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দেন না। লক্ষ্মীবাই এইরূপ প্রকৃতির ছিলেন। সুতরাং তিনি আপনার দশা-বিপর্য্যয়েও দৃঢ়তর অধ্যবসায় হইতে স্খলিত

হইলেন না। ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎকালে লক্ষ্মীবাই সক্রোধে বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মেরি ঝাঁসি দেঙ্গে নেহি।" লক্ষ্মীবাইয়ের এই ধ্বনিতে ব্রিটিশ এজেণ্টের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। এজেণ্ট এই বীররমণীর দৃঢ়তায় স্তম্ভিত হইলেন। ঝাঁসি কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হইল বটে, কিন্তু এই অবমাননা-রেখা বীরজায়া বীরাঙ্গনার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত রহিল—কামিনীর কোমল হৃদয় অপমানবিষে কালিময় হইয়া উঠিল।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহি-যুদ্ধের সময় যখন ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়, কানপুর, মিরাট, লক্ষ্ণৌ, দিল্লীর সঙ্গে সঙ্গে যখন বুন্দেলখণ্ডও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, তখন তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই আপনার প্রণষ্ট গৌরবের উদ্ধার সাধনে যত্নবতী হন। যে তুষানল তাঁহার হৃদয়ে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা এই সময়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। লক্ষ্মীবাই এই সময়ে কামিনীর কমনীয় বেশ পরিত্যাগ করিলেন। যুদ্ধবেশে এখন তাঁহার লাবণ্যময় দেহ সজ্জিত হইল। তদীয় সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনী ভগিনী এখন তাঁহার সহকারিণী হইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের যুবতী বীরাঙ্গনা সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। বৈদেশিকের কঠোর লেখনী হইতে যাহাই নির্গত হউক না কেন, সহৃদয় কবি ও সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিকের নিকট এ চিত্র চিরকাল পবিত্র বলিয়া সম্পূজিত হইবে। কে ভাবিয়াছিল, প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে ভারতে আবার এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের সঞ্চার হইবে? কে ভাবিয়াছিল, এই পরাধীনতার সময়ে ভারতের কোমলতাময়ী যুবতী অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ়া হইয়া কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া মহাশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইবেন? যে

কমনীয় বহ্নিশিখা লোকলোচনের তৃপ্তি জন্মাইতেছিল, কে ভাবিয়াছিল, তাহা সংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ভৈরব রবে চারিদিক্ দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে? অধিক দিন অতীত হয় নাই ভারতের এইরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে নিৰ্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভারতবাসীর মধ্যে এইরূপ জ্বলন্ত পাবক-শিখার আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতের যুবতী বীর-রমণী যৌবনের বিলাস পরিহার করিয়া এইরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ণ-বিকশিত শতদল এইরূপ কঠোরতায় পরিণত হইয়াছিল।

লক্ষ্মীবাই বীরপুরুষের বেশ পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার কোমল দেহ কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল, কোমল হস্তে কঠোর অসি শোভা পাইতে লাগিল। সৌন্দর্য্য-লীলাময়ী ললনার লাবণ্যরাশি এখন অপূর্ব্ব ভীষণতার সহিত মিশিয়া গেল। সহৃদয় পাঠক! দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ হতাশ ভারতের শোচনীয় অবস্থার মধ্যে একবার এই অপূর্ব্ব ভাবের বিষয় চিন্তা কর, কল্পনার নেত্রে একবার এই ভয়ঙ্করী মহাশক্তির দিকে চাহিয়া দেখ। হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব—অচিন্ত্যপূর্ব্ব—অনাস্বাদিতপূর্ব্ব কি এক অনির্ব্বচনীয় রসের সঞ্চার হইবে। লক্ষ্মীবাই বীর-পুরুষের বেশে অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ়া হইয়া, আপনার মারহাট্টা সৈন্যদিগকে পরিচালনা করিলেন। ব্রিটিশ সেনার সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। লক্ষ্মীবাই এই যুদ্ধে কিছুমাত্র কাতরতা দেখান নাই। তিনি কয়েক মাস অসীম সাহসে ইঙ্গ্‌রেজ-দিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সুদক্ষ ব্রিটিশ সেনাপতি কয়েক মাস এই বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার অদ্ভুত রণ-কৌশল ও অসামান্য সাহসে বিস্মিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যশোগানে প্রবৃত্ত হন। লক্ষ্মীবাই ব্যতীত

কোনও সেনাপতি রণ-ক্ষেত্রে স্যার হিউ রোজকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত করেন নাই। প্রথম যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই আপনার অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সংগ্রাম নৈপুণ্যে ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার হিউ রোজের সৈন্যদল বিশৃঙ্খল ও হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। যাঁহারা মহাসংগ্রামে নেপোলিয়ানের ন্যায় অলোকসামান্য বীর পুরুষকেও হতগৌরব করিয়াছিলেন, ভারতের বীর-রমণী তাঁহাদের সৈন্যদল নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের ভয়ঙ্কর সময়ে ভারতের মহাশক্তি ব্রিটিশ সেনাপতির শক্তিনাশে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এ অপূর্ব্ব ভাবের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করা সকলের সাধ্য নহে। বহু সৈন্য নষ্ট হইলেও লক্ষ্মীবাইয়ের তেজস্বিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তিনি আবার মহাপরাক্রমে কল্পিনগরে ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষে কল্পি ইঙ্গ্‌রেজদিগের অধিকৃত হয়। লক্ষ্মীবাই ইহাতেও উৎসাহ বা উদ্যমশূন্য হন নাই। যাহারা তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার পুত্রকে সামান্য লোকের অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে, যে কোন প্রকারে হউক, তাহাদের ক্ষমতা নষ্ট করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষ্মীবাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বীর-রমণীর এ প্রতিজ্ঞা কখনও স্খলিত হয় নাই—বীরত্বের এ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কখনও কোনরূপ কালিমার ছায়া স্পর্শে নাই। ১৮৬৮ অব্দের ১৭ই জুন লক্ষ্মীবাই গোয়ালিয়রের নিকট আবার ইঙ্গ্‌রেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন, আবার ভৈরব রবে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার হিউ রোজের সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধই বীর-রমণীর জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের শেষেই বীর-রমণীর পবিত্র জীবন-স্রোত স্বর্গীয় অমৃত-প্রবাহে

মিশিয়া যায়। এই যুদ্ধেই বীরাঙ্গনার অসাধারণ পরাক্রম দেখিয়া স্যার হিউ রোজ কহিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীবাই যদিও রমণী, তথাপি তিনি বিপক্ষদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিনী ও সর্ব্বাপেক্ষা রণ-পারদর্শিনী।" বীরপুরুষ বীরাঙ্গনার প্রকৃত বীরত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই সম্মানের সহিত সেই বীরত্বের এইরূপ গৌরব রক্ষা করেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই ও তাঁহার ভগিনী আপনাদের সৈন্যদলের অগ্রভাগে ছিলেন। উভয়েই বর্ম্মাচ্ছাদিত, উভয়েই অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ়, এবং উভয়েই বীর-পুরুষের বেশে সজ্জিত। ঘোরতর সংগ্রামের পর উভয়ে যখন রণ-ভূমি হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ তুরুকসোয়ারের গুলিতে অথবা অসির আঘাতে উভয়েরই প্রাণ-বায়ুর অবসান হয়। রণ-ক্ষেত্রে এই বীরাঙ্গনাদ্বয়ের পতন ব্রিটিশ সেনাপতির নয়ন-গোচর হয় নাই। শেষে ইহাদের রক্তাক্ত দেহ পবিত্র সমর-ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছিল। মৃতদেহ রক্ষার জন্য লক্ষ্মীবাইয়ের বিশ্বাসী দেহরক্ষকগণ প্রাণপণ করিয়া চারিপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। অবিলম্বে চিতা প্রস্তুত হইল। দেখিতে দেখিতে পরমসুন্দরী বীর-রমণী-যুগলের দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। লক্ষ্মীবাইয়ের জীবন-নাটকের এই শেষ অঙ্ক কি গভীর ভাবের উদ্দীপক! আপনার স্বাধীনতার জন্য যুবতী বীর-রমণীর এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ কি গভীর উপদেশের পরিপোষক! লক্ষ্মীবাই ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার প্রশংসা করি না, কিন্তু তিনি যেরূপ তেজস্বিতা ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে হয়।

রজনীকান্ত গুপ্ত।

কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকাল বেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বল্‌ছিল, সে কিছু জানে না। না?"

আমি, পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখ বাবা, ভোলা বল্‌ছিল আকাশে হাতী শুঁড় দিয়ে জল ফেলে তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বক্‌তে পারে? কেবলি বকে, দিনরাত বকে!"

সে পরক্ষণেই আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা!"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুইচার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনি ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মত ছিল যে, ঐ ঝুলিটার ভিতরে সন্ধান করিলে তাহার মত দুটো চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপ সিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভাল হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুষ, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাস্য করিল, "বাবু, তোমার লড়্‌কী কোথা গেল ?"

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁসিয়া কাবুলীর মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলী ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকাল বেলায় আবশ্যক বশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে, কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁস্‌লা বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চমবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্য্যবান্ শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, "উহাকে এ সব কেন দিয়াছ ? অমন আর দিওনা।" বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসঙ্কোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পূরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোল আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভৎসনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি ?"

মিনি বলিতেছে, "কাবুলিওয়ালা দিয়েচে।"

তাহার মা বলিতেছেন, "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি!"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাইনি, সে আপনি দিল!"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তা বাদাম ঘুস দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা, রহমৎকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কি?"

রহমৎ একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, "হাঁতি।"

অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম্ম।—খুব যে বেশী সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমৎ মিনিকে বলিত, "খোঁখী, তোমি সসুর-বাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, আজন্মকাল "শ্বশুর-বাড়ি" শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু এ-কেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এই জন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। সে উল্‌টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি শ্বশুর-বাড়ি যাবে ?"

রহমৎ কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোন এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখন কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেই জন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্ব্বদা মন-কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমন বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্ব্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটীরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবন-যাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এই জন্য সকালবেলায় আমার ছোট ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের

কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সঙ্কীর্ণ মরুপথ, বোঝাই করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগ্‌ড়ি-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের পরে, কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চক্‌মকি-ঠোকা বন্দুক, কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্ব্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এতদিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমৎ কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্য্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন—"কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না? কাবুলদেশে কি দাস-ব্যবসায় প্রচলিত নাই? একজন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোট ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?"

আমাকে মানিতে হইল ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে,

এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমৎকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমৎ দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড় ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয় উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যে দিন আসিতে পারে না, সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলে-ঢালা জামা-পায়জামা-পরা সেই ঝোলা-ঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতর একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

কিন্তু যখন দেখি মিনি "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফ্‌শীট্‌ সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্ব্বে আজ দুই তিন দিন হইতে শীতটা খুব কন্‌কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে—মাথায় গলাবন্দ জড়ানো ঊষাচরগণ প্রাতভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমৎকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন, এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপারটা কি?"

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত—মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে, এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমৎ তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমৎ সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানা রূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময়ে "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুক-হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুর-বাড়ি যাবে?"

রহমৎ হাসিয়া কহিল, "সেইখানেই যাচ্ছে।"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া কহিল—"সসুরকে মারিতাম কিন্তু কি করিব হাত বাঁধা!"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা এক প্রকার ভুলিয়া গেলাম্। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চল-হৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল, এমন কি এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ত তাহার সহিত এক প্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল! আর একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্রে যেন সোহাগায়-গলানো নির্মল সোনার মত রং ধরিয়াছে। এমন কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টকজর্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলার উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রিশেষে হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশী যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরে ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে, হাঁকডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমৎ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্ব্বের মত সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কিরে রহমৎ, কবে আসিলি?"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট করিয়া উঠিল। কোন খুনীকে কখন প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভাল হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।—"

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না ?"

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্ব্বের মত "কাবুলি-ওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন কি, পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম বোধ করি কোন স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম—"আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে—"বাবু সেলাম্" বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিস্‌মিস্ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল,—কহিল—"আপনার বহুত দয়া আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।

"বাবু, তোমার যেমন একটি লড়্‌কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়্‌কী আছে! আমি তাহার মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি ত সঁওদা করিতে আসি না।—"

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু যত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম কাগজের উপরে একটি ছোট হাতের ছাপ। ফোটগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূষা মাখাইয়া কাগজের উপর তাহারই চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ-চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শ-খানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছলছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা, আর আমি যে একজন বাঙালী সম্ভ্রান্তবংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে; সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্ব্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতেই কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা চেলিপরা কপালে চন্দন আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথম থতমত খাইয়া গেল,

তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল—"খোঁখী, তোমি সসুর-বারি যাবিস্ ?"

মিনি এখন শ্বশুর-অর্থ বোঝে, এখন আর পূর্ব্বের মত উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমৎ মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্ব্বের মত তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কি হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমৎ কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, রহমৎ তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হোক।

এই টাকাটা দান করিয়া, হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও বাদ পড়িল, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গঙ্গার শোভা

শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা, ছায়া কুটীর —নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি, গাছ পালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা-বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল-ছোঁড়াছুড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কি শোভা! মানুষেরা যে এ ঘাট

বাঁধিয়াছে তাহা এক রকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশ্বত্থগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকে শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে সকল ছেলে মেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার মা মাসী। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারিজন লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক এক জায়গায় লোকালয়—

সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজ্‌রা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোন কোনটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু চরিতেছে, গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্ম্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দুই চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশ বন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক গঙ্গার ধারের ইটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগে;—তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিকে পোড়ো জায়গা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুলা ইট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ান—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্ব্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ

মন্দির দেখা যাইতেছে ; সম্মুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তাল গাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান। আরো দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তকতক্ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিতেছে, আর এক দিকে তুলসীতলা। সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্ব্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত ছায়াপথের পরপারবর্ত্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মত পশ্চিম দিগন্তের ধার-টুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ আঘাতে ছলছল করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না, শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিভিতে

থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথ গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর খানিকটা আলো পড়ে—সেই টুকু আলোতে ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ও-পারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। এ-পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

আমাদের জাহাজ লৌহশৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতস্বিনী খর-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখন তরঙ্গসঙ্কুল, কখন শান্ত, কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক এক জায়গায় কূল কিনারা দেখা যায় না। আমাদের সম্মুখে পরপার মেঘের রেখার মত দেখা যাইতেছে। চারিদিকে জেলেডিঙি ও পালতোলা নৌকা। বড় বড় জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীসৃপ জলজন্তুর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে, রোদ্ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশ বন, খেজুর বন, আম বাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গীতে আস্ফালন পূর্ব্বক একটি বড় ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানব-সন্তান ডাঙার

দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন; যে চর্ম্মখানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বেশি পোষাক পরা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। তীরের কুটীরে আলো জ্বলিল। সমস্ত দিনের জাগ্রত আলস্য সমাপ্ত করিয়া রাত্রের নিদ্রায় শরীর মন সমর্পণ করিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনুষ্যত্ব

"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" উত্থান কর, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না—কিন্তু "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই বাক্য বারবার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা, প্রত্যেক দুঃখ, প্রত্যেক বিচ্ছেদ, কতশতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া যে ঝঙ্কার দিয়াছে, তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,"—উত্থান কর, জাগ্রত হও! আমাদের অশ্রুশিশিরধৌত নব জাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব্ব বিকাশকে নির্ম্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে! কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল—তুমি আজ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠ!' বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে, গন্ধে, শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্য্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনাদের সম্বন্ধস্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্য কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোন-অবস্থায় দ্বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজ-সার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে!

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না? সে তাহার সমস্ত দলগুলি সঙ্কুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কি আঁকড়িয়া রাখিতেছে? প্রভাতে তরুণ সূর্য্য আসিয়া অরুণকরে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে, বলিতেছে—'আমি যেমন করিয়া আমার চম্পক-কিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবাধিত করিয়া দাও!' রজনী নিঃশব্দপদে আসিয়া স্নিগ্ধহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ্ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি করিয়া একবার অন্তরের গভীর-তলের দ্বার নিঃশব্দে উদ্ঘাটন করিয়া দাও—আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার একমুহূর্ত্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন কর।' নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে—'আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, আপনার দিক্ হইতে একবার সকলের দিকে ফের।'—

কিন্তু বাধার অন্ত নাই—প্রভাতের ফুলের মত করিয়া এমন সহজে, এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারিদিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে, ব্যর্থ হইতে থাকে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে? পুষ্পের মত আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন

তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কত-কত পর্ব্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘ-যাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমুহূর্ত্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকালে তাহার অন্ত থাকে না,—তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না—মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ-সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর ন্যায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে, নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া, কোন কূল ভাঙ্গিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া, কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা দ্বারা আবর্ত্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে; অবশেষে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান্ একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত, তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না—বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

দুঃখ আছে—সংসারে দুঃখের শেষ নাই। সেই দুঃখের আঘাতে সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন গড়ন চলিতেছে—ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা। মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মত অসঙ্গত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহত্তেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্—

অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসীমা সঙ্কীর্ণ—মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা অনির্ব্বচনীয়—এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্বসম্বন্ধে জাগ্রত-সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি," অল্পে আমাদের আনন্দ নাই। যাহাতে আমাদের খর্ব্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমারা বীর্য্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের—তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না—যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে, সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্ব আমাদের পরম দুঃখের ধন, তাহা বীর্য্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না—যদি তাহা সুলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়-বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জ্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। ইহাতেই সে জানিতে পায়, দুঃখের ঊর্দ্ধে তাহার মস্তক, মৃত্যুর ঊর্দ্ধে তাহার প্রতিষ্ঠা।

এইজন্যই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এই জন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে "উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!" —'উঠ, জাগ! সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।'

অতএব প্রভাতে যখন বনে-উপবনে পুষ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা, তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ, আপন দুঃসহ দুঃখ, আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর, বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখীর গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রামক্ষেত্র। সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়-চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখ দুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মানুষ মহৎ, কারণ, মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, "দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইউরোপে সারাসেন্ সভ্যতা

সারাসেন্ শব্দের মৌলিক অর্থ পূর্ব্বাঞ্চলের লোক, কিন্তু এই শব্দে কেবল আরবদেশের অধিবাসীরাই পরিচিত ও আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপে আরবদেশীয় সভ্যতার প্রসার লাভের বিবরণ দিবার পূর্ব্বে, আরব-সভ্যতার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু পূর্ব্ব-পীঠিকা দিবার প্রয়োজন।

আরবদেশের স্থিতি, পশ্চিম এসিয়ার একটি মরুক্ষেত্রে। যে সকল জাতির লোকেরা প্রাচীনকালে ঐ দেশের পশ্চিমে, উত্তরে ও পূর্ব্বে সভ্য হইয়াছিল, তাহারা কেহই আরবদেশ জয় করে নাই অথবা ঐ দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করে নাই। পারস্য-দেশের পূর্ব্বভাগে টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর কূলে কূলে যে যুগে বাবিলনের ও আসিরিয়ার সভ্যতা বাড়িয়াছিল, সে যুগের ইতিহাসে আরবদেশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আরবদেশে আফ্রিকার উত্তরভাগের মিসরের সভ্যতা পৌঁছায় নাই,—বাবিলন ও আসিরিয়ার সভ্যতাও পৌঁছায় নাই, আরবের উত্তরভাগে মরুক্ষেত্রের পরপারে প্রাচীনকালে ফিনিসিয় বণিকেরা সভ্য ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল; তাহারা পৃথিবীর নানাদেশে বাণিজ্য করিত, কিন্তু আরবদেশের সঙ্গে তাহাদের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, জানা যায় না।

বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস্ অথবা উর্ব্বর ওয়াদিক্ষেত্রে আরবদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্ব্বর অবস্থায় বাস

করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কখনও আপনাদের স্বাধীনতা হারায় নাই। ফেরাও উপাধিতে পরিচিত মিসরের রাজারা আরবের উত্তরে সিরিয়ায় আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, আরবের উত্তর-পশ্চিমের মিটানি নামক রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আরবদেশে 'বেডুইন' নামক দস্যুদল ছাড়া সে দেশের অন্য কোন জাতির পরিচয় পান নাই।

পারসিকেরা যখন ক্ষমতার শিখরে উঠিতেছিলেন, তখন প্রথমেই ৫৩৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারসিক ভূপতি সাইরস্ বাবিলন জয় করিয়াছিলেন আর তাহার পর ৫২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারস্যের রাজা কেম্বাইসেস্ মিশরদেশ জয় করিয়াছিলেন। এই পরাক্রান্ত পারসিকেরা আরবের মরুপ্রাকার ভেদ করেন নাই অথবা করিতে পারেন নাই। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে যখন মাসিডনের সর্ব্বদিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডার সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় জয়ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন, তখনও আরবদেশের বেডুইন দস্যুরা অসঙ্কোচে তাঁহার অনেক সম্পত্তি লুটিয়াছিল। আরবের বিরুদ্ধে অভিযান করিবেন বলিয়া আলেক্জাণ্ডার যখন মনঃস্থ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পরে যখন রোমানেরা ক্ষমতাশালী হইয়া মিশর, পেলেষ্টিন, সীরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের পারসিকদের সঙ্গে বিবাধ বাধিয়াছিল; আরবের বিরুদ্ধে কেহ কিছু করেন নাই। দুইটি জাতির এই প্রতিযোগিতার সময়ে অশিক্ষিত ও সাহসী আরববাসীরা মক্কা, মদিনা, তাইফ প্রভৃতি নগরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্য রক্ষা করিতেছিল।

মৌলিক জাতির হিসাবে আরবের লোকেরা য়ীহুদী জাতি হইতে অভিন্ন; উভয় জাতিরই ধর্ম্মবিষয়ক প্রাচীন মত ও ঐতিহ্য

এক। বাইবেলের যে পূর্ব্বভাগ প্রাচীনবিধি বা ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট নামে পরিচিত, উহা উভয় জাতির মধ্যেই মান্য ; তবে নিরক্ষর আরববাসীরা গ্রন্থের অভাবে প্রাচীন ধর্ম্ম-কাহিনী শ্রুতিরূপে রক্ষা করিতেছিল বলিয়া, অনেক স্থলে য়ীহুদীদের মতের সঙ্গে প্রভেদ ঘটিয়াছিল। যীশুর প্রচারিত ধর্ম্ম যখন প্রাচীন বাইবেলের বিধির উপর নববিধান হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহা আরবে উপেক্ষিত হইয়াছিল।

আফ্রিকায় আবিসিনিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম গৃহীত হইবার পর, সেখানকার রাজারা আরবের দক্ষিণভাগে অস্থায়ী অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, আর আরবে খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়া মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে এই জৈত্র-যাত্রা যে বৎসর নিষ্ফল হইয়া গেল এবং আবিসিনিয়ার সৈন্যেরা মহামারীর প্রাদুর্ভাবে ধ্বংস হইল, সেই বৎসরে আরবের সৌভাগ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এই সময়টি ২০শে আগষ্ট ৫৭০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আরবদেশের লোকেরা নিরক্ষর ছিল, দস্যুবৃত্তি করিত, দেশের ভিন্ন ভিন্ন নগরে প্রতিদ্বন্দ্বী দলপতিরা আধিপত্য করিতেন, আর দেশের লোকের কাছে বাইবেলের প্রাচীনবিধি ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে মান্য ছিল,—এই কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবকালে দেশের সাধারণ লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল, তাহাও বুঝিয়া লইতে হইবে।

দেশের প্রাকৃতিক গুণেই হউক, আর যাহাতেই হউক, এই মরুপরিব্যাপ্ত দেশের অধিবাসীরা আকাশের অসংখ্য তারকা ও

চন্দ্রকে পূজ্য মনে করিত *। তাহা ছাড়া অনেক অশরীরী ও অগ্নিদেহধারী "জিন্" বা ভূতের প্রভাবও এই দেশে প্রচলিত ছিল।

প্রস্তর-মূর্ত্তিতে অনেক উপদেবতা পূজিত হইতেন, ও মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কাবা নামক মন্দিরে নর-সৃষ্টির প্রারম্ভকালের একখানি স্বর্গচ্যুত প্রস্তর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব-নিদর্শন বলিয়া পূজিত হইত। শেষোক্ত প্রস্তরখানি নাকি আদিযুগে শুভ্র ছিল আর এখন মানুষের পাপে উহার বর্ণ-মালিন্য ঘটিয়াছে।

মহাপুরুষ মহম্মদের মনোহর পুণ্যময় ও কীর্ত্তিবহুল জীবনচরিত একটি স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধে লিখিলেও প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির পূর্ণ উল্লেখ হয় না; অতি সংক্ষেপে তাঁহার কীর্ত্তির ফলটুকুর কথাই বলিব। ৪০ বৎসর বয়সে ৬১০ খৃষ্টাব্দে তিনি নবধর্ম্মের স্রষ্টা ও প্রচারক হইয়াছিলেন, এবং ৬২২ খৃষ্টাব্দে আরবের নবভাগ্য-প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন, খুব সম্ভব ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে মহাপুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। যে কৌশলে, প্রভাবে ও মাহাত্ম্যে তিনি ২২ বৎসর মধ্যে সমগ্র আরবের বহুদেববাদ দূর করিয়া নূতন একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, আর দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিনায়কত্ব বিনাশ করিয়া আরবে একচ্ছত্র

* *N.B.*—Hilprecht প্রভৃতি দক্ষ পণ্ডিতেরা বলেন যে, বাইবেলে উল্লেখ না থাকিলেও প্রাচীন য়ীহদীরা Lord of the host অর্থে তারকাপুঞ্জের অধিনায়ক চন্দ্রকে পূজা করিতেন; এবং সেই জন্যই সিনাই পর্ব্বতকে Moses দেবতাত্মা মনে করিয়াছিলেন। বলিয়া রাখি যে বাবিলনের ভাষায় Sin অর্থে ছিল চন্দ্র ও তাহার নামেই পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবেই এখনও মুসলমানের ধ্বজা চন্দ্রকলায় চিহ্নিত এবং নবচন্দ্রের উদয়ের সহিত অনেক পর্ব্বোৎসব সম্পর্কিত।

রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, পাঠকদিগকে তাহা স্বতন্ত্র গ্রন্থে পড়িতে অনুরোধ করি। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি দেশের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী লোকেরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যে দৃঢ়বদ্ধ একতা লাভ করিয়াছিলেন এবং পরাক্রমে প্রতিবেশী সকল জাতিকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা মানব-ইতিহাসে অতি অপূর্ব্ব।

যিনি সৈন্যচালনায় ও দেশজয়ে হজরৎ মহম্মদের প্রধান সহায় ছিলেন, সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "ওমর" আরবের দ্বিতীয় খালিফ হইয়াছিলেন। খালিফ অর্থ রাজ্যাধিপতি ও ধর্ম্মগুরু। এ প্রসঙ্গে তেমন প্রয়োজন না থাকিলেও বলিয়া রাখি যে, ভক্ত আবুবেকর দঃ হজরৎ মহম্মদের প্রথম উত্তরাধিকারী খালিফ ছিলেন ও দ্বিতীয় খালিফ বীর ওমারের পর ওসমান আর ওসমানের পর মহম্মদের জামাতা সুপণ্ডিত ও উদারচেতা আলি লোকসাধারণের মনোনয়নে খালিফরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রভূতক্ষমতাশালী ওমর ৬৪০ খৃঃ অব্দের মধ্যে সাত বৎসরের সমর-চালনায় পারস্ত, মেসোপোটেমিয়া, সীরিয়া, পেলেষ্টিন ও মিশরদেশ জয় করিয়া ঐ সকল দেশেই নূতন একেশ্বরবাদ বা মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

আবুবেকর হইতে আলি পর্য্যন্ত চারিজন বিশেষ মান্য খালিফের শাসনের অবসানে যে নূতন খালিফবংশের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম ওমিয়দ্ খালিফবংশ। এই ওমিয়দ্ খালিফবংশের দ্বিতীয় খালিফ ওয়ালিদ্ ৭০৫ খৃঃ অব্দে দামাস্কাস্ নগরের নূতন খালিফপাটে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ২য় খালিফ ওমারের মত, ওয়ালিদের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয়। ইনি একদিকে ভারতের পশ্চিম সীমান্তস্থিত সিন্ধু-রাজ্য জয় করিয়া পশ্চিম এসিয়ার সমগ্র পূর্ব্ববিভাগ আত্মশাসনভুক্ত

করেন আর মুশা নামক একজন বীর সেনাপতিকে মিশরের শাসনকর্ত্তা করিয়া তাঁহার নেতৃত্বে আট্লাণ্টিক কূল পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর আফ্রিকার রাজ্যগুলি জয় করেন। মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতের সিন্ধুজয় ৭০৮ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। ইহার পর মিশরের শাসনকর্ত্তা মুশার অধীনস্থ সেনাপতি তারিফ্, খালিফ ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে ৭১১ খৃঃ অব্দে ইউরোপের স্পেন দেশের অধিকাংশ ভূভাগ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত করেন। আরব সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই ছ চারিটি কথাই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। খালিফ ওয়ালিদের সময়ে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ আরব বা সারাসেন্দের অধিকারে আসিয়াছিল, কবির ভাষায় তাহার প্রসার বুঝাইয়া বলি—

পশ্চিমে হিস্পানি শেষ,
পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ।

তারিফ্ কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে স্পেন রাজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলিতেছি। রোমের সমৃদ্ধি ও গৌরবের দিনে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত স্পেনরাজ্য, রোম-সাম্রাজভুক্ত ছিল। বহু সমৃদ্ধিলাভ করিবার পর রোমানেরা যখন বিলাসপরায়ণ হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইতেছিলেন, স্পেনের অধিবাসীরাও তখন আপনাদের চরিত্রের বল হরাইয়াছিলেন। এই সময়ে স্পেনদেশের কৃষকসাধারণ, দাসের মত ব্যবহৃত হইত; এই কৃষক প্রজারা ধনী প্রভুদিগকে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া দারিদ্র্যের পীড়নে নিপীড়িত হইত। মধ্যবিত্ত 'বার্গর' শ্রেণীর লোকেরা দেশের সর্ব্ববিধ ব্যয় যোগাইবার জন্য দায়ী ছিল,—আর সেই হিসাবে অনেক সময়েই তাহারা বড় উৎপীড়িত হইত। সকলকে পদদলিত করিয়া ও দরিদ্রের

রক্ত শুষিয়া দেশের ধনী প্রভুরা বিলাস-লীলার অভিনয় করিতেন। চরিত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল,—কোথাও পুরুষোচিত শৌর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইত না, আর নীচ স্বার্থপরতার প্রভাবে রাষ্ট্রনীতির গ্রন্থি অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দীতে রোমরাজ্য যখন বলশালী বর্ব্বর গথজাতির পদানত হইয়াছিল, স্পেন দেশও তখন সেই গথজাতির একটি শাখার শাসনাধীনে আসিয়াছিল। এই পশ্চিমদেশীয় গথদের নাম ছিল ভিসিগথ (Visi Goth)। ভিসিগথেরা ধর্ম্মে খৃষ্টিয়ান ছিল বটে, কিন্তু আচরণে নৃশংস বর্ব্বর ছিল। ইহাদের রাজত্বকালে সমগ্র স্পেন দেশ কঠোর দাসত্বে অবনত হইয়াছিল।

গথজাতীয়েরা যখন স্পেনের অধিপতি ছিলেন, তখন আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমকূলস্থিত সিউটা গথদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেন জাতীয় জুলীয়ান নামে একব্যক্তি সিউটার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জুলিয়ান, তাঁহার অনূঢ়া দুহিতা ফ্লরিন্দাকে সুশিক্ষা দিবার জন্য স্পেনপতি রডারিকের প্রাসাদে পাঠাইয়াছিলেন। রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত ভিসিগথজাতীয়েরা যে, সে সময়ে চরিত্রহীনতায় পশুতুল্য হইয়াছিল, এ কথা হয়-ত জুলিয়ান সুস্পষ্ট জানিতেন না। রাজা রডারিক ধর্ম্মবুদ্ধিশূন্য ও চরিত্রনিষ্ঠাবিহীন ছিলেন, তাই দারুণ অধর্ম্মের ও বিশ্বাসঘাতকতার কর্ম্ম করিয়াছিলেন। বিশ্রব্ধা শুদ্ধমতি ফ্লরিন্দা যখন কলঙ্কস্পৃষ্টা হইয়া গোপনে জুলিয়ানকে নিজের দুঃখের কাহিনী লিখিয়াছিলেন, তখন জুলিয়ান ক্রোধে আত্মহারা হইয়া প্রতিবেশী মুসলমানদিগকে রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই আহ্বানেই তারিক মুরজাতীয় মসলেম সৈন্য লইয়া স্পেন জয় করিয়াছিলেন।

উত্তর আফ্রিকার 'বের্বের' নামক জাতির সহিত আরবজাতীয় লোকের রক্তসংমিশ্রণে যাহাদের উৎপত্তি, তাহারাই 'মুর' নামে পরিচিত। স্পেনবিজেতা তারিফ্ এই বের্বের বা মুরবংশসম্ভূত ছিলেন। আফ্রিকার জাতির নাম করিলেই কৃষ্ণকায় কদাকার নিগ্রোজাতির কথা মনে পড়ে; তাই, বলিয়া রাখিতেছি যে, অমিশ্র বের্বের জাতি কিংবা মিশ্র মুরেরা দেখিতে বেশ সুন্দর। গাছের ভাল কলম করিবার এই একটি পদ্ধতি আছে যে, খুব উৎকৃষ্ট ফলের গাছের "চোখ কলম" কাটিয়া একটি খুব জীবন্ত ও বলিষ্ঠ জংলী গাছের গায়ে বসাইতে হয় আর তাহা হইলেই অতি উৎকৃষ্ট কলমের গাছ পাওয়া যায়। জীবন্ত ও ক্ষমতাদৃপ্ত বের্বেরগণ সভ্য আরবদের রক্ত পাইয়া শারীরিক ও মানসিক প্রভাবে উন্নত হইয়াছিল। আরবেরা প্রায় শত বর্ষের সাধনায় সর্ব্ববিধ সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছিল, সমগ্র এসিয়ায় ও মিশরে মসলেম-প্রভুতা বিস্তৃত হইবার ফলে মিশর, গ্রীস ও পারস্যের উন্নত জ্ঞান এবং শিল্প-বিদ্যা সারাসেন্‌দের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। পারসীক ও গ্রীক্‌দের স্থাপত্য ও ভাস্কর-বিদ্যা এক সঙ্গে মিলাইয়া যে নূতন সারাসেন্ শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল, এ যুগেও এ জগতে তাহা অতুল্য। আমাদের আগ্রার তাজমহল এই সারাসেন্ শিল্পের মনোহর দৃষ্টান্ত। খালিফ ওয়ালিদের সময় (৭০৫ খৃষ্টাব্দে) সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নৌচালনা, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি এত উন্নত হইয়াছিল যে, ইউরোপীয় দক্ষ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, যদি ঐ সময়ে সারাসেনেরা কনস্তান্তিনোপল্ অধিকার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপে খৃষ্ট ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে মসলেম্ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত। জ্ঞানের হিসাবে

ইউরোপখণ্ড যে তখন অর্দ্ধ-বর্ব্বর ছিল, এ কথা কেহ অস্বীকার করেন না।

সারাসেন্ সভ্যতায় উন্নীত মুরেরা স্পেনরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল; ইহার ফলে স্পেন দেশের উচ্ছৃঙ্খলতা চলিয়া গেল, ও সুতন্ত্রিত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইল। রোমানদের রাজ্যে ও আদিযুগের খৃষ্টানদের রাজ্যে কৃষকেরা ও অন্যান্য শ্রমজীবীরা ভূমির অধিকারীদের দাসমাত্র ছিল; কোন সম্পত্তিতে এই দাসদের অধিকার ছিল না। এইজন্যই সমাজের যথার্থ স্তম্ভস্বরূপ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এক রাজার পর অন্য রাজার অধিকারভুক্ত হইলেও কিছুমাত্র ব্যস্ত বা দুঃখিত হইত না। মুসলমান অধিকারে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের দাসত্ব ঘুচিয়া গিয়াছিল। হজরৎ মহম্মদের অনুশাসনই এই যে, যে ব্যক্তি দাসের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবে অথবা তাহার উন্নতিতে বাধা দিবে সে কখনও স্বর্গে যাইতে পারিবে না।* মুসলমানরাজ্যে একদিন যে দাস, সে অন্যদিন সম্রাট্ পর্য্যন্ত হইতে পারে; ভারতের ইতিহাসেও ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্পেনের কৃষকেরা মস্লেমদের নব বিধানে আপনার আপনার ভূমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছিল আর ইচ্ছা করিলেই তাহারা আপনাদের ভূমি সকল রকমে হস্তান্তর করিতে পারিত। এ ব্যবস্থাও হইয়াছিল যে মুসলমান হইলেই দাসের দাসত্বের শেষ চিহ্নটুকুও নষ্ট হইয়া যাইবে। কাজেই দেশের নিম্নশ্রেণীর সকল উৎপীড়িতেরা রাজভক্ত

* মহম্মদের অনুশাসনটি উল্লেখ করিয়া মুরজাতির ইতিহাসলেখক S. Lane-Poole লিখিয়াছেন :—Slavery is a very mild and humane institution in the hands of a good Mahomedan.......A man who ill-treats his slave will not enter into Paradise.

হইল ও অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক মস্‌লেম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বার্গর বা মধ্যশ্রেণীর লোকেরাও প্রভুদের খামখেয়ালির উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়া নির্ভয়ে আপনাদের গৃহে ধন ও সুখসঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। ভূমিবিধি, দণ্ডবিধি, শাসনবিধি প্রভৃতি খৃষ্টিয়ান্-মস্‌লেম অভেদে প্রযুক্ত হইত, ও কাহাকেও স্বাধীন ধর্ম্মমত পোষণের জন্য বা প্রচারের জন্য তিলমাত্র বিড়ম্বিত হইতে হইত না। রাজ্য-শাসন ও প্রজারক্ষার এই উচ্চনীতি ইউরোপখণ্ডে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্পেনরাজ্যের মস্‌লেম শাসনকর্ত্তা আবদর রহমান অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ফরাসী রাজ্য অধিকার করিবার উদ্যোগ করিয়া-ছিলেন।

ফরাসী দেশের সে সময়ের কথঞ্চিত সভ্য অধিবাসীরা স্পেনের খৃষ্টিয়ানদের মত বর্ব্বর-যুগের বলিষ্ঠতা হারাইয়া, নির্বীর্য্য হয় নাই; ফ্রাঙ্ক সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক চার্লস্ মার্টেল (অর্থাৎ গদাঘাতদক্ষ চার্লস) বিশেষ শৌর্য্যে ও পরাক্রমে ফরাসীদেশ হইতে চিরদিনের মত মুসলমান আক্রমণ দূরীভূত করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শারলেমেন একবার স্পেনজয়ের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। এই সময় হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত স্পেনরাজ্যে অক্ষুণ্ণ মোস্‌লেম শাসন চলিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মোস্‌লেম অধিপতিরা কি ভাবে ও কত দিন রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, আর মোস্‌লেম রাজ্যের আত্ম-বিদ্রোহে কিরূপভাবে স্পেনরাজ্যে ও অন্যত্র শাসন-বিপ্লব ঘটিয়াছিল, সে বিবরণ এ প্রবন্ধে প্রদত্ত হইতে পারে না। মুসলমান রাজত্বের যুগে

স্পেন দেশে কিরূপ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে ইউরোপের সভ্যতাকে উজ্জীবিত করিয়াছিল, স্থূলভাবে সেই কথাই কিছু কিছু বলিব।

স্পেনের শাসনে খালিফের যখন অধীনতা রহিল না, আর সেখানে স্বতন্ত্র স্বাধীন সুলতানের রাজত্ব আরব্ধ হইয়াছিল, তখন হইতেই বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইতেছিল। প্রথম সুলতান আব্দর রহমানের সময় হইতে সুলতান হাকামের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত সময়, ন্যায়শাসন এবং জ্ঞানচর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। দলে দলে সুপণ্ডিত ও কলাবিদ্যায় পারদর্শিগণ পারস্য ও আরব প্রভৃতি স্থান হইতে এই নব মুসলমান রাজ্যে আসিয়া প্রতিভার পুরস্কার লাভ করিতেছিলেন। ৮২২ খৃষ্টাব্দে হাকামের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আব্দর রহমানের সময়ে অনেক পণ্ডিত ও শিল্পী-কুশলী, সুলতানের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিবিধ বিভাগের জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মশাস্ত্রচর্চ্চা ত চলিতেছিলই, তাহা ছাড়া নৃত্য-গীত প্রভৃতির চর্চ্চা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে দেশের সর্ব্বত্রই সঙ্গীতাদি আদৃত হইতেছিল। প্রাচীন সময়ের অর্দ্ধ-বর্ব্বরদের সৌন্দর্য্যানুভূতি একটু অতিমাত্রায় বাড়িয়াছিল মনে হয়। সুলতানের একজন লঘুচেতা সভাসদ, পরিচ্ছদ পরিবার, কেশবিন্যাস করিবার ও কথা কহিবার রীতি সম্বন্ধে যে পদ্ধতিটি আদর্শ বলিয়া প্রচার করিতেন, তাহাই দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকে অনুকরণ করিত। স্পেন দেশে পূর্ব্বে কেবল ধাতুপাত্রই ব্যবহৃত হইত; সারাসেনেরা কাচের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিল। কাচের ভোজন ও পান-পাত্র, দীপদান ও আয়না প্রভৃতি ইউরোপখণ্ডের মধ্যে স্পেনদেশেই সারাসেনেরা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল। বিবিধ সুস্বাদু

ব্যঞ্জন রাঁধিবার রীতিও সারাসেন্-পাচকেরা ইউরোপীয়দিগকে শিখাইয়াছিল।

মুসলমানশাসনের সে সময়ে সকলেই সুখে শান্তিতে বাস করিতেছিল; কিন্তু এক শ্রেণীর খৃষ্টিয়ান্ সম্প্রদায়ের কাছে এই শান্তি অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মচর্চ্চায়, মুসলমানেরা বাধা দিত না বলিয়া কোন খৃষ্টিয়ান, ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়া বাহাদুরি লাভ করিতে পারে নাই। জোর করিয়া "মার্টার" সাজিবার জন্ম অর্থাৎ কোন প্রকারে একটা ছুতা খুঁজিয়া ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্ম প্রাণত্যাগ করিবার গৌরব লাভ করিবার প্রত্যাশায় কয়েক জন পুরুষ ও রমণী উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিনা কারণে ও অযাচিত ভাবে সুলতানের মন্ত্রী কিংবা কাজির সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কয়েক জন পুরুষ ও রমণী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, মুসলমানধর্ম্ম মিথ্যা, মহম্মদ চোর ও কোরাণের ব্যবস্থা নারকীয়। মন্ত্রী ও কাজিরা এই উন্মাদদিগকে অনেক বুঝাইয়া ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সাধু ব্যবহারে আরও উত্তেজিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন যাহাতে প্রাণদণ্ডের নিশ্চিত ব্যবস্থা ছিল। কেহ কেহ বা কারাগারে রুদ্ধ হইবার পর উদ্‌ভ্রান্তভাব পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকজন একেবারে না মরিয়া ছাড়েন নাই। সে যুগের খৃষ্টিয়ানদের পক্ষে পরবাদসহনীয়তা অসহ্য ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকাবহ কথা বলিতেছি। মুসলমানেরা প্রতিদিন সযত্নে মুখ ধুইত ও দাঁত পরিষ্কার করিত, হাত পা না ধুইয়া মসজিদে নেমাজ পড়িত না ও আহারের পর সর্ব্বদাই মুখ

ধুইত। যাহা কিছু মুসলমানেরা করিত তাহারই উল্টা অনুষ্ঠান করিতে হইবে বলিয়া এই সকল পরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধেও কয়েকজন পুরুষ পাত্রী ও চিরকুমারী উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। মনের পরিচ্ছন্নতাই যে আসল পরিচ্ছন্নতা, এ কথা কেহ অস্বীকার না করিলেও ঐ ভাল কথাটির ধুয়া ধরিয়া অনেক খৃষ্টিয়ান, জল-সংযোগের পরিচ্ছন্নতা জিদ্ করিয়া পরিহার করিয়াছিলেন। একজন ধর্ম্মপ্রাণা বৃদ্ধা খৃষ্টিয়ান নারী স্পর্দ্ধার সহিত মুসলমান মৌলবীদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি ৬০ বৎসর ধরিয়া দাঁত পরিষ্কার করেন নাই কিংবা গায়ে জল দেন নাই। স্পেন-দেশে খৃষ্টিয়ান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইবার পর, ইংলণ্ডের রাণী মেরীর স্বামী ফিলিপ, কর্ডোভা নগরের বহুসংখ্যক স্নানাগার মুসলমান-কুসংস্কারের চিহ্ন মনে করিয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া-ছিলেন। খৃষ্টিয়ানদের এই বিদ্বেষ পঞ্চদশ শতাব্দীতে কি আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা মসলেম রাজত্বের অবসানের বিবরণে স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞাতব্য।

সারাসেন্-প্রভাবে স্পেনদেশে সর্ব্ববিধজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল এবং জ্ঞানপিপাসায় যে কর্ডোভা নগরে ইউরোপখণ্ডের অনেক লোক শিক্ষার্থী হইয়া আসিতেন, ইউরোপের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। চিকিৎসা-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ, রসায়ন এবং প্রাকৃত-বিজ্ঞান প্রভৃতি যখন এদেশে বিশেষ উন্নত হইয়াছিল তখন ইউরোপের অন্যত্র অজ্ঞতার অন্ধকার ছিল। সে সময়ে কিরূপ মনোহর হর্ম্ম্য রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝাইয়া বলা অসম্ভব হইলেও একটুখানি বিবরণ দিবার চেষ্টা করিতেছি। এ যুগের উন্নত এবং সুশিক্ষিত ইংরেজ ঐতিহাসিক "লেনপুলের"

একটু মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম।* উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—দশম শতাব্দীতে যখন ইউরোপের অধিবাসীরা জ্ঞানে ও ব্যবহারে বর্ব্বর ছিল, আর লোকেরা কাঠের ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে মলিন-ভাবে বাস করিত, সেই সময়ে স্পেন দেশে মস্‌লেম সভ্যতার অতি আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হর্ম্ম্যাদির গৌরবের আভাস দিবার পূর্ব্বে আর একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। সুলতানেরা যে সকল রমণীয় উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি একাধারে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতির ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাক্ষী। পৃথিবীর যে স্থানে যে রমণীয় বৃক্ষলতা বা সুস্বাদু ফলের গাছ পাওয়া যাইত তাহা স্পেনদেশে আনিয়া সুকৌশলে বাড়ান হইয়াছিল।

প্রথম সুলতান আব্দর রহমনের সময়ে যে রমণীয় মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখনও কর্ডোভানগরে তাহা লুপ্ত হয় নাই। কর্ডোভানগরে ধনী ব্যক্তিদের ৫০,০০০ সুনির্ম্মিত হর্ম্ম্য ছিল, সাধারণ লোকের লক্ষাধিক আবাসগৃহ ছিল, ৭০০ মস্‌জিদ বা উপাসনালয় ছিল, আর সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ৯০০ স্নানা-গার ছিল। কর্ডোভানগরের নিকটে নদীর উপর যে মনোহর

* *N. B.*—When we remember that the sketch we are about to extract..................concerning the glories of Cordova, relate to the tenth century, when our Saxon ancestors dwelt in wooden hovels and trod upon dirty straw, when our language was unformed, and such accomplishments as reading and writing were almost confined to a few monks, we can to some extent realize the extraordinary civilization of the Moors. And when it is further recollected that all Europe was then plunged in barbaric ignorance and savage manners.....................the wonderful contrast afforded by the capital of Andalusia (স্পেন) will be better appreciated.

ও দৃঢ়নির্ম্মিত সেতু রচিত হইয়াছিল আজিও তাহা সুরক্ষিত রহিয়াছে। ৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান আবুদর রহমনের সময়ে যে মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহা এখনও ইউরোপে শ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া স্বীকৃত। এই মস্‌জিদটি বহুপ্রসারিত খিলানে নির্ম্মিত, আর উহার ১২৯৩টি স্তম্ভ এখনও সৌন্দর্য্যে মনোহর হইয়া রহিয়াছে; উহার কারুকার্য্যের বর্ণনা করা অসম্ভব; যে সকল বহুমূল্য ধাতু ও প্রস্তরে ঐ মস্‌জিদ ভূষিত হইয়াছিল, অংশতঃ তাহা ইতিহাসেই পড়িতে হয়। রাত্রিকালে উপাসনার সময়ে অনেক ঝাড় লণ্ঠন ত জ্বলিতই, তাহা ছাড়া মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে যে মোমের বাতিটি দিবারাত্রি জ্বালাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইত, সেটির ওজন পঁচিশ সের হইত। মস্‌জিদের মেঝে ও দেওয়ালে যে সকল সুমার্জ্জিত মার্ব্বল প্রভৃতি পাথর বসান হইয়াছিল, এখনও তাহার উজ্জ্বলতা দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হয়।

কর্ডোভার উপকণ্ঠে একটি উপনগর বসাইয়া তৃতীয় আবদর রহমন তাঁহার পত্নী এজ্-জেহারার (তিলোত্তমা) নামাঙ্কিত করিয়া যে প্রাসাদ গড়িয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াই একালের লোক স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়। যাহা সৌন্দর্য্যে অতুল ছিল, তাহাও ধ্বংস করিতে যাহাদের প্রাণে বাধে নাই, সেই রূঢ় ব্যক্তিদের বংশধরেরা এখন এজ্-জেহারার একটি অংশ কারাগাররূপে ব্যবহার করিতেছেন। সুলতানের এই প্রাসাদটি যে ৪,০০০ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেগুলি বহুদেশ হইতে আনীত দুর্লভ প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তম্ভের সংখ্যাতেই প্রসার সূচিত হয় বটে, তবুও ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই প্রাসাদের প্রবেশদ্বার সংখ্যায় ১৫,০০০ ছিল। প্রাসাদের মধ্যভাগের হল বা দালানটির কেন্দ্রস্থলে একটি নাতিবৃহৎ সরোবর প্রস্তুত করিয়া সেই সরোবরটি পারদে পরিপূর্ণ রাখা হইত।

উজ্জ্বল ধাতু ও মণি-মুক্তা-খচিত গৃহে যখন আলোক পড়িত, তখন সে আলোক পারদ ও মণি-মুক্তায় প্রতিফলিত হইয়া যে দীপ্তি-বিকাশ করিত, বহুদূর হইতেও তাহার প্রভা অতি পরিস্ফুটভাবে লক্ষিত হইত। প্রাসাদের চারিদিকের উদ্যান এবং কৃত্রিম নির্ঝরগুলির শোভার বর্ণনায় এক একজন ঐতিহাসিক এক এক অধ্যায়ই লিখিয়াছেন।

সারাসেন্ সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ মুরদের জ্ঞান-চর্চ্চার কথাও বিশেষ আলোচ্য। সুলতান হাকামের পাঠাগারের একটু উল্লেখ করিতেছি। যে যুগে পুস্তক ছাপিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সেই যুগে সুলতানের পাঠাগার চারিলক্ষ গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল। দেশ বিদেশ হইতে বিভিন্ন বিদ্যার গ্রন্থ বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া অথবা বহু ব্যয়ে নকল করাইয়া আনা হইত; আর কোন কবি নূতন কাব্য রচনা করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন শুনিলেই, সুলতান সেই কবিকে বহু অর্থ দান করিয়া বিদেশ হইতে আনাইয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থের প্রথম সংখ্যাখানি পাঠাগারে রাখিতেন। পাঠাগারের অধিকাংশ গ্রন্থই সুলতান নিজে পড়িতেন ও গ্রন্থের পার্শ্বে পাণ্ডিত্য-জ্ঞাপক টীকা লিখিতেন। গ্রন্থগুলি তাঁহার টীকায় অমূল্য হইয়াছিল একথা অনেক আরবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মসলেম্-প্রভাবে উৎপন্ন বলিয়া খৃষ্টিয়ান উত্তরাধিকারিগণ ঐ সকল গ্রন্থ অপাঠ্য ও পরিত্যাজ্য বোধে অপসারিত করিয়াছেন। সারাসেন্ সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি স্পেনদেশে বিলুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, কিন্তু মুরদের প্রভাবে যে জ্ঞান ও কৌশল উদ্ভাসিত হইয়াছিল, একালের ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম স্তর, সেই জ্ঞান ও কৌশলের মহিমায় রচিত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

লর্ড কেল্‌ভিন্‌

মানুষ কখনই চিরজীবী হয় না। সুতরাং অশীতিপর বৃদ্ধ লর্ড কেল্‌ভিন্‌ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ও অপরিমেয় শক্তিকে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে নিঃশেষে ব্যয় করিয়া, জীবনের সন্ধ্যায় যখন বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন মৃত্যু যদি তাঁহাকে তাঁহার শান্তিময় উদার ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া থাকে, তবে তাঁহাতে বিস্ময় বা ক্ষোভের কারণ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, ডারুইন, ম্যাক্সওয়েল, হক্সলি, টিন্‌ডাল্‌ প্রভৃতির মৃত্যুর পরও অতীত ও বর্ত্তমানের চিন্তা ও ভাবের মধ্যে যে নিগূঢ় বন্ধন রক্ষা হইয়া আসিতেছিল, লর্ড কেল্‌ভিনের মৃত্যুতে বুঝি বা তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। নানা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিজ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যেমন এক মহাদোষ, বাহিরের নানা অবান্তর ব্যাপার ও আবর্জ্জনাকে তাহার ভিতরে স্থান দেওয়াও ততোধিক মহাদোষ। লর্ড কেল্‌ভিনের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান এপর্য্যন্ত নিষ্কলুষ ছিল। এই মহারথীর অভাবে সার অলিভার লজ্‌ প্রমুখ নব্য নেতাদিগের দ্বারা ইংলণ্ডের পরীক্ষাগারে মার্কিনভূতের আবির্ভাব অসম্ভব হইবে না। এই ভৌতিক নৃত্যে নিউটন্‌ হার্সেলের কর্ম্মক্ষেত্রে ইংলণ্ডের পূর্ব্বপবিত্রতা ও মহিমা কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা এখন নিশ্চয়ই চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

রাজার মৃত্যুতে রাজসিংহাসন শূন্য থাকে না, এবং বৃহৎ সমাজে অধিনায়কের অভাব হইলে, অধিনায়ক আপনা হইতে

আসিয়া শূন্যস্থান অধিকার করে। কিন্তু লর্ড কেল্‌ভিনের মত রাজা ও অধিনায়ক কোথায়? যে সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও কার্য্যকুশলতার অপূর্ব্ব সম্মিলন লর্ড কেল্‌ভিন্‌কে বৈজ্ঞানিক সমাজের নেতৃত্ব দিয়াছিল, ইংলণ্ডে কোন পণ্ডিতেই ত তাহা দেখা যাইতেছে না। আধুনিক বিজ্ঞানকে যাহারা নিজের হাতে গড়িয়া মহিমময় করিয়াছেন, অতি অল্পদিনের মধ্যে আমরা তাঁহাদের তিন চারিটিকে হারাইয়াছি। রসায়নবিৎ মেণ্ডেলিফ্‌ এবং ফরাসী পণ্ডিত কোরি ও বাঁৎলোর মৃত্যুতে য়ুরোপের বিভিন্ন দিক্‌ হইতে সত্যই এক একটি দিক্‌পালের পতন হইয়াছে। লর্ড কেল্‌ভিনের মৃত্যুতে য়ুরোপের আর এক দিক্‌ হইতে যে, আর একটি দিক্‌পালের পতন হইল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

লর্ড কেল্‌ভিন্‌ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতাও একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। গ্লাস্‌গো বিদ্যালয়ে বহুকাল গণিতের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া ইনিও সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই প্রকার পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পুত্র যে সুশিক্ষিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেল্‌ভিন্‌ দশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একুশ বৎসরে কেম্‌ব্রিজের শেষ পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বহু সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে জড়তত্ত্বের গবেষণার উপযোগী ভাল পরীক্ষাগার ইংলণ্ডে মোটেই ছিল না। কেম্‌ব্রিজের অবস্থা তখনো খুব শোচনীয়। নিউটনের সময়ে পরীক্ষাগারের অবস্থা যে প্রকার ছিল, তাহার তখনকার অবস্থা প্রায় তদ্রূপই রহিয়া গিয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিতদিগের সুযশ এই সময়ে জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুবক

কেল্‌ভিন্ তাঁহার সেই অদম্য জ্ঞানলিপ্সায় চালিত হইয়া বিজ্ঞানের সেই কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক রেনো (Regnault) তখন পূর্ণ উদ্যমে জলীয় বাষ্পের তাপরক্ষার ব্যাপার লইয়া গবেষণায় নিরত। লর্ড কেল্‌ভিন্ ইঁহারই অধীনে কিছুদিন পরীক্ষাগারের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে তাঁর আর অধিক দিন থাকা হইল না। এক বৎসরের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়বিজ্ঞানের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সুদীর্ঘ ৫৩ বৎসর কাল লর্ড কেল্‌ভিন্ ঐ অধ্যাপকের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন, এবং যে সকল মহাবিষ্কার ইঁহাকে অমরত্ব দিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তিনি গ্লাস্‌গোর অধ্যাপকের আসন হইতে জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া এক কেল্‌ভিনেরই জন্য গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক জগতের এক মহাতীর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

লর্ড কেল্‌ভিন্ অধ্যাপকজীবনের প্রারম্ভেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও সূক্ষ্মদর্শনের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময়ে ভূতত্ত্ব-বিদ্‌গণ ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের উৎপত্তিকাল নিরূপণ করিয়া পৃথিবীর বয়ঃকাল নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহারা হিসাব করিয়া দেখাইতেছিলেন, পৃথিবী সহস্র কোটী বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লর্ড কেল্‌ভিন্ এই গণনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাপক্ষয় দ্বারা এখনকার শীতল অবস্থায় আসিতে পৃথিবী কত বৎসর অতিবাহন করিয়াছে, তাহা স্থির করিবার জন্য গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গণনায় পৃথিবীর বয়স দশকোটী বৎসরের অধিক হইল না। এই ব্যাপার

অবলম্বন করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সহিত লর্ড কেল্‌ভিনের অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, এবং শেষে কেল্‌ভিন্‌ই জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। লোকে বুঝিয়াছিল, লর্ড কেল্‌ভিন্ সাধারণ অধ্যাপক নহেন!

তাপ ও কার্য্যের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ (Thermodynamics) আজ বিজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত, লর্ড কেল্‌ভিন্‌ই তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মেয়ার, জুল, কার্নো (Carnot) প্রভৃতির সহিত লর্ড কেল্‌ভিন্‌ও এই আবিষ্কারে সমান যশোভাক্ বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া তাপসম্বন্ধীয় আরো অনেক গবেষণা ও আবিষ্কারে ইনি অসাধারণ প্রতিভার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ তাঁহার বৈদ্যুতিক গবেষণাতেই বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল। ১৮৫৫ সালে যখন সমুদ্রতলে টেলিগ্রাফের তার বসাইবার কল্পনা চলিতেছিল, লর্ড কেল্‌ভিন্ সেই সময়ে গণনা করিয়া দেখাইলেন, তারের দৈর্ঘ্য যতই অধিক হয় সঙ্কেত চলাচলে ততই বিলম্ব আসিয়া পড়ে। গণনার ফলে অনেকে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ কেল্‌ভিনের গণনার প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেল্‌ভিন্ কাহারো কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তড়িৎপ্রবাহের অত্যল্প পরিবর্ত্তন ধরিবার উপযোগী কোনও যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে অতি অল্পদিন মধ্যে বার্ত্তাবহনের উপযোগী ভাল তার, এবং অতি সূক্ষ্ম তড়িৎবীক্ষণযন্ত্র (Mirror Galvanometer) উদ্ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রপারে বার্ত্তাবহন যাহারা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, কেল্‌ভিনের কৃতকার্য্যতায় তাঁহারা অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এই সময়ে লর্ড কেল্‌ভিন্ কর্ত্তৃক বিদ্যুৎ ও চুম্বক-সম্বন্ধীয় আরো

অনেক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল। অপর কোনও নূতন যন্ত্র অদ্যাপি সেই সকল পুরাতন যন্ত্রের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বে নৌচালনার উপযোগী ভাল দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের বড় অভাব ছিল, এবং অভ্রান্তরূপে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপেরও কোন সুব্যবস্থা ছিল না। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ এই দুইটি ব্যাপার লইয়া অনেক পরীক্ষাদি করিয়াছিলেন। শুনা যায় এক দিগ্‌দর্শন যন্ত্রটিকেই নির্ভুল ও সুব্যবস্থিত করিতে তাঁহাকে পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল! কিন্তু ইহার ফলে যে নূতন যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। চলিষ্ণু জাহাজ হইতে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের উপযোগী যন্ত্রও এই সময়ে অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি এই দুই যন্ত্র প্রত্যেক জাহাজেই ব্যবহৃত হইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ ডাল্টন্‌ (Dalton) কর্ত্তৃক আণবিক-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইলে, পদার্থবিশেষে অণুগুলি কি প্রকারে সজ্জিত থাকে এবং অণুর পরস্পর ব্যবধানই বা কি, জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার উপায় খুঁজিয়া পান নাই। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ এ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রায় বাইশ বৎসর হইল এই গবেষণার ফল প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু আজও তাহার বিবরণী পাঠ করিলে কেল্‌ভিনের অত্যাশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শন ও অসাধারণ গণিতজ্ঞান দেখিয়া অবাক্‌ না হইয়া থাকা যায় না। ঈথর-সাগরের অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ তুলিয়া আলোক যখন কাচ বা অপর কোনও স্বচ্ছপদার্থের ভিতর দিয়া বাহির হয়, তখন তাহার গতির দিকের পরিবর্ত্তন (Refraction)

ঘটে। পদার্থস্থ অণুগুলিই বাধা দিয়া ঈথরতরঙ্গকে এই প্রকারে বাঁকাইয়া দেয় বলিয়া জানা ছিল। লর্ড কেল্‌ভিন্‌ আলোকবিশেষের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং তাহার গতির দিক্‌ পরিবর্ত্তনের মাত্রা অতি সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করিয়া, পদার্থের অণুর আয়তন নির্দ্ধারণের এক সুন্দর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তা'ছাড়া কৈশিকাকর্ষণের (Capillary Attraction) সাহায্য লইয়াও তিনি অণুর আয়তন নির্দ্ধারণের আর একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক ইঞ্চিকে আড়াই লক্ষ সমানভাগে বিভক্ত করিলে যে এক অতি সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, এই হিসাবে পদার্থের অণুগুলির ব্যাস তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। লর্ড কেল্‌ভিনের এই সূক্ষ্ম গণনা লইয়া অনেকে পরবর্ত্তী কালে অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, কিন্তু গণনার অণুমাত্র ভুল পাওয়া যায় নাই। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, এ প্রকার সূক্ষ্ম গণনা কেল্‌ভিনের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁহার অসীম অধ্যবসায় ও অত্যাশ্চর্য্য গণিতজ্ঞান তাঁহার প্রত্যেক গবেষণাকে সাফল্য দিয়াছে।

লর্ড কেল্‌ভিনের প্রধান গবেষণাগুলির মধ্যে কেবল দুই একটি উল্লেখ করা গেল মাত্র। ইহা ছাড়া তিনি আরো যে-সকল গবেষণা করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব ও সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ দিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। পঞ্চাশ বৎসরে তিনি নানা বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রায় তিনশত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন! বলা বাহুল্য, প্রত্যেক প্রবন্ধই এক এক নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিত। জড়বিজ্ঞানের কোন শাখাই তাঁহার গবেষণা হইতে বাদ পড়ে নাই। জড়ের

উৎপত্তিতত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন গাণিতিক ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া জলের কল প্রস্তুত করা প্রভৃতি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র অংশগুলিও তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। সকল বিজ্ঞানেই তিনি এ প্রকার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহা আর মুছিবার নহে। বিধাতা যেমন তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদগুলি দ্বারা ভূষিত করিয়া কেল্‌ভিন্‌কে জগতে পাঠাইয়াছিলেন, জগতের লোকও সেই সকল আশীর্ব্বাদের সমুচিত সম্মান দেখাইতে ভুলে নাই। মান ও ঐশ্বর্য্য অযাচিত ভাবে তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিল। দরিদ্র অধ্যাপকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং দেশবিদেশের বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজমাত্রেই তাহাদের শ্রেষ্ঠ উপাধিগুলি কেল্‌ভিন্‌কে দান করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিল।

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে একটা বৃহৎ ব্যাপার আপনা হইতেই আমাদের নজরে পড়ে। মনে হয়, অনেক প্রাচীন বৈজ্ঞানিকই তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে মানুষের প্রাত্যহিক কার্য্যে লাগাইতে যেন ঘৃণা বা অপমান জ্ঞান করিতেন। বড় বড় প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের জীবনের নানা কার্য্যে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা হাতে কলমে কাজ করার কৌশল তাঁহারা অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। সুতরাং ঐ ভাবটা তাঁহাদের বুদ্ধির জড়িমাপ্রসূত নয়। কাজেই স্থানকালপাত্রের এক অদ্ভুত সম্মিলন-জাত ঘৃণা বা অপমান-বোধকেই তাহার উৎপত্তি বলিতে হয়। কথিত আছে মার্সিলসের (Marcellus) নৌবাহিনী সিরা-কিউসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছে জানিয়া, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক

আর্কিমিডিস্‌ অত্যন্ত তাচ্ছীল্যের সহিত বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের তুলনায় নৌবাহিনীর ব্যবস্থা অতি তুচ্ছ। বলা বাহুল্য আর্কিমিডিসের নৌ-চালনযন্ত্র তখন প্রস্তুতই হয় নাই, কেবল কাগজে কলমে তাহার উপযোগিতা দেখিয়া, তিনি মার্সিলসের নৌবাহিনীকে অকিঞ্চিৎকর সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহারই অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানকে কাজে লাগাইবার জন্য রাজা হায়রোকে (Hiero) বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইউডক্সস্‌ (Eudoxus) ও আকাইটাস্‌ নামক দুইজন প্রাচীন পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথমে জ্যামিতিকে ব্যবহারিক জ্যামিতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজেই জ্যামিতিকে পুঁথির পাতা হইতে বাহির হইয়া মুটে মজুর ও কলকারখানার ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত প্লেটো তখন জীবিত ছিলেন। এ পর্য্যন্ত যে শাস্ত্র কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীরই সম্পত্তি ছিল, তাহার এই দুর্দ্দশা তাঁহার সহ্য হয় নাই। প্লেটো পরুষ ভাষায় ঐ স্বেচ্ছাচারীদিগকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের জীবনে এই দুঃসহ পাণ্ডিত্যাভিমান এখন আর মোটেই নাই। ইহারা একাধারে কঠোর তপস্বী ও অক্লান্তকর্ম্মী।

লর্ড কেল্‌ভিনের জীবনে বৈজ্ঞানিকদিগের এই আধুনিক আদর্শটি সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। জড়তত্ত্বের অতি গূঢ়রহস্যের সুমীমাংসার জন্য তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন মুনির ন্যায়ই গবেষণানিরত দেখা যাইত, এবং স্বাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে সাংসারিক কাজে লাগাইবার সময় তিনি সাধারণ শ্রমজীবীরই মত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। বাঁৎলো, ল্যাংলে ও টিন্‌ডাল্‌ প্রভৃতি অনেক সুনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে স্বহস্তে

নানা কার্য্যে লাগাইয়া মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে বোধ হয় কেহই লর্ড কেল্‌ভিনের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। নব নব যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া ইনি জগতের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়।

আত্মশক্তির উপর সন্দেহ ও বিশ্বাসের শিথিলতা মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান অন্তরায়। ইহারা ঘাড়ে চাপিলে মানুষ কোনক্রমে মাথা তুলিতে পারে না। লর্ড কেল্‌ভিনের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় তিনি এই দুই শত্রুকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন, এবং জয় করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি জগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন। ছাত্রগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সময় লর্ড কেল্‌ভিন্ শাস্ত্রে অটল বিশ্বাস স্থাপনের জন্য প্রায়ই উপদেশ দিতেন। কোন ছাত্র তাঁহার কোন উক্তিতে অবিশ্বাস করিলে তিনি বোর্ডের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিতেন,—"এই উক্তি আমার নয়, যে শাস্ত্রকে মানুষ প্রথম জ্ঞানোন্মেষের দিন হইতে অভ্রান্ত বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, সেই গণিতশাস্ত্রই তোমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে।"

আজ কয়েক বৎসর হইল, কোন বৈদ্যুতিক গবেষণা করিতে গিয়া লর্ড কেল্‌ভিন্ দেখিয়াছিলেন যে, যে তড়িৎপ্রবাহের স্পর্শে প্রাণীর জীবন সংশয় হয়, অবস্থাবিশেষে দেহের ভিতর দিয়া তাহা অপেক্ষা প্রবলতর প্রবাহ চালাইলে প্রাণীর কোনই অনিষ্ট হয় না। এই প্রকার একটা ব্যাপারে তিনি প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুনঃ পুনঃ গণনা করিয়া যখন হিসাবের ভুল বাহির হইল না, তখন আর তিনি ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ছাত্রমণ্ডলীকে ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য আহ্বান

করিলেন, কিন্তু এই জীবনসংশয় পরীক্ষার জন্ত কেহই প্রস্তুত হইতে পারিলেন না। শেষে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া অবিচলিত চিত্তে নিজের শরীরের ভিতর দিয়া প্রবল বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইয়া দিলেন! প্রবাহ তাঁহার শরীরে একটুও বেদনা দিল না। ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—"তোমরা কথনো বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব ও গণিতের মূলস্থত্রগুলিতে অবিশ্বাস করিও না। এই অবিশ্বাসই কৃতিত্বলাভের প্রধান অন্তরায়।" এই অটল বিশ্বাসই কেল্‌ভিন্‌কে এত বড় করিয়াছিল।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

মহেশ

(১)

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু, দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না,—এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু, মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্দ্ধ গতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে,—যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে এবং অন্তঃপুরের লজ্জা সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফ্‌রা, বলি, ঘরে আছিস্?

তাহার বছর দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর!

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাব্‌লা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্চে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত খর বাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফেরবার পথে দেখ্‌চি তেম্‌নি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হলে যে কর্ত্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়!

কি কোর্‌ব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দু-খুটো খাইয়ে আন্‌ব,—তা' মাথা ঘুরে পড়ে যাই।

তবে, ছেড়ে দে না, আপ্‌নি চরাই করে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি,—খামারে পড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয়নি, মাঠের আলগুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে,—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবা-ঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্‌ ত ঠাণ্ডায়

কোথাও বেঁধে দিয়ে দু'আঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক্। তোর মেয়ে ভাত রাঁধেনি? ফ্যানে-জলে দেনা এক গামলা, খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়? ভাগে এবার যা' পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গরুটার জন্যেও এক আঁটি ফেলে রাখতে নেই? ব্যাটা কসাই।

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্ত্তা মশায় সব ধরে রাখলেন। কেঁদে কেটে হাতে-পায়ে পড়ে বললাম, বাবু মশাই হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই, একখানি ঘর, বাপ বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজা গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু, না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস্! সাধ করে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেঁসে বাঁচিনে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস দুয়ের খোরাকের মত ধান দু'টি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হয়ে গেল, ও আমার কুটোটী পেলে না—বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার

অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই,—খেয়ে রেখেছিস দিবিনে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা ত রাম রাজত্বে বাস করিস্,—ছোট লোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে করে মরিস্!

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে কোরব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করিনে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল ত? বিঘে চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপ্‌রি উপ্‌রি দু'সন অজন্মা,—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল,—বাপ বেটিতে দু'বেলা দুটো পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত পাইনে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ বিষ্টি বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে কোণে বসে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজ্‌রা গোণা যাচ্চে,—দাও না ঠাকুর মশাই কাহনদুই ধার, গরুটাকে দু'দিন পেটপুরে খেতে দিই,—বলিতে বলিতেই সে ধপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু'পা পিছাইয়া কহিলেন, আ মর্, ছুঁয়ে ফেল্‌বি না কি?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহনদুই খড়। তোমার চার চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেচি,—এ ক'টি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবলা জীব,—কথা বল্‌তে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়া জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিলেন, ধার নিবি, শুধ্‌বি কি কোরে শুনি?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন করে পারি শুধ্‌বো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুলকণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না! যেমন করে পারি শুধ্‌বো! রসিক আমার! যা যা সর্, পথ ছাড়। ঘরে যাই বেলা বয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আঃ মর্ শিঙ্ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে নাকি!

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফল মূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েচে, এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায়? তা' বটে! যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না, চাল কলা খাওয়া চাই! নে নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ। যে শিঙ্ কোন্ দিন দেখ্‌চি কাকে খুন কর্‌বে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দু'টি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক্‌গে—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রিতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস্, তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারিনে,—কিন্তু তুই ত জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিটের উপর রগড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেম্‌নি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশান ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন কোরে বাঁচিয়ে রাখি বল্? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি,—তোকে নিয়ে আমি কি করি! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌তে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপ্ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল, তার পরে ভাঙ্গা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরাণো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শীগগীর করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—

বাবা?

কেন মা?

ভাত খাবে এসো—এই বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোণো পচা খড় মা আপনিই ঝরে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুন্‌তে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার কোর্‌চ?

না মা ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেয়ালটা যে পড়ে যাবে বাবা,—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গেছে, এবং এমন ধারা করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশী জানে। অথচ, এ উপায়েই বা ক'টা দিন চলে!

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুর কহিল ফ্যানটুকু দে ত মা, একবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই মরে গেছে।

নেই? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে, মা,—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বল্‌লে বড় ক্ষিধে পেয়েচে?

তখন? তখন হয়ত জ্বর ছিল না মা।

তা'হলে তুলে রেখে দি, সাঁজের বেলা খেয়ো?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়্‌বে আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল, এক কাজ কর্ না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দু'টি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

(২)

পাঁচ সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়াছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই, আমিনা সকাল হইতে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মাণিক ঘোষেরা মহেশকে আমাদের থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগ্‌লি!

হাঁ বাবা, সত্যি। তাদের চাকর বল্‌লে, তোর বাপ্‌কে বল্‌গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহুপ্রকার দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা

ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার হয় নাই। বিশেষতঃ, মাণিক ঘোষ। গো ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে পড়ে এল বাবা, মহেশকে আনতে যাবে না ?

গোফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বললে তিন দিন হলেই পুলিসের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেলবে !

গফুর কহিল, ফেলুকগে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখ মাত্রেই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর দু'য়ের মধ্যে সে বার পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব, আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাবলাতলা সেই দড়ি সেই খুটা সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়া

গোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড় করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙ্‌ব না, এই পুরোপুরি দিলাম,—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেম্‌নি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুই জন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল তাহারা গরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বল্‌চি,—খবরদার বল্‌চি ভাল হবে না।

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল কেন?

গফুর তেম্‌নি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি? আমার জিনিষ আমি বেচ্‌ব না—আমার খুশী। এই বলিয়া সে নোট-খানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আস্‌তে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাওনা তোমাদের বায়না ফিরিয়ে! এই বলিয়া সে ট্যাক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দু টাকা বেশী নেবে, এই ত? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশী কেউ একটা আধ্‌লা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়া বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি ? চাম্‌ড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে, মাল আর আছে কি ?

তোবা ! তোবা ! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা বিশ্রী কটুকথা বাহির হইয়া গেল, এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে, তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল কিন্তু কিছুক্ষণেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল এ কথা কর্ত্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়াছিল, শিবু বাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাইনে। কোথায় বাস করে আছিস্, জানিস্ ?

গফুর হাত জোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাইনে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন, আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদি এবং বদ্‌মেজাজি বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো কোরবনা কর্ত্তা ! এই বলিয়া সে নিজে দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল, এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত নাকখত দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবু বাবু সদয়কণ্ঠে কহিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েছে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস্‌নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন, এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্ত্তার পুণ্য প্রভাবে ও শাসন ভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন, এবং যে জন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথারও জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল, এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারম্বার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

(৩)

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্ত্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্য্যন্ত নাই। কথনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্ত্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভরে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, আজ এ কথা ভাবিতেও যেন ভয় হয়। মনে হয় সমস্ত প্রজ্জলিত নভস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই,—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এম্‌নি দিনে দ্বিপ্রহর বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয়, এবং মাত্র দিন চার পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্ব্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা, ভাত হয়েছে রে ?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত ? কি বল্‌লি,—হয়নি ? কেন শুনি ?

চাল নেই বাবা।

চাল নেই ? সকালে আমাকে বলিস্‌নি কেন ?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া তাহার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম ! রাত্তিরে বল্‌লে কারু মনে থাকে ? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাক্‌বে কি করে ? রোগা বাপ থাক্ আর না থাক্, বুড়োমেয়ে চারবার পাঁচবার করে ভাত গিল্‌বি। এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাবো। দে এক ঘটি জল দে,—তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্, তাও নেই।

আমিনা তেম্‌নি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্য্যন্ত নাই,

তখন সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস্ করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া, হারামজাদা মেয়ে সারাদিন তুই করিস্ কি? এত লোকে মরে তুই মরিস্‌নে!

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল তাহার এই স্নেহশীলা কর্ম্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো পর্য্যন্ত তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোন দিন একবেলা, কোন দিন বা তাও নয়। দিনে পাঁচ ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেম্‌নি মিথ্যা। এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণ বাবুর খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু চারটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া যা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেসিতে পারে না। ঘণ্টার পরে ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেই টুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না, কিম্বা কাড়াকাড়ির মাঝখানে কেহ মেয়েকে তাহার কৃপা করিবার অবসর পায় নাই,—এম্‌নিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া

তাহার নিজের চোখও জলে ভরিয়া আসিল। এম্‌নি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস্‌?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাকচেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া দাওয়া হয়নি, পরে যাবো।

এতবড় স্পর্দ্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবোনা।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয় বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে অত ক্ষীণকণ্ঠ অতবড় কাণে গিয়া পৌঁছায় না,—না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুইই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোট মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়,—

ইতিপূর্ব্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরীব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয়ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয়, বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে প্রজার মুখের এতবড় স্পর্দ্ধা, জমিদার হইয়া শিবচরণ বাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁস ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্ত্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।

একটিবারমাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বহিয়া ফোটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার

যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল।

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালোচক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চক্‌চকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচ্‌তে হয়।

গফুর এ সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই।

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চট্‌কলে কাজ কর্‌তে।

মেয়ে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই,—সেখানে ধর্ম্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত আব্রু থাকে না, এ কথা সে বহুবার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরী করিস্‌নে মা, চল্‌, অনেক পথ হাঁট্‌তে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক্‌ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাব্‌লা তলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুসি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করোনা।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ

রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে—হায়! খণ্ডিত শিরে তোমার প্রয়োজন কি? সীমার! শিরে তোমার আবশ্যক কি? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? হোসেনের শির তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই বা সে শির লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে এত বেগে দৌড়িয়াছ কেন? যাইতেছই বা কোথা? সীমার, একটু দাঁড়াও। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও! কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয়? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে? একটু দাঁড়াও। ঐ শিরে তোমার স্বার্থ কি? খণ্ডিত শিরে প্রয়োজন কি? অর্থ? হায় রে অর্থ! হায় রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল! জীবের জীবনের ধ্বংস, সম্পত্তির বিনাশ, পিতা-পুত্রের শত্রুতা, স্বামি-স্ত্রীতে মনোমালিন্য, ভ্রাতা-ভগ্নীতে কলহ, রাজা প্রজায় বৈরভাব, বন্ধু-বান্ধবে বিচ্ছেদ;—বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, বিরহ, বিসর্জ্জন, বিনাশ, এ সকলই তোমার জন্য! সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে? কে না ধোঁকা খাইতেছে? কে না মজিতেছে? তুমি দূর হও, তুমি দূর হও! কবির কল্পনার পথ হইতে একেবারে দূর হও! কবির চিন্তাধার হইতে একেবারে সরিয়া যাও!

তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে! তোমারই জন্য প্রভু হোসেন সীমার-হস্তে খণ্ডিত;—রাক্ষসি! তোমারই জন্য খণ্ডিত শির বর্শাগ্রে বিদ্ধ!

সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচল-গমনে উদ্যোগী। সীমার-অন্তরে নানা ভাব; তন্মধ্যে অর্থচিন্তাই প্রবল; চিরঅভাবগুলি আশু মোচন করাই স্থির। একাই মারিয়াছি, একাই কাটিয়াছি, একাই যাইতেছি, একাই পাইব, আর ভাবনা কি? লক্ষ টাকার অধিকারীই আমি। চিন্তার কোন কারণ নাই। নিশাও প্রায় সমাগত। যাই কোথা? বিশ্রাম না করিলেও আর বাঁচি না। নিকটস্থ পল্লীতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া নিশা যাপন করি। এ ত সকলি মহারাজ এজিদ্ নামদারের রাজ্যভুক্ত, অধীন ও অনুগত। সৈনিক বেশ,—হস্তে বর্শা, বর্শাগ্রে মনুষ্যশির বিদ্ধ, ভয়ানক রোষের লক্ষণ। কে কি বলিবে? কার সাধ্য—কে কি বলিবে?

সীমার এক গৃহীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশাযাপন করিবেন জানাইলেন। বর্শা-বিদ্ধ খণ্ডিত শির অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, বুঝি জয়সংক্রান্ত কেহবা মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা বলিলেন না, সাদরে সীমারকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, পথশ্রান্তি দুরীকরণের উপকরণ-আদি ও আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ভক্তিসহকারে অতিথি-সেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়! যদি অনুমতি করেন তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।"

সীমার বলিলেন,—

"কি কথা?"

"কথা আর কিছু নহে, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আর এই বর্শাবিদ্ধ শির কোন্ মহাপুরুষের?"

"ইহার কথা অনেক। তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি, মদিনার রাজা হোসেন—যাহার পিতা আলী, এবং মহম্মদের কন্যা ফতেমা যাহার জননী এ তাহারই শির। কারবালা-প্রান্তরে, মহারাজ এজিদ্-প্রেরিত সৈন্য সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া এই অবস্থা। দেহ হইতে মস্তক ভিন্ন করিয়া মহারাজের নিকটে লইয়া যাইতেছি, পুরস্কার পাইব। লক্ষ টাকা পুরস্কার। তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মহম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না। তোমার আদর অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না, তোমার আহার্য্যও গ্রহণ করিতাম না।"

"হাঁ এতক্ষণে জানিলাম, আপনি কে। আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানা প্রকার দেব-দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শা-বিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্রি আপন তত্ত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যথা ইচ্ছা গমন করিতেন। কারণ যদি কোন শত্রু আপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশীথ সময়ে, কৌশলে কি বল প্রয়োগে এই মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনার ক্লান্তিজনিত অবশ অলসে, ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে আপনার অজ্ঞাতে এই মহামূল্য শির,—আপাততঃ যাহার মূল্য লক্ষ টাকা—যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাদুঃখের কারণ হইবে;

আমাকে দিন, আমি সাবধানে রাখি, আপনি প্রত্যুষে লইবেন। আমার তত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে পারিবেন।"

সীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব শ্রবণ মাত্রেই সম্মত হইল। গৃহ-স্বামী হোসেন-মস্তক নিশ্বাসের সহিত মস্তকে ছুঁইয়া বহু সমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিল। পথশ্রান্তিহেতু সীমারের কেবল শয়নে বিলম্ব; যেমনি শয়ন, অমনি অচেতন।

গৃহ-স্বামী বাস্তবিক হজরত মুহম্মদ মস্তাফার শিষ্য ছিলেন না। নানা প্রকার দেব-দেবীর আরাধনাতেই সর্ব্বদা রত থাকিতেন। উপযুক্ত তিন পুত্র এবং এক স্ত্রী। নাম, "আজর।"

সীমারের নিদ্রার ভাব জানিয়া আজর স্ত্রী-পুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যন্ত ঘটনা বলিলেন।

যে ঘটনায় পশু-পক্ষীর চক্ষের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই দেহবিচ্ছিন্ন হোসেন-মস্তক দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব-দেবীর উপাসক হউক, এস্লাম-ধর্ম্মবিদ্বেষীই হউক, এ নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হয়? পিতা-পুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন-শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন, "মনুষ্যমাত্রেই এক উপকরণে গঠিত এবং এক ঈশ্বরের সৃষ্ট। জাতিভেদ ও ধর্ম্মভেদ, সেও সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের লীলা। ইহাতে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, কেবল মূঢ়তার লক্ষণ! এমাম্ হাসান্-হোসেনের প্রতি এজিদ্ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয়মাত্রেরই তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়। সে দুঃখের

কথায় কোন্ চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইলে, আর না হউক, জাতীয় জীবন বলিয়াও কি প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু, পরম ধার্ম্মিক, বিশেষ ঈশ্বর-ভক্ত, মহাপুরুষ মহম্মদের হৃদয়ের অংশ—ইহাদের এই দশা? হায়! হায়! সামান্য পশু মারিলে কত মানুষ কাঁদিয়া গড়াগড়ি যায়—বেদনায় অস্থির হয়, আর মানুষের জন্য মানুষ কাঁদিবে না? ধর্ম্মের বিভেদ বলিয়া-মানুষের বিয়োগে মানুষ মনোবেদনায় বেদনা বোধ করিবে না? যন্ত্রণা অনুভব করিবে না? মহাপুরুষ মহম্মদ পবিত্র, হাসান পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র, সেই পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা? যুদ্ধে হত হইয়াছে বলিয়াই কি এত তাচ্ছীল্য? যাহাই হউক, আজরের এই প্রতিজ্ঞা—জীবন থাকিতে হোসেন-শির দামেস্কে লইয়া যাইতে দিবে না। যত্নের সহিত, আদরের সহিত, ভক্তি সহকারে সে মহাপ্রান্তর কারবালায় লইয়া যাইয়া, শিরঃশূন্যদেহের সন্ধান করিয়া সদ্গতির উপায় করিবে; প্রাণ থাকিতে এ শির আজ ছাড়িবে না।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "এই হোসেন বিবি ফতেমার অঞ্চলের নিধি—নয়নের পুত্তলি ছিলেন। হায়! হায়! তাঁহার এই দশা! এ জীবন থাক্ বা যাক্, প্রভাত না হইতে হইতে আমরা পবিত্র মস্তক লইয়া কার্‌বালায় যাইব। শেষে ভাগ্যে যা থাকে হইবে।"

পুত্রেরা বলিল, "আমাদের জীবন পণ, তথাপি কিছুতেই সৈনিকহস্তে এ মস্তক প্রত্যর্পণ করিব না। প্রাতে সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্র কার্‌বালায় যাইব।"

জগৎ জাগিল। পূর্ব্বগগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল। সীমার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সজ্জিত

হইয়া বর্শা-হস্তে দণ্ডায়মান এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "অহে! আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও। শীঘ্র যাইব।"

আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার নামটী কি শুনিতে চাই। আর তুমি কোন্ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব তাহাও জানিতে চাই; ভাই, রাগ করিও না; ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি, বিধি ব্যবস্থা ইহার কিছুতেই এ কথা পাওয়া যায় না যে, শক্রর মৃত-শরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্য পশু এবং অসভ্য জাতিরাই গত-জীবন শত্রু-শরীরে নানা প্রকার লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ! তোমার রাজা সুসভ্য, তুমিও দিব্য সভ্য, এ অবস্থায় এ পশু-আচার কেন ভাই?"

"রাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছি, সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান! ও সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাই সাহেব! বিড়াল তপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলবী জগতে অনেক আছে,—অনেক দেখিয়াছি,—আজিও দেখিলাম। ধর্ম্মাবতারের ধূর্ত্ততা, চতুরতা, সীমারের বুঝিতে আর বাকি নাই; কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ মোটা কথাটা কে না বুঝিবে যে, হোসেন-মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামেস্কে যাইয়া মহারাজের নিকট বাহাদুরী জানাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ কর। যদি ভাল চাও, যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছুদিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়া দাও।"

"ওরে ভাই! আমি তোমার মত স্বার্থপর অর্থলোভী নহি। আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি, অর্থলালসায় হোসেন-মস্তক কখনই দামেস্কে লইয়া যাইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ, উচ্চ-হৃদয়ে টাকার ঘাত-প্রতিঘাত নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, সুনাম, যশ, কীর্ত্তি, পরদুঃখ-কাতরতা—এই সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কি রে ভাই?"

"ওহে ধার্ম্মিকবর! আমি ও সকল কথা অনেক জানি! টাকা যে জিনিষ, তাহাও ভাল করিয়া চিনি। মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন; কিন্তু জগৎ এমনি ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোথাও নাই,—সমাজে নাই, স্বজাতির নিকটে নাই, ভ্রাতা ভগ্নীর নিকট কথাটীর প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসে, বল ত জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসারও আশা নাই; কাহারও নিকট সম্মান নাই। টাকা না থাকিলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না। জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা, জগতে টাকারই খেলা। টাকা যে কি পদার্থ, তাহা তুমি চেন বা না চেন, আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয় জানিও আমি নেহাত মূর্খ নহি, আপন লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারি। যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দাও। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি—ওরে পাগল! রাজদ্রোহীর শাস্তি কি, তাহা জান?"

"রাজ-বিদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষরূপে জানি। দেখ ভাই! তোমার সহিত বাদবিসম্বাদ অকৌশল করিতে আমার ইচ্ছামাত্র

নাই। তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাঁহার অধীনস্থ প্রজা, সাধ্য কি রাজ-কর্ম্মচারীর আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা কর, খণ্ডিত-শির আনিয়া দিতেছি; মস্তক পাইলেই ত তাই তুমি ক্ষান্ত হও?"

"হাঁ, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকি না।"

আজর স্ত্রীপুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক-পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না; আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক-পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আমি স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি; স্বামার সেও বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে সমর্পন করিয়াছে; এ অবস্থায় উহার প্রাণবধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ঘাতকতার সহিত নরহত্যা-পাপ-পঙ্কিলে ডুবিতে হয়। রাজ-অনুচর, রাজ-কর্ম্মচারী, রাজাশ্রিত লোককে প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সেও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিকহস্তে কখনই দিব না। তোমরা ঐ খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও, সে বর্শায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত-শির প্রাপ্ত হইলে তিলার্দ্ধকালও এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কার্‌বালায় লইয়া, দেহ সন্ধান করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে, এই আমার শেষ উপদেশ। সাবধান, কেহ ইহার অন্যথা করিও না।"

আজরের জ্যেষ্ঠপুত্র সায়াদ বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমরা ভ্রাতৃত্রয় বর্ত্তমান থাকিতে আপনার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইবে? এ কি কথা! আমরা কি পিতার উপযুক্ত পুত্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃভক্তির কণামাত্রও স্থান পায় নাই? আমরা কি এমনি নরাকার পশু যে, স্বহস্তে পিতৃমস্তক ছেদন করিব? ধিক্ আমাদের জীবনে; ধিক্ আমাদের মনুষ্যত্বে! খণ্ডিত মস্তক প্রাপ্ত হইলেই যদি সৈনিক-পুরুষ চলিয়া যায়, তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করুন। সকল গোল মিটিয়া যাউক।"

"ধন্য সায়াদ! তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকার ব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত। তোমার জন্ম সার্থক; আমারও জীবন সার্থক। যে উদরে জন্মিয়াছ, সে উদরও সার্থক! প্রাণাধিক! জগতে জন্মিয়া পশুপক্ষীদিগের ন্যায় নিজ উদর পরিপোষণ করিয়া চলিয়া গেলে মনুষ্যত্ব কোথায় থাকে?" ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়্গ টানিয়া লইয়া হস্ত উত্তোলন করিলেন।

পরের জন্য—বিশেষ খণ্ডিত মস্তকের জন্য—আজর, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ জ্যেষ্ঠ পুত্রের গ্রীবা লক্ষ্যে খড়্গ উত্তোলন করিলেন। পিতার হস্ত উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিলেন, আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কবির কল্পনা-আঁখি ধাঁধা লাগিয়া বন্ধ হইল। সুতরাং কি ঘটিল, কি হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

এদিকে সীমার বর্শাহস্তে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া মহা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "খণ্ডিত শির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে, তাহার মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে, অথচ হোসেনের মস্তক লইয়া যাইব।"

আজর খণ্ডিতশির হস্তে করিয়া সীমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সীমার মহাহর্ষে শির বর্শায় বিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিল যে, সদ্যঃ-কর্ত্তিত, শোণিতরঞ্জিত রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে। সীমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ কি? তুমি উন্মাদ হইয়া এ কি করিলে? এ মস্তক লইয়া আমি কি করিব? লক্ষটাকা প্রাপ্তির আশায় হোসেন-মস্তক গোপন করিয়া কাহাকে বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থলোভী ত আমি কখন দেখি নাই। আহা! এই বুঝি তোমার হিতোপদেশ! এই বুঝি তোমার পরোপকারব্রত! অরে নরাধম! এই বুঝি তোর সাধুতা! কি প্রবঞ্চক! কি পাষণ্ড! ওরে নরপিশাচ! আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস্?"

"ভ্রাতঃ! আমি ঠকাইতে আসি নাই; তুমিই ত বলিয়াছ যে, খণ্ডিত-মস্তক পাইলে চলিয়া যাইব। এখন একি কথা—এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?"

"আমি কি জানি যে তুমি একজন প্রধান দস্যু। টাকার লোভে কাহার কি সর্ব্বনাশ করিলে কে জানে?"

"তুমি কি পুণ্যবলে হোসেন-মস্তক কাটিয়াছিলে ভাই? মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব কথা ছিল, এখন বিলম্ব কেন? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম, এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।"

"কথা কাটিলে চলিবে না। যে মস্তকজন্য কার্‌বালা প্রান্তরে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, যে মস্তকজন্য, মহারাজ এজিদ্ ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যে মস্তকজন্য চতুর্দ্দিকে 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' রব হইতেছে, সেই মস্তকের পরিবর্ত্তে এ কি!—ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? তুমি আমার প্রদত্ত মস্তক আনিয়া দাও।"

"ভাই! তুমি তোমার কথা ঠিক রাখিলে না, ইহাই আমার দুঃখ। মানুষের এমন ধর্ম্ম নহে।"

সীমার মহাগোলযোগে পড়িল। একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এ শির এইখানেই রাখিয়া দাও, আমি খণ্ডিত-মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি, এবারে হোসেন-শির না আনিয়া আর কি আনিবে? -আন দেখি!"

আজরের মুখভাব দেখিয়াই মধ্যমপুত্র বলিলেন, "পিতা, চিন্তা কি? আমরা সকলেই শুনিয়াছি, খণ্ডিত-মস্তক পাইলেই সৈনিক-প্রবর চলিয়া যাইবেন। অধম সন্তান এই দণ্ডায়মান হইল, খড়্গ হস্তে করুন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির দামেস্করাজের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।"

আজর পুনরায় খড়্গ হস্তে লইলেন, যাহা হইবার হইয়া গেল। শির লইয়া সীমারের নিকট আসিলে, সীমার আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, 'এ উন্মাদ কি করিতেছে!' প্রকাশ্যে বলিল, "ওহে পাগল! তোমার এ পাগলামি কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।"

"একি কথা? ভ্রাতঃ! তোমার একটী কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই। ধিক্ তোমাকে!"

পুনরায় সীমার বলিল, "দেখ ভাই! তুমি হোসেনের শির রাখিয়া কি করিবে? এ মস্তকের পরিবর্ত্তে দুইটী প্রাণ অনর্থক বিনাশ করিলে, বল ত ইহারা তোমার কে?"

"এ দুইটী আমার সন্তান।"

"তবে ত তুমি বড় ধূর্ত্ত ডাকাত। টাকার লোভে আপনার সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিতেছ। ছি! ছি! তোমার ন্যায়

অর্থপিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক ঘরে রাখিয়া দাও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনয়ন কর নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ! আমার গৃহে একটী মস্তক ব্যতীত আর নাই, আনিয়া দিতেছি লইয়া যাও।"

"আরে হাঁ হাঁ, সেইটীই চাহিতেছি, সেই একটী মস্তক আনিয়া দিলেই আমি এখনই চলিয়া যাই।"

আজর শীঘ্র শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন তাহা লেখনীতে লেখা অসাধ্য! পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন এবারে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানের শির লইয়া আজর সীমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ! আমার সঞ্চিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি? তাহা কখনও পারিবি না।"

"আমি পুরস্কার চাহি না। আমার লক্ষ লক্ষ বা লক্ষাধিক লক্ষ মূল্যের তিনটী মস্তক তোমাকে দিয়াছি ভাই! তবু তুমি এখান হইতে যাইবে না?"

"অরে পিশাচ! টাকার লোভ কে সম্বরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কি জন্য রাখিয়াছিস্? তোর সকলই কপট। শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দে।"

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না। এক মস্তকের পরিবর্ত্তে তিনটী দিয়াছি, আর দিব না,—তুমি চলিয়া যাও।"

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "তুই মনে করিস না যে হোসেন-মস্তক মহারাজ এজিদের নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ করিবি। এই যা—একেবারে দামেস্কে চলিয়া যা!" সীমার

সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল, এবং বীর দর্পে আজরের শয়নগৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিল, সুবর্ণ-পাত্রোপরি হোসেনের মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে, আজরের স্ত্রী খড়্গহস্তে তাহা রক্ষা করিতেছে। সীমার এক লম্ফে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পূর্ব্ববৎ বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল, "তোকে মারিব না, ভয় নাই। সীমারের হস্ত কখনই স্ত্রী-বধে উত্তোলিত হয় নাই ; কোন ভয় নাই।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "আমার আবার ভয় কি ? যাহা হইবার হইয়া গেল। এই পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্ব্বস্ব-হারা হইলাম, আর ভয় কি ? মনের আশা পূর্ণ হইল না—হোসেনের শির কারবালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ। তোমাকে আমার কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে ?"

"কি অভয় দান করিব ? তোকে রাখিলে রাখিতে পারি, মারিলে এখনই মারিয়া ফেলিতে পারি।"

"আমার কি জীবন আছে ? আমিত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।"

"কি তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস্ না ? সীমারের অনুগ্রহ চাহিস্ না ? অরে পাপীয়সি ! তুই স্বচক্ষেই ত দেখিলি, তোর স্বামীকে কি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম ! তুই স্ত্রীলোক হইয়া আমার অনুগ্রহ চাহিস্ না ?"

এই বলিয়া সীমার বর্শাহস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইতেই, আজরের স্ত্রী খড়্গহস্তে রোষভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস্ ! অরে পাপিষ্ঠ নরাধম, দেখিতেছিস ? তিনটী পুত্রের রক্তে আজ

খড়্গা রঞ্জিত করিয়াছি; পর পর আঘাতে স্পষ্টতঃ তিনটী রেখা দেখা যাইতেছে। পামর! নিকটে আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।”

সীমার একটু সরিয়া দাঁড়াইল। আজরের স্ত্রী বলিলেন, “ভয় নাই, তোকে মারিয়া আমি কি করিব! আমার বাঁচিয়া থাকা আর না থাকা সমান কথা। তবে দেখিতেছি, এই খড়্গে তিন পুত্র গিয়াছে, আর ঐ বর্শাতে তুই আমার জীবনসর্ব্বস্ব পতির প্রাণ বিনাশ করিয়াছিস্।” এই কথা বলিতে বলিতে আজর-স্ত্রী সীমারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন। সীমারের হস্তস্থিত বর্শায় বাধা লাগিয়া দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগিল। বর্শা-বিদ্ধ হোসেন-মস্তক বর্শাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র আজর-স্ত্রী ক্রোড়ে করিয়া বেগে পলাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীমার বামহস্তে সাধ্বী সতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে ক্রোড় হইতে হোসেন-শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী তখন একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়্গ দ্বারা আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, সীমারের বর্শাঘাতে মরিতে হইল না। সীমার হোসেন-শির পূর্ব্ববৎ বর্শায় বিদ্ধ করিয়া দামেস্কাভিমুখে চলিল।

মশর্‌রফ্ হোসেন মরহুম।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

যখন ভিক্টোর হিউগো সপুত্রক দ্বাদশ বর্ষের জন্য নির্জ্জন সমুদ্রতটে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ তুমি কি ভাবে অতিবাহিত করিবে?" পুত্র উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি এই সময়টা সেক্ষপীয়রের গ্রন্থরাজি পাঠ করিব। কিন্তু পিতঃ তুমি এই সময়টা কি করিয়া কাটাইবে?" ভিক্টোর হিউগো বলিয়াছিলেন, "আমি এই দ্বাদশ বৎসর সমুদ্র দেখিয়া অতিবাহিত করিব।"

বস্তুতঃ এই দুয়েরই ফল এক। ভিক্টোর হিউগো লিখিয়াছেন, জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চরিত্র সমুদ্রের ন্যায়ই গূঢ় ও বিরাট।

সার আশুতোষের জীবন-চরিত যতই হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা পাই ততই বিস্ময়ে মন পূর্ণ হইয়া উঠে। এ যেন সত্যই সমুদ্র-দর্শন।

ভবভূতি লিখিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চরিত্র বজ্রের মত কঠোর এবং কুসুমের মত মৃদু। আপনারা আশুতোষের অদ্ভুত তেজ ও সত্যনিষ্ঠার কথা শুনিয়াছেন। সে অকুতোভয়তা, সেরূপ ভাবী ফলে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, বর্ত্তমান কর্ত্তব্যে অমোঘ একনিষ্ঠ-সর্ব্বস্ব-পণ বীরত্ব আমরা এ যুগে আর দেখি নাই। এই যুগে চারিদিকে লতিকা-সুলভ বিনতি, হেয় ও ছলনাময় সাংসারিকতা, অপমান-সহনে নিশ্চেষ্ট কাপুরুষতা বাঙ্গালী চরিত্রের লক্ষণে দাঁড়াইয়াছে,—এই সকল পদদলিত গুল্ম ও তৃণের রাজ্যে তিনি শালতরুর ন্যায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। কতই না ঝঞ্ঝা তাঁহার মাথার উপর দিয়া

গিয়াছে—দিক্‌পালগণের বজ্র তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত ছিল, কিন্তু এই তৃণাচ্ছাদিত সমতলরাজ্যে এরূপ অনমনীয় দৃঢ়তা ও বিরাট তেজঃপুঞ্জ কোথা হইতে আসিল ? "ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ", এই বিদ্যুৎভরা ব্রাহ্মণ্য-দীপ্তি মৃত্তিকা-জাত নহে, ইহা স্বর্গের।

আশুতোষের চরিত্রের তেজ ও অমোঘ সাহসিকতার কথা তো অনেকেই লিখিয়াছেন। তিনি সরকারের সঙ্গে ব্যবহারে যে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, পরাধীন জাতির কোন লোক এরূপ অসম্ভব সাহস দেখাইতে পারে ইহা লোকের ধারণার অতীত ছিল, এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তাঁহার অসম সাহসের কথা প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই আসমুদ্রহিমাচলচিহ্নিত এই ভারতবর্ষ অতীব বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল। স্বাধীন দেশবাসীরাই বোধ হয় এই ঘটনায় তাঁহার প্রতি অধিকতর সম্মান দেখাইয়াছিলেন, কারণ স্বাধীন চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহারাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন।

সুতরাং ভবভূতিকথিত বজ্রাদপি চরিত্র দৃঢ়তার কথা আশুতোষ প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই গৌরবের সহিত ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তদীয় চরিত্রে "মৃদুনি কুসুমাদপি" কথার সার্থকতা কোথায় একথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

আমরা তাঁহার চরিত্রের সান্নিধ্য লাভ করিয়া বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছি ; আমরা তাঁহার হৃদয়-মাধুর্য্যের সংবাদ বিশেষভাবে অবগত আছি। তাঁহার চরিত্র বস্তুতঃ মধুচক্রের ন্যায় ছিল। আমরা অনেক নম্র ও বিনয়ী লোকের সন্ধান জানি, যাঁহাদের ওষ্ঠে হাসিটি লাগিয়া রহিয়াছে, যাঁহারা বীণা-নিক্কণে কথা কহিয়া থাকেন,

যাঁহারা ধনি-গৃহের হরিলুটের ন্যায় অজস্র অল্প দূরের মিষ্ট কথা বিলাইয়া যান, যাঁহাদের চরিত্র রমণীয়, চিত্ত সরস এবং কথা মধুরাক্ষরা। এই সমস্ত গুণ লইয়া অনেকেই সমাজে বিশেষ প্রশংসা পাইয়া থাকেন। কিন্তু আশুতোষের মাধুর্য্য এ ধাঁজের ছিল না। সে যেন হরিদ্বারের গঙ্গা, তাঁহা দুর্ভেদ্যশৈল ভেদ করিয়া নিজেকে জগতের কাজে বিলাইয়া দিবার জন্য স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়াছিল। যে গঙ্গা ঐরাবতকে ভাসাইয়া লইতে পারে, যাহার প্রচণ্ড ঘূর্ণপাকে শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাঁহারই ঘাটে ঘাটে এত লোকের ভীড় কেন? যে তেজস্বী বিরাটপুরুষের কথার দাপটে ও গুম্ফের আবর্ত্তনে শত শত বীরবরের হৃদয় কম্পিত হইত, যিনি "বাঙ্গালার ব্যাঘ্র" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বাড়ীর দ্বারে, বারাণ্ডায়, গৃহকোণে এত লোকের নিত্য ভীড় কেন হইত? আশুতোষের অপেক্ষাও ধনী লোক ছিলেন, তদপেক্ষাও ক্ষমতাশালী রাজপুরুষের অভাব দেশে ছিল না—তাঁহাদের কাছে তো প্রত্যহ এরূপ যাত্রীর আবির্ভাব দেখা যাইত না—অথচ এই কঠোরভাষী তেজস্বী লোকটির কাছে রোজ রোজ একটা বৃহৎ নিমন্ত্রণের মতন লোক সমাগম হইত কেন?

তাহার কারণ; আশুতোষের হৃদয়-মাধুর্য্য। নারিকেলের উপরিভাগের কাঠিন্য ছদ্মবেশ মাত্র, তাহার ভিতরের সন্ধান যে জানে সে কি কঠোর আবরণ দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? আশুতোষের হৃদয় সংগোপনে শত শত দুঃখী ও আর্ত্ত-দিগকে নিত্য আমন্ত্রণ করিত, এ জন্য এই রবাহুতের দল তাঁহার নিকট এমন করিয়া আসিয়া ধন্না দিয়া থাকিত। তাঁহার দয়া ছিল ফল্গু নদীর মত, বাহিরে নীরস ও উত্তপ্ত বালুস্তূপের ছদ্মবেশে

সেই দয়া নিজেকে লুকাইয়া রাখিত, তথাপি ভ্রমর যেরূপ সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পের সন্ধান জানে, আর্ত্ত ও ব্যথিত হৃদয় তাঁহাকে সেই-ভাবে চিনিত—একটা জায়গায় যে তাহাদের আশ্রয় ছিল, তাহা তাহারা মনে মনে বুঝিত। এই জন্যই ছিন্ন ও মলিন বেশ, দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মুখ, কপালে দুশ্চিন্তাঙ্কিত রেখা, এই সকল ছিল তাঁহার সহানুভূতি ও দয়া পাইবার উপায়। তিনি জানিতেন বাঙ্গালী বড় বিপন্ন, বাঙ্গালী পরিবার বড় দরিদ্র, এই বিপদ্ ও দারিদ্র্যের লক্ষণ দেখিলেই তিনি গলিয়া যাইতেন। তিনি যে ছিলেন দেবতা —এই জন্য মনের নিগূঢ় দুঃখ তিনি বুঝিতেন, এই জন্য দূর দূরান্তর হইতে সেই দরদী মহানুভব ব্যক্তির সন্ধানে এত লোক আসিত।

তিনি মিষ্ট কথায় ভুলাইতেন না, বৃথা আশা দিতেন না, কিন্তু বিপন্নকে আশ্রয় দিবার জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। যখন সরকারের সঙ্গে ঝগড়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা বেতন না পাইয়া মহাকষ্টে মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন সে কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাগিয়াছিল আশুতোষের। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিত। লজ্জা, ক্ষোভ ও সহানুভূতিতে ভরপূর—এই মহাশয়ের আত্মা যে এই বিপদে কিরূপ অশান্তি বোধ করিতেছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। অধ্যাপকদের বিপদ্ তিনি নিজের বিপদ্ হইতে কিছুমাত্র কম মনে করেন নাই। একটি ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাঙ্গালার দিনে জ্বরাক্রান্ত হইয়া পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইতে পারিল না। সে তাঁহার অসীম দৈন্য জানাইয়া আশুতোষের পা জড়াইয়া ধরিল, অমনি তিনি তাহার জন্য বিধান করিলেন। তখনও আই-এ পরীক্ষার কিছু দিন বাকী ছিল, তিনি ছাত্রটিকে আই-এর বাঙ্গালার

দিন পরীক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার অসীম দয়ার গুণে এই সমস্ত অসম্ভব রকমের উপায় তাঁহার মনে স্বতঃই উদ্ভাবিত হইত। অন্য কেহ ছেলেটির দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতেন, কিন্তু আশুতোষের দয়া শুধু মৌখিক ভদ্রতাসূচক প্রীতি জানাইয়া নিঃশেষ হইত না। কি ভাবে বিপন্নকে উদ্ধার করিতে হইবে, কোন করুণ কাহিনী শুনিলে তাহাই তিনি সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিতেন। সন্তান পিতামাতার কাছে দুঃখ নিবেদন করিলে যেরূপ তাঁহারা শুধু আদর করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকেন না সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হ'ন, আশুতোষের দয়া ও সহানুভূতি ছিল সেইরূপ—এই জন্য তাহা হরিদ্বারের গঙ্গার সঙ্গে উপমিত করিয়াছি। এই দয়া শুধু মুখের করুণ কোমল কথায় প্রকাশিত হইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত না, উহা শৈলকঠিন বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করিয়া পরহিতসংকল্পিত ছিল। এই দয়া কুসুমাদপি মৃদু ছিল। কিন্তু সেই কুসুম কোমল বল্লরী-জাত নহে, তাহা বকুলপুষ্পের ন্যায় বিরাট মহীরুহসঞ্জাত। ইহা বীরত্বের রসে পুষ্ট, ইহা কার্যকরী শক্তির নিয়োগে সার্থক। এই দয়া বহুলোক লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন ইহা শুধু কথার ফন্দী ও কর্ম্মহীন প্রীতির মনভুলানো বৃথা গুঞ্জরণ নহে, ইহা সতত সচেষ্ট হিতব্রতের অমৃতময় ফুল-ফল। ইহা ছিল খর্জ্জুর বৃক্ষের রসের ন্যায়, বাহির হইতে অনেকে তাহা বুঝিতে পারিত না।

আশুতোষের জগতে কেহ বন্ধু ছিলেন বলিয়া আমি জানি না। 'গলাগলি ভাব' 'হরিহরাত্মা' প্রভৃতি কথা দ্বারা যাহা বুঝা যায় আশুতোষের সেইরূপ বন্ধুত্ব কাহারও সঙ্গে আমি দেখি নাই।

তিনি বন্ধুমহলে হাস্য পরিহাসে সময় সময় যোগ না দিতেন, এমন নহে, কিন্তু তাঁহার বান্ধবতা ও প্রীতিতে সর্ব্বদা একটা সংযমের ভাব থাকিত। এই সংযমের দরুণ, তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবেরাও তাঁহার সঙ্গে অবাধভাবে মিশিতে পারিতেন না। শিশুরা জানে—পিতা তাহাদিগকে ভালবাসেন, কিন্তু তথাপি তাহার সঙ্গে অবাধ ভাবে মিশিতে ভয় পায়। আশুতোষ ছিলেন সেইরূপ পিতৃকল্প চরিত্র, তাঁহার বন্ধুবান্ধব যতই প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ হউন না কেন, তাঁহার এই কঠোর চরিত্র-সংযমকে সর্ব্বদা একটা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন এবং তজ্জন্য খুব অবাধভাবে মেলামিশি করিতে সাহসী হইতেন না। যে গুরুদাস বাবু তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে আদর করিয়া আসিয়াছিলেন, যে ব্রজেন্দ্র শীল প্রবীণতায় অনন্যসাধারণ, ইঁহারা এবং এতৎসদৃশ মহানুভব ব্যক্তিগণও আশুতোষকে এই চরিত্র মহাত্ম্যের জন্য সম্ভ্রম করিয়া আসিয়াছেন। এমন লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি, যাঁহারা পরম নিশ্চিন্ততার সহিত তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে সাহসী হইতেন। তিনি আসিয়াছিলেন, স্বর্গ হইতে সনদ লইয়া—লোকশিক্ষার জন্য, অধীন পরপীড়িত জাতীকে স্বাধীন-চরিত্র মাহাত্ম্য শিখাইবার জন্য। তাঁহার চারিদিকে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না, তাঁহার অবাধ বান্ধবতার যোগ্য ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের সাহেবদিগের মধ্যেও আমরা কাহাকে দেখি নাই, চণ্ডী-মঙ্গল বর্ণিত কালকেতু ব্যাধের ন্যায় তিনি "শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল" বঙ্গীয় সমাজে অতিমাত্রায় প্রবীণতা-সম্পন্ন ছিলেন।

কি সমাজ, কি রাজনীতিক্ষেত্রে কোথাও আশুতোষ দাসখৎ লিখাইয়া নিজের আত্মার অমর্য্যাদা করেন নাই। নিজ কন্যা কমলার বিবাহ তিনি যে দিন দিয়াছিলেন, সেদিন ঘরে বাহিরে

তাঁহার প্রতিপক্ষের অভাব ছিল না। কিন্তু গাণ্ডীবী যে মুহূর্ত্তে শরাসন গ্রহণ করিয়াছেন, সে মুহূর্ত্তে বিপক্ষ অক্ষৌহিণী কি করিবে? এমন যে তাঁহার "নিকষ" কুলের মর্য্যাদা, তাহার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। "সত্যমেব জয়তি" এই মহামন্ত্রে তাঁহার দীক্ষা ছিল, সত্যের মর্য্যাদা যিনি স্বীকার করিয়াছেন, তিনি রাজসম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিগত গৌরব এ সকলের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইবেন কিরূপে?

আশুতোষের ন্যায় ধর্ম্মভাবযুক্ত লোক আমাদের সমাজে বিরল। তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের এই গুণ ছিল যে তাহা অতি অনাড়ম্বর এবং একান্তভাবে নীরব ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে একদিনও বক্তৃতা বা দীর্ঘ উপদেশ দিতে শুনি নাই কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস যে কত দৃঢ় ছিল তাহা মাঝে মাঝে দুই একটি কথায় ব্যক্ত হইত। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রাজকীয় রোষের ভীষণ ঝঞ্ঝা ও বজ্রাগ্নি, যখন দুর্নিবার ঘূর্ণচক্রে পড়িয়া আমাদের বিদ্যাতরণী ডুবন্ত, যখন অন্য কোন কাণ্ডারী হইলে হাল ছাড়িয়া দিয়া আরোহিগণকে নিরুৎসাহ করিত, সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের নিকট আমি নিরুপায় ভাবে বিপদের কথা উল্লেখ করায় তিনি তাঁহার সর্ব্বত্রবিজয়ী সেই অগাধ বিশ্বাসময় হাস্যরশ্মিতে গুম্ফ মণ্ডিত করিয়া বলিলেন—"ভয় কি দীনেশবাবু, আমাদের কাজ করিবার কথা, সেই সর্ত্তে জগতে আসিয়াছি। ফল দেবার ভার অপরের, তাই ভাবিয়া নিজের কাজ সমাধা করুন এবং মিছামিছি দুশ্চিন্তা করিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করিবেন না।" শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মের উপর এবং কর্ম্ম-ফল-দাতার উপর এরূপ অগাধ বিশ্বাস আমি আর কোথাও দেখি নাই। অনেক ধর্ম্মবক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়াছি কিন্তু কোন্ মহাত্মা আশুতোষের

ন্যায় এতবড় কর্ম্মী হইয়াও এরূপ বিশ্বাসী ? দুর্গা পূজার সময় গরদপরিহিত এই বিরাট্ পুরুষ স্ফুটকণ্ঠে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা চণ্ডী-পাঠ করিতেন। যে ব্যক্তি সমাজে বিধবা-বিবাহ চালাইতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, যিনি সাহেব মহলে স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও অলৌকিক যুক্তিবলে নিজের খ্যাতি অসামান্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি বিজ্ঞানের তুঙ্গমন্দিরে আরোহণপূর্ব্বক বর্ত্তমান কালের সমস্ত তথ্য অবহিত ছিলেন, তাঁহার চণ্ডীপাঠকালে ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠ ও অকপট হৃদয়াবেগ দর্শনে কে না মোহিত হইয়াছেন!

তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ এবং কর্ম্মশীলতায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কর্ম্মঠতার কি অক্লান্ত ইঞ্জিনই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন! প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁহার নিকট ফল-প্রসবী ছিল। তিনি তাঁহার স্বল্পায়তন জীবনটির একটি দণ্ড অপব্যবহারে কিংবা বৃথা অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারিবে না। তাঁহার জীবন ছিল কর্ম্মের মহোৎসব, এই উৎসবের বিরাম ছিল না। শত শত যাত্রী লইয়া যেরূপ রেলগাড়ী দিবারাত্রি চলিয়া যায়, শত শত কর্ম্মী লইয়া এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি সেইভাবে বিহার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ভগবান্ পীড়াগ্রস্ত করিয়া রোগ-শয্যায় আবদ্ধ রাখিয়াও কিছুদিন অবসর দেন নাই। তাঁহার স্মৃতিশক্তির কথা বলিয়াছিলাম; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত গ্রাজুয়েটের তিনি খবর রাখিতেন। তিনি গুণের আদর এরূপ জানিতেন যে, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন কিংবা অন্য কোন উপায়ে গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিভা-উন্মেষের জন্য তিনি আশাতীতরূপে সুবিধার সৃষ্টি করিয়া দিতেন। যে সকল গুণ এই হতভাগ্য দেশে কোন

ক্রমেই বিকাশ পাইবার সুযোগ লাভ করিত না, যাহা রৌদ্রতাপে বিশুষ্ক কোরকটির ন্যায় অকালে ঝরিয়া পড়িত, সেই সকল গুণ তাঁহার হিতকামী নিত্যবর্ষী উৎসাহধারা সিঞ্চনে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করার পক্ষে সুপারিশি চিঠির কোন মূল্যই ছিল না। ভাদ্রমাসের চন্দ্রিকা যেরূপ নদীর গভীরতম তলদেশ পর্য্যন্ত দেখাইয়া থাকে, তাঁহার খরদৃষ্টি সেইরূপ লোকচরিত্রের নিগূঢ়তম তত্ত্ব তাঁহার নিকট প্রকটিত করিত। এই জন্য দেখিয়াছি অতি অল্প সময়ের আলাপেই তিনি কোন কোন লোকের এরূপ পক্ষপাতী হইয়াছেন যে, জীবন ভরিয়া তাঁহার উপকার করিয়াছেন, অথচ অনেক সময় বড় বড় রাজা মহারাজার সুপারিশি-পত্র তিনি উপেক্ষার সহিত আবর্জ্জনা ফেলিবার পাত্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কেহ কাণে কাণে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া কোন কালেই তাঁহার প্রশ্রয় পায় নাই। তিনি নিজে স্বচক্ষে দেখিয়া ও স্বকর্ণে শুনিয়া লোক চরিত্রের বিচার করিতেন, অপরের কথায় হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করিয়া কাহারও প্রতিকূলতা করিতেন না। যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, সে দিক্ দিয়াই তাঁহার অলোকসামান্য গুণ-গরিমা হৃদয় মোহিত করিয়া ফেলে। তিনি এক মহাসাম্রাজ্য গঠনের উপযোগী শক্তি লইয়া আসিয়াছিলেন; এই হতভাগা বঙ্গদেশ তাঁহার পক্ষে অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছিল। তথাপি তিনি নানা বিরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে বিদ্যার একটি সার্ব্বজনীন কেন্দ্রে পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। লামার মন্দির-চূড়ানিন্দিত টুপি, মহারাষ্ট্রার নানাবর্ণানুরঞ্জিত পাগড়ী, সিরাজের বিপুলায়তন স্বর্ণকারুকার্য্যোজ্জ্বল শিরোভূষণ, সাহেবদের সোলার

হ্যাট ও শ্রমণের গৈরিক আলখাল্লা তিনি একস্থানে জড় করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ব্বজনীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জগতের প্রাচ্যবিদ্যার মহাকেন্দ্র হইবে, এই মহা কল্পনা তাঁহার চিত্তে উৎসাহ ও বাহুতে বল দিয়াছিল। হায়! আজ গাণ্ডীবীর গাণ্ডীব—শিবের মহাধনু পড়িয়া আছে, কে ইহাতে জ্যা আরোপণ করিবে? কাহার সে ক্ষমতা আছে?

আশুতোষকে মনে পড়িলে, বোধ হয় যেন বঙ্গদেশের বজ্র, বিদ্যুৎ, জলভরা মেঘ ও শস্য-শ্যামল প্রকৃতির পুঞ্জীভূত শক্তি—বিরাট্ মানবরূপে প্রকাশ পাইয়া এই দেশের যাহা মিথ্যা তাহা নষ্ট করিয়া দেশহিতের অজস্রবর্ষণ দ্বারা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে ইষ্টসিদ্ধি পূর্ব্বক বঙ্গীয় সমাজকে নানা দিকে উর্ব্বর করিয়া গিয়াছে। বহুযুগের তপস্যা না থাকিলে কোন জাতিতে এরূপ লোকের আবির্ভাব হয় না, এবং বহুযুগের পাপ না থাকিলে কোন জাতি এরূপ লোকের সংসর্গ হইতে এমন আকস্মিকভাবে বঞ্চিত হয় না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

হজরত মোহাম্মদ

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব জাতি সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল। এই সময় আরবজাতি বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল সম্প্রদায় স্ব স্ব প্রধান ছিল; একে অন্যের আধিপত্য স্বীকার করিত না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র অধিপতি ছিল। তাঁহারা বংশানুক্রমে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু প্রজারঞ্জনই অধিপতিগণের প্রভুত্বের মূলভিত্তি ছিল। শাসনকার্য্যেও তাঁহাদিগকে প্রজার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। কোন বিজাতীয় শত্রু আরবদেশের দ্বারদেশে উপনীত হইলে অধিপতিগণ সম্মিলিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন। কিন্তু দেশমধ্যে এক দণ্ডের জন্যও আত্মকলহের বিরাম ছিল না। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিত। আরব দেশীয় লোকের বীরত্বের অভাব ছিল না। ব্যাঘ্রের বলের সঙ্গে তাহাদের বীরত্বের তুলনা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহবর্দ্ধন, নররক্তে পৃথিবীরঞ্জন এবং দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনই তাহাদের বীরত্বের সার্থকতা ছিল। এই সময় আরবদেশ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। দাম্পত্য বন্ধন অত্যন্ত শিথিল এবং নৈতিকজীবন ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল। নরনারী সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া কাবা মন্দিরের * চতুর্দ্দিকে

আরব জাতি।

* আরব দেশের সর্ব্বপ্রধান ভজনালয়। একেশ্বরবাদের আদি-প্রবর্ত্তক ইব্রাহিম এই মন্দির স্থাপন করেন; এক এবং অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের

উলঙ্গভাবে নৃত্য করিত। পুরুষসমাজের পশুবৎ আচরণে নারীজাতির দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তৎকালের আরব সমাজের ধর্ম্মজীবন নৈতিকজীবন অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় ছিল। কাষ্ঠ এবং লোষ্ট্রও দেবতা বলিয়া পূজিত হইত। এক কোরেশ সম্প্রদায়েরই দেবতার সংখ্যা পনের শতের ন্যূন ছিল না। এ ধর্ম্ম কুসংস্কারবিদ্ধ ও আত্মার অবনতিকর হইলেও আরবগণের ধর্ম্মবিশ্বাস সুগভীর ছিল। তাহাদের প্রকৃতি সাতিশয় তেজস্বিনী ছিল। তেজস্বিনী প্রকৃতির সঙ্গে সুগভীর ধর্ম্মবিশ্বাস সম্মিলিত ছিল বলিয়া আরবগণ ধর্ম্মের নামে অনেক সময় উন্মত্ত হইয়া উঠিত।

আরবদেশের ঈদৃশ দুরবস্থার সময় ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মহাপুরুষ মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। মোহাম্মদের জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বেই তদীয় পিতার দেহান্তর হইয়াছিল। মোহাম্মদ কোরেশ সম্প্রদায়ের হাশিমবংশসম্ভূত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম আমিনা। আমিনা রূপবতী, গুণবতী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তিনিও মোহাম্মদের অতি শৈশবকালেই পরলোক গমন করেন। পিতৃমাতৃহীন

পূর্ব্বপুরুষ।

মোহাম্মদের লালনপালনের ভার তদীয় বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মুতালিবের উপর পতিত হয়। বৃদ্ধ আবদুল মুতালিবের হৃদয় বড় স্নেহপ্রবণ ছিল। মোহাম্মদের পিতার নাম আবদুল্লা; আবদুল্লা অতি সজ্জন ছিলেন। তিনি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র এবং তাঁহার শেষ বয়সের স্নেহ-পুত্তলি ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বৃদ্ধ পিতার হৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়া

উপাসনার জন্যই এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে আরববাসীরা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া উঠে, এবং কাবা মন্দিরে বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের পূজা করিতে আরম্ভ করে।

পড়ে। তাঁহার তাদৃশ মর্ম্মভেদী শোকের সময় মোহাম্মদের সুন্দর সহাস্য মুখ শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। শিশুর ভাবভঙ্গী, আকার প্রকার বৃদ্ধের স্মৃতিতে বালক আবদুল্লাকে জাগাইয়া দিত। তিনি শিশুর মুখে চোখে আবদুল্লার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া নয়নের বারি নয়নেই নিবারণ করিতেন। তিনি পরিজনদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, তোমরা মোহাম্মদকে সযত্নে প্রতিপালন করিও। এই সুন্দর শিশুই আমার বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। দুর্ভাগ্যক্রমে মোহাম্মদ বাল্যকালেই স্নেহশীল প্রতিপালক পিতামহকেও হারাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে পৌত্রকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুতালেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। আবুতালেব ন্যায়বাদী এবং ধীমান্ ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিপালন জন্য আরবদেশের তৎকালোচিত কোন বন্দোবস্তেরই ত্রুটি করেন নাই। তিনি তাঁহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন।

আবুতালেবের আশ্রয়ে মোহাম্মদের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়; তিনি কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই বাণিজ্যোপলক্ষে সিরিয়া রাজ্যে গমন করেন। সিরিয়া গমনকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক ছিল না; বিজাতীয় ভাষার বিন্দু বিসর্গও তাঁহার বোধগম্য ছিল না। একারণ সিরিয়ার সমস্তই তাঁহার নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

প্রথম জীবন।

তথাপি এখানেই খৃষ্টবিশ্বাসীদের সংসর্গে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। এখানে তাঁহার তরল হৃদয়ে যে ভাববীজ উপ্ত হয়, তাহাই কালক্রমে ক্রমবিকাশের নিয়মে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংসার-তাপক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীর আশ্রয়স্থল ছায়া-শীতল মহামহীরুহে পরিণত হয়।

কোন বিদ্যালয়ে মোহাম্মদের শিক্ষা-লাভ হয় নাই। তাঁহার আবির্ভাবকালে আরবদেশে লিখন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু উঁহার শৈশবাবস্থা তখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। মোহাম্মদ লিখিতে পারিতেন না। প্রকৃতির গ্রন্থপাঠেই তাঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছিল। কিন্তু এই অনন্ত বিশ্বের যে কণামাত্র প্রত্যক্ষভাবে তদীয় দৃষ্টির গোচরীভূত হইত, প্রকৃতির রহস্য নির্ণয় জন্য তাহাই তাঁহার আয়ত্ত ছিল, তদতিরিক্ত ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবেশপথ রুদ্ধ ছিল। মানব মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত গ্রন্থরাজি তাঁহার জ্ঞান-সম্পদ পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে নাই। পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার তাঁহার নিকট অর্গলবদ্ধ ছিল; নিঃসঙ্গ মোহাম্মদ মরুস্থলীপূর্ণ আরবদেশের ক্রোড়ে নিজের চিন্তা ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য লইয়াই আবিষ্ট থাকিতেন, এবং এই তন্ময়তাই তাঁহার চিত্তবিকাশের সেতুস্বরূপ হইয়াছিল।

মোহাম্মদ বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কার্য্য, বাক্য ও চিন্তা সকলই সত্যানুপ্রাণিত ছিল। তিনি কখনও নিরর্থক বাক্যব্যয় করিতেন না। তিনি যাহা কিছু বলিতেন, তাহাই কার্য্যোপযুক্ত, জ্ঞানগর্ভ এবং সারল্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। অকাপট্য, গাম্ভীর্য্য ও আন্তরিকতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিতে অমায়িকতা, বন্ধুবাৎসল্য এবং রঙ্গরসেরও অভাব ছিল না। আদ্যকালের মোহাম্মদকে স্মরণ করিলে আমাদের মানসপটে একটী সুন্দর নবীন যুবকের চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে। এ যুবকের সর্ব্বাঙ্গ জীবিকা-অর্জ্জনের পরিশ্রমে স্বেদসিক্ত, চিত্ত নবাগত ভাবের আবেশে অশান্ত, হৃদয় পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার অভাবে অমার্জ্জিত; কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় এবং তেজোদীপ্ত।

মোহাম্মদ যৌবনে পদার্পণ করিয়া খাদিজা নাম্নী ধনবতী বিধবা রমণীর কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত হন। তিনি তাঁহার কার্য্যে পুনর্ব্বার সিরিয়া রাজ্যে গমন করেন। সেখানে তিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশ্বস্তভাবে যোগ্যতা-সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা খাদিজার হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল, এই শ্রদ্ধা ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয়। খাদিজা অতি গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে মোহাম্মদের হৃদয়-তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব রাগিণী বাজিয়া উঠে। তৎকালে তিনি পঞ্চবিংশতি বর্ষের যুবক; খাদিজার বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু গুণমুগ্ধ মোহাম্মদ বয়সের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই যে প্রেমের অভিসিঞ্চনে মোহাম্মদের হৃদয় ফুলের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহা যতদিন খাদিজা জীবিতা ছিলেন, ততদিন একদিনের জন্যও মলিন হয় নাই। তাঁহাদের প্রেমসিক্ত হৃদয় সর্ব্বক্ষণ সদ্যোবিকশিত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় সৌরভপূর্ণ থাকিত। সেই শিথিলবন্ধন দাম্পত্য-প্রেমের যুগে মোহাম্মদের একনিষ্ঠ প্রেম বিস্ময়ের বিষয় ছিল।

প্রথম পরিণয়।

ধনবতী খাদিজার সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় মোহাম্মদের অর্থের অভাব বিদূরিত হইয়াছিল; তিনি বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন জন্য কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হন। সৃষ্টিরহস্যের অন্তস্তলে কোন্ মহাশক্তি বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ কি, মানবের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদের আবর্ত্তন কোন্ কারণে হইয়া থাকে, বিপুল

ইস্‌লাম।

বিশ্বের নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্র কোথায় নিহিত আছে, এই সব তত্ত্বানুসন্ধানেই তিনি ধ্যানরত তাপসের ন্যায় সমাহিত হইতে আরম্ভ করেন। তিনি এরূপ এক সৌন্দর্য্যালোকের আভাস পাইয়াছিলেন, যেখানে সমস্ত বিশ্বের অসংখ্য ধ্বন্যাত্মক সঙ্গীত এক মহাশক্তির পদতলে লয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রোতামাত্রেরই হৃদয় পুলকাবিষ্ট করিতেছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য্যালোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্যই তিনি অহোরাত্র ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এই ভাবে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়। মোহাম্মদ ৬০৯ খৃষ্টাব্দের রমজান মাসে নির্জ্জন গিরিকন্দরে আত্মচিন্তা করিতে মক্কার নিকটবর্ত্তী হরপর্ব্বতে গমন করেন। খাদিজা তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহারা হরপর্ব্বতে একমাস অবস্থান করেন। এই সময় মোহাম্মদ একদা খাদিজাকে আনন্দবিহ্বল হইয়া বলেন, "আমি পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় কৃপা লাভ করিয়াছি, আমার সমস্ত সংশয় অন্ধকার বিদূরীত হইয়াছে, আমার মানসনয়নে এক অপরূপ আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। কাবামন্দিরের দেবমূর্ত্তি সকল নির্জ্জীব পদার্থ মাত্র। পরমেশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য। তিনি মহান্, জীবন্ত ও সত্যস্বরূপ। পরমেশ্বরই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা।" মোহাম্মদের ধ্যাননিরত অনন্যসাধারণ হৃদয়ে এই মহাসত্য প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে বিমল আনন্দরসে পরিপ্লুত করিল; তিনি মনুষ্য মাত্রকেই এই আনন্দের অংশী করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি একেশ্বরবাদ ও বিশুদ্ধ নীতি প্রচার করিতে উত্থিত হইলেন। এই নব ধর্ম্মের নাম ইস্লাম। প্রথমে ইস্লাম অতি মন্দগতিতে আরবসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, মোহাম্মদ লোকলোচনের অন্তরালে নির্জ্জনে কতিপয় অন্তরঙ্গ নবীন যুবককে

ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। একাদিক্রমে তিন বৎসরকাল ধর্ম্মপ্রচারের পরও তাঁহার শিষ্যসংখ্যা চল্লিশের অধিক হয় নাই।

মোহাম্মদের অন্যতম শিষ্যের নাম আবুবকর ছিল। আবুবকরের ধর্ম্মোৎসাহ সাতিশয় প্রবল ছিল। তিন বৎসর পরে ইস্‌লামধর্ম্মবিশ্বাসীর সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ হইলে তিনি প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য মোহাম্মদকে অনুরোধ করিলেন। প্রিয়তম শিষ্যের ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া মোহাম্মদ সর্ব্বজন সমক্ষে স্বীয় ধর্ম্মমত ঘোষণা করিবার জন্য আরবদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় কাবামন্দিরে গমন করিলেন। আবুবকর প্রথমতঃ একেশ্বরবাদের মহিমা বর্ণনা করিয়া তারপর পৌত্তলিকধর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করিলেন। উগ্রস্বভাব আরবগণ স্বধর্ম্মের নিন্দা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া বিধর্ম্মীদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কাবামন্দিরে কোলাহল উত্থিত হইল। দয়ার্দ্রচিত্ত তমিম্ পরিবারের লোকেরা দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিল। তাহাদের তাদৃশ সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে মোহাম্মদ ও তদীয় অনুচরবর্গের প্রাণনাশ ঘটিত।

প্রথম প্রচার।

মোহাম্মদের প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম উদ্যম এইরূপ শোচনীয় হইয়াছিল। কিন্তু মোহাম্মদ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ ভগ্নোৎসাহ হন নাই। এই ঘটনার পর কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলেই তাঁহারা পুনর্ব্বার নবোৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। একে একে শিষ্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

অভাগিনী জন্মভূমির মুখের পানে চাহিয়া জড় হৃদয় পাষাণও কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু সেই শ্যামল স্নেহে চির-বর্দ্ধিত সন্তানের কোমল হৃদয় ত কাঁদে না। শ্যামলা জননীর প্রস্ফুটিত হাসিমুখ আমরা আর দেখিব না, জননীর হৃদয় শোষণ করিয়া মৃত্যু চলিয়া গিয়াছে। সে বিকশিত প্রাণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার চারিপার্শ্বে আজ রোগ শোক জরা, অন্ধকার পিশাচের রুধিরোন্মত্ত চীৎকার, বেদনা-কাতর মুমূর্ষুর হাহাকার বিলাপ। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, শান্তিনিকেতন মাতৃক্রোড়ে অরণ্যের পশু ঘর বাঁধিয়াছে ; রৌদ্রপীড়িত ক্ষুধাকাতর সন্তানেরা প্রবৃত্তির ছলনায় পরস্পরকে বঞ্চিত করিয়া অসীম সুখলাভ করিতেছে—দরিদ্রা মায়ের কথা হৃদয়ে আর ঠাঁই পায় না। আজি একবার আত্মবিচ্ছেদ ভুলিয়া, উচ্চনীচ অহঙ্কার অভিমান ভুলিয়া, এক হৃদয়ে যদি আমরা মায়ের পূজা করিতে পারি, কাল প্রভাত-কিরণে হাসিমুখে অন্নপূর্ণা অন্ন ঢালিয়া দিবেন—ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহিতে হইবে না। জননী জন্মভূমির শুষ্ক হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে ; সে হৃদয়োচ্ছ্বাসে যে অমৃত ঝরিবে পান করিয়া তাহা কেহ নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এ রক্তের নদী বহিবে না, এ কঙ্কালের স্তূপ জমিবে না। হিমাচল-নিঃসৃতা শান্তিবারি পান করিয়া পৃথিবী শীতল হইবে।

আমাদের জন্ম দিয়া পুণ্যভূমি চির-দুঃখিনী। ভিখারীর মত আমরা পদে পদে পরের দুয়ারে মান ভিক্ষা করিতে যাই—স্বজাতিকে

পদ-দলিত করিয়া, সহোদরের মস্তক অবনত করিয়া, মাতার নাম কলঙ্কিত করিয়া, আমরা মনে করি, মান বাড়িল। পরে দেখিয়া হাসে, আমরা ভাবে গদগদ হই। দরিদ্রা জননীর কাছে শতবার প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলে অপমান নাই, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা পূর্ণ হইলেও অপমান ঘুচে না। সেখানে স্নেহের বন্ধন নাই, প্রেমের টান নাই, আদুরে ছেলের মত কথায় কথায় আবদার করিতে গেলে শুনিবে কে? দুই একবার ভিক্ষা মিলিবে, তাহার পর উপহাস বিদ্রূপ, অবশেষে সম্মার্জ্জনী। ভিক্ষা জীবনের মূল-ভিত্তি হইয়া উঠিলে এ জীর্ণ কঙ্কাল প্রতিদিন শীর্ণ হইবে বৈ উন্নতি করিবে না। ক্ষণিক সুখমোহে জীবনের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ক্রন্দন থামিয়া আসিবে, কিন্তু হাসি ফুটিবে না, বাক্য স্তব্ধ হইবে, কিন্তু নয়নে আনন্দজ্যোতি প্রকাশ পাইবে না, ধীরে ধীরে অবসান ঘনাইয়া আসিবে। এ ভারতভূমিতে তাহা হইলে চিতা আর নিভিবে না; চারিদিকে শ্মশান শবদাহ, শৃগাল কুক্কুরের যুদ্ধ, শকুনি-গৃধিনীর পাল বিরাজ করিবে।

অভাগিনীর কপালে কি আছে কে জানে? যেখানে মাতার শীর্ণদেহ ম্লান মুখ দেখিয়া সন্তানের হৃদয়ে শোক উথলে না, অত্যাচার-প্রপীড়িত ভ্রাতার কাতর ক্রন্দনে হাই উঠিয়া থাকে, পরের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য সন্তানেরা পরস্পরের বিপক্ষে দাঁড়াইতে সম্মত হয়, সেখানে মঙ্গলের আশা কোথায়? মাতার দারিদ্র্য দেখিয়া যেখানে সন্তান আপনাকে ধনী মানী বিবেচনা করিতে পারে, যেখানে তুচ্ছ স্বার্থের জন্য দুই বেলা মিথ্যা সম্মানিত হয়, সামান্য পৃষ্ঠ থাবড়ানিতে সমস্ত অপমান জ্বালা ঘুচিয়া যায়, সেখানে মঙ্গল আসিতে চাহে না। জন্মভূমি জননীর সম্মানেই আমাদের সম্মান, জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিতেই

আমাদের শ্রীবৃদ্ধি। আমরা যথন জননীকে ভক্তি করিতে শিখিব, অপরে তখন তাঁহাকে তাচ্ছীল্য করিতে সাহস করিবে না। সেদিন প্রভাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া শুনিবে ভারতবর্ষের বুকের মধ্য হইতে এক সুরে মায়ের নাম উঠিতেছে—সন্তানেরা মা বৈ আর জানে না, মায়ের নামে সকলই এক। সেদিন কলহ বিবাদ থাকিবে না, সমস্ত পৃথিবীকে আমরা ভায়ের মত আলিঙ্গন করিতে পারিব—পৃথিবী আমাদের নিকট সরিয়া আসিবে।

আজ একবার মায়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখ, আপনাদের দারিদ্র্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। মায়ের করুণ আঁখির পানে একবার চাহিয়া দেখ, হৃদয় পুলকে পূরিয়া উঠিবে। ঐ স্নেহ-মধুর অধরে আজ কেন বিষাদের রেখা ফুটিয়াছে? ঐ পবিত্র সৌন্দর্য্যে লোকের ছায়া পড়িয়াছে? সে শুভ্র উষার মত কান্তি ম্লান, যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবমূর্ত্তি বিষণ্ণা। অন্নপূর্ণার অন্ন সন্তানেরা আর দেখিতে পায় না। অবনতমুখে জননী সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। দুর্ব্বল সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া জননীর চোখের জল ভিন্ন দিবার আর আছে কি? সন্তানেরা আপনার মধ্যেই কলহ করিতেছে; ভাইকে বঞ্চিত করিয়া ভাই বড় হইতে চায়। ন্যায়ের পথে না চলিলে এখন আর উপায় নাই—সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। জন্মভূমি! ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবি ভারতি! দুর্ব্বল সন্তানের হৃদয় তোমার পবিত্র ভাবে পূর্ণ কর। সেথানে মহত্ত্বের বীজ অর্পণ কর মা, অনেকতা একতায় পরিণত হোক্। মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে সন্তান যেন পশ্চাৎপদ না হয়।

অতীত স্মৃতির স্বপ্নে ভোর হইয়া ঘরের কোণে কানাকানি করিলে চলিবে না, মায়ের পূজা করিতে হইবে। ভীষ্মদ্রোণের নাম

লইলে হইবেনা, হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব অনুভব করা চাই। ভগবানের নামে বাধাবিপত্তি কাটিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের শূন্য মন্দিরে আমরা পুনরায় মায়ের প্রতিষ্ঠা করিব। চারিদিক হইতে এখানে লোকে মাতৃভক্তি শিখিতে আসিবে। এখানে আসিয়া সকলে স্বাধীনতা শিক্ষা করিবে—নরহত্যা শিখিবে না। শিখিবে, মায়ের সেবা করিতে; শিখিবে, সত্যের সম্মান রাখিতে। ভারতীর বীণাধ্বনি জগতে ব্যাপ্ত হইবে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নামে শত শত উন্নত শির নত হইয়া থাকিবে। আমাদের গৃহে সেদিন মায়ের প্রতিষ্ঠা।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"শাহ্নামা"-রচনা

ফেরদৌসীর গুণ-গরিমা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার নবজাত-কাব্য-কাননের সুরভিত সমীরণ দেশ-দেশান্তরে প্রবাহিত হইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেছে। দীনের কুটীরে, মধ্যবিত্তের ভবনে, ধনীর সৌধে, রাজার প্রাসাদে আজ ফেরদৌসী সমভাবে বিদ্যমান—সর্ব্বত্রই শতমুখে তাঁহার নির্ম্মল যশোগীতি কীর্ত্তিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কবির পক্ষে এতদপেক্ষা পরম সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে ? এদিকে গজনীপতি সুলতান মাহ্মুদও তাঁহার অনন্যদুষ্কর কবিত্ব-শক্তির প্রশংসাবাদ ইতিপূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রবণ অবধি তিনি সেই অতুলনীয় কীর্ত্তিমান্ অমর কবিকে রাজধানী গজনীতে আহ্বান করিয়া আনিয়া আপনার রাজসভা সমলঙ্কৃত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ সমুপস্থিত। সুলতান কবিবর ফেরদৌসীকে গজনী-রাজসভায় পাঠাইয়া দিবার জন্য খোরাসানের তাৎকালিক শাসনকর্ত্তাকে অনুজ্ঞা-পত্র প্রেরণ করিলেন। ফেরদৌসী সেই লিপির মর্ম্মাবগত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধির মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত জ্ঞানে পরম পুলকিতান্তরে বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর আত্মীয়-বান্ধবের নিকট বিদায় লইয়া আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি অগোপে গজনী-যাত্রা করিলেন।

এ জগতে শুভ কার্য্যের অন্তরায় অনেক ! শুভর পশ্চাতে অশুভ, আলোকের পশ্চাতে অন্ধকারের ন্যায় প্রতিনিয়তই পরিভ্রমণ

করিতেছে। তুমি বুঝিতে পারিবে না, জানিতে পারিবে না, দেখিতে পাইবে না, তোমার সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোন্ সূত্রে তোমার অনিষ্টের ভীষণ জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। কে বলিতে পারে, কখন্ কৌমুদী-বিধৌত নির্ম্মল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইবে? যখন কবিপ্রবর ফেরদৌসীকে তুস্ নগর হইতে গজনী-রাজধানীতে প্রেরণার্থ খোরাসানের শাসনকর্ত্তাকে পত্র লিখিত হয়, সেই সময় বদরউদ্দীন নামক জনৈক সভাসদ্ সুলতান-দরবারে উপস্থিত ছিলেন। বদরউদ্দীনের সহিত অন্যতম রাজকবি আন্সারী ও রুদকীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বন্ধুদ্বয়ের মঙ্গল-কামনায় গোপনে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—"দেখিতেছ কি, তোমাদের সৌভাগ্য-শশী তমসাবৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তুস্-নগরে জনৈক অলৌকিক গুণ সম্পন্ন প্রসিদ্ধ কবি আছেন, তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অতুলনীয়। সম্রাট তাঁহাকে গজনীতে আনয়নার্থ সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আসিয়া 'শাহ্নামা' প্রণয়নপূর্ব্বক বাদশাহের অনুগ্রহ-ভাজন এবং চিরদিন সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং তদ্দ্বারা তোমাদের আশা ভরসা বিলুপ্ত এবং ভাবী উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তোমরা আমার পরম বন্ধু। বন্ধুর ক্ষতিতে বন্ধুর অন্তরে আঘাত লাগে। এই জন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দিতেছি। যদি আত্মোন্নতির পথ পরিষ্কার রাখিতে চাও, যদি রাজানুগ্রহ লাভে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমরা অবিলম্বে ইহার প্রতিবিধান করিতে শৈথিল্য করিও না।"

কবিদ্বয় সহসা এই অশিব সংবাদ শ্রবণে অতীব চিন্তিত হইলেন। তাঁহাদের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ভাবী অনিষ্টের বিষয়

ভাবিয়া মুখ মলিন, হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। কি করিবেন ? ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। ফলে বুঝিলেন, তুসীয় কবির আগমন প্রতিরোধ করাই তাঁহাদের মঙ্গলের একমাত্র নিদান। কিন্তু কিরূপেই বা সেই আগমনোন্মুখ পুরুষকে নিরস্ত করা যায় ? কোন্ পথ অবলম্বন করিলে, কোন্ হেতু দর্শাইলে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সিদ্ধ হইতে পারে ? কাহার স্কন্ধে দুইটা মস্তক আছে—কে এমন অমিতসাহসশীল যে, তুসীয় কবির গজনী আগমনের আবশ্যকতা নাই বলিয়া সুলতান-সমীপে প্রস্তাব উত্থাপন করে ? পরন্তু এ কার্য্য না করিলেও শুভ নাই। এইরূপ বিবিধ চিন্তায় জড়ীভূত হইয়া—বহুল গবেষণা করিয়া অবশেষে কবিযুগল তুসীয় কবির নিকটে জনৈক সুচতুর প্রিয়ভাষী চর প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। চর কবিদ্বয়ের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক যথাকালে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে হিরাতের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে মহাকবির সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল। তখন কৌশলী চর কবির সহিত বিবিধ বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। যখন ফেরদৌসীর গজনী গমন ও সুলতানের বিদ্যানুরাগিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল, তখন তিনি কবিদ্বয়ের শিক্ষানুসারে সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় কৌশলজাল বিস্তার করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মহাশয় ! শুনিয়াছি, সুলতানের মনের গতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গ্রন্থ-রচনায় যে অনুরাগ—যে বিদ্যোৎসাহিতা ছিল, তাহা আর নাই, সে উৎসাহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এখন তিনি নৃপতি-জন-সুলভ বিলাস-ব্যসনেই দিনপাত করিতেছেন। আপনি যে আশায় উৎসাহিত হইয়া পদব্রজে এই সুদীর্ঘ পথ কষ্টে অতিক্রম করিতেছেন, আপনার

সৈ পরিশ্রমের পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই—যাইলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। অতএব আনুপূর্ব্বিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে স্থলে না যাওয়াই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। আপনি যে ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। আমি প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি, তাহাই করুন।"

মিষ্টভাষী চতুরংচর ঐ সমস্ত কথা এরূপ কৌশলের সহিত—এরূপ মধুর বাক্যে ব্যক্ত করিলেন যে, সরলচেতা ফেরদৌসী তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না এবং অবিশ্বাস করিবার কোন কারণও দেখিতে পাইলেন না। কেননা সেই সুদূরবর্ত্তী অপরিচিত স্থানে বৈদেশিকের প্রতিকূলে কোন বিপক্ষ যে প্রতারণাজাল পাতিবে, কে তাহা মনে করিতে পারে? তাই শুদ্ধমতি ফেরদৌসীর অন্তরে সন্দেহের রেখাপাত মাত্র হইল না, কিন্তু শ্রবণমাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল হতাশে মলিন ভাব ধারণ করিল,—অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিল। তিনি ভীষণ মর্ম্মাহত হইলেন। কে যেন সহসা তাঁহাকে বজ্রপ্রহারে ভূপতিত করিল। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে ভাবিলেন,—"রাজাদের মন, মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইবার কথাই বটে! কিন্তু যত দোষ আমার ভাগ্যের; ভাগ্যে সুখ নাই, দোষ দিব কাহার? বিধাতা ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডনীয় নহে।" আবার ভাবিলেন,—"আগন্তুক ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার ইহাতে কোন স্বার্থ আছে কি না, জানি না। কিন্তু সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেক কথা বলিয়াছে। তাহার অনেক কথা বলিবার কারণ কি আছে? আর তাহার বাক্য যে বাস্তবিকই সত্য তাহারই বা প্রমাণ কি? ফলতঃ এক জন অপরিচিত আগন্তুকের বাক্যে সহসা

আস্থা স্থাপন করাও. বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।" এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া কবিপ্রবর অবশেষে কর্ত্তব্য অবধারণার্থ নিকটস্থ এক পান্থশালায় কিছুদিন অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। তখন চর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থানপর হইলেন।

ফেরদৌসী চিন্তিতচিত্তে পান্থ-নিবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে ঘটনাসূত্রে কবি আন্‌সারী ও রুদকীর সহিত বদরউদ্দীনের মনোমালিন্য জন্মিল। পূর্ব্বে তিনি বন্ধুত্বের অনুরোধে যে কার্য্য সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার চক্ষে অতীব অন্যায় ও অপকর্ম্ম বলিয়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, ভয়ানক অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর পুড়িতে লাগিল এবং তৎসহ ভয়েরও উদ্রেক হইল। ভাবিলেন, "পৃথিবীতে কোন কার্য্যই গুপ্ত থাকে না, যতই সাবধানতা অবলম্বন করা যাউক না কেন, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং কোনরূপে যদি তুসীয় কবির আগমনে বাধা প্রদানের ষড়যন্ত্র বাদসাহের কর্ণগোচর হয় এবং তাহাতে আমি লিপ্ত আছি, তিনি জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমার বিপদের ইয়ত্তা থাকিবে না—প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। সাধ করিয়া সুখে বঞ্চিত হইতে কে চাহে? অতএব অবিলম্বে ইহার বিহিত বিধান করা কর্ত্তব্য। যাহাতে সেই কবি সত্বর রাজধানীতে আগমন করেন, তাহার উপায় করিতে হইতেছে।"

সন্তপ্ত বদরউদ্দীন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ফেরদৌসীকে আহ্বানার্থ গুপ্তভাবে পান্থনিবাসে এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত যথাকালে তথায় উপনীত হইয়া কবির নিকটে আদ্যোপান্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। তখন ফেরদৌসী, কবি আন্‌সারী ও রুদকীর

বিজাতীয় ব্যবহার ও বৈরিতার কথা অবগত হইয়া যুগপৎ বিষাদিত ও হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দূতের মুখের প্রতি চাহিয়া মনে মনে বলিলেন,—"এই অভ্যাগত ব্যক্তির প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে আমার চৈতন্যোদয় হইল। জানিতাম না, শিক্ষিত লোকের প্রবৃত্তি এত হীন—এত নীচ—এত ঘৃণ্য হইতে পারে! জানিতাম না, স্বার্থের বশে, সে এতদূর নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে পারে!! হায় হায়, তবে আর শিক্ষার গৌরব কি রহিল? শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের প্রভেদ কি রহিল? বুঝিলাম স্বার্থের শক্তি অসীম—স্বার্থ বিশ্ববিজয়ী! জগতে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মুর্খ, ভদ্র, ইতর, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই সময়ে স্বার্থের পদসেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। কি ঘোর বিড়ম্বনা!! যাহা হউক, এই পান্থনিবাসে অবস্থান করাই আমার পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। এস্থান পরিত্যাগ করিলে এই আগন্তুকের সাক্ষাৎ লাভ ঘটিত না এবং এই শুভ সংবাদ জানিবারও উপায় হইত না। এক্ষণে আর এখানে কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে, অভিলষিত পথের অনুসরণ করা যাউক।" এবংবিধ চিন্তার পর মহামতি ফেরদৌসী সর্ব্ব কার্য্যের অধিনায়ক সেই বিশ্বস্রষ্টা পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া পুনর্ব্বার গজনীর উদ্দেশে বহির্গত হইলেন।

* * * *

যৎকালে কবিকুলকেশরী ফেরদৌসী গজনী নগরীতে আসিয়া সমুপস্থিত হন, সেই সময়ে রাজকবি আন্‌সারী শূরশ্রেষ্ঠ রোস্তম ও সোহ্‌রাবের অলৌকিক বীরত্বকাহিনী কাব্যাকারে রচনা করিয়া সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তজ্জন্য আন্‌সারীর যশোকীর্ত্তন

ও তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করাই তাৎকালিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সাধারণ লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ফেরদৌসী রাজসভাতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেন। তদ্দর্শনে সুচতুর কবি সার্ব্বজনিক রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বীরবর রোস্তম ও এস্‌ফন্দিয়ারের ভীষণসমর-বৃত্তান্ত (১) লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই তাহা হৃদয়-গ্রাহিণী সুমধুর ভাষায় সম্পাদন করিয়া উপকার স্বরূপ মহামনস্বী মাহ্‌মুদ শাহের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সুলতান প্রথমেই কবির কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তদবলোকনে অধিকতর বিস্ময়সহকৃত আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ হর্ষ-বিস্ফারিত-লোচনে কবিকে উচ্চসম্মান ও আদর প্রদর্শনপূর্ব্বক "যিনি অদ্ভুত ও অপার্থিব রচনা-শক্তি প্রভাবে মর্ত্ত্যে স্বর্গের সুধা-ধারা প্রবাহিত করিতে সমর্থ, তিনি বাস্তবিকই অতি মহান ও স্বর্গীয়" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কবিবরকে "ফেরদৌসী" এই গৌরবাত্মক উপাধিভূষণে সমলঙ্কৃত করত যে কার্য্যে কবি আন্‌সারী ব্যাপৃত ছিলেন, সেই মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা' রচনা কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন।

গজনীপতি ফেরদৌসীর কাব্যে ও কবিত্বে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি আপনার পরম যত্নে রক্ষিত বিবিধ ফল-পুষ্পপূর্ণ মনোজ্ঞ উদ্যান-মধ্যস্থ রমণীয় অট্টালিকায় তাঁহাকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই সুশোভন উদ্যান-সৌধ নানা শ্রেণীর যুদ্ধাস্ত্র, ইরাণ ও তুরাণ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বগত বাদশাহ্, সভাসদ ও বিখ্যাত বীরবৃন্দের সুন্দর প্রতিকৃতি

(১) বীরশার্দ্দূল রোস্তম ও এস্‌ফন্দিয়ারের বৃত্তান্ত 'শাহ্‌নামা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এবং হয়-হস্তি-ব্যাঘ্রাদির চিত্র দ্বারা সুশোভিত ছিল। ফেরদৌসীর পারিশ্রমিক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাও যে তাদৃশ একজন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মহিমামণ্ডিত দিগ্বিজয়ী নরপতির পদের সম্পূর্ণ যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুলতান প্রফুল্লবদনে, এক বা ততোধিক, অথবা যত দিনেই হউক, শাহ্‌নামার সহস্র শ্লোক রচিত হইলেই মহাকবিকে সেই প্রত্যেক সহস্র কবিতার জন্য সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে প্রধান ধনাধ্যক্ষ খাজা আহ্‌মদ হোসেনকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

মোজাম্মেল হক।

পদ্যাংশ

রামের বনগমন

রাজধানী অযোধ্যার দিকে চাহি পরে।
করুণ বচনে রাম কহে যোড় করে ॥
রঘুকুলধুরন্ধর আর দেব যত।
হর্ষে তব পুরে বাস করে অবিরত ॥
তোমায় সতত রক্ষে যেই দেবগণ।
সবাকারে আজি আমি করি আমন্ত্রণ ॥
এই আশীর্ব্বাদ সবে করহ এখন।
ঋণমুক্ত ফিরি হেরেন অযোধ্যা ভুবন ॥
জনক জননী সহ হর্ষে কুতূহলে।
পুনর্ব্বার এই স্থানে মিলিব সকলে ॥
সম্ভাষিয়া অযোধ্যাকে করুণা বচনে।
তুলিয়া দক্ষিণ বাহু সজল নয়নে ॥
কহিলেন জনপদবাসিগণ প্রতি।
দেখাইলে সবে মোরে অশেষ ভকতি ॥
এবে আর দুঃখ নাহি পাও মোর লাগি।
নিজ নিজ কার্য্যে যাও এই ভিক্ষা মাগি ॥
রামের বচনে সবে ঘরে ফিরি যায়।
পুনঃ দেখিবারে তারে ফিরিয়া দাঁড়ায় ॥
সতৃষ্ণ নয়নে রাম পানে যত চায়।
দেখিয়া নয়ন নাহি কাহারো জুড়ায় ॥

ক্রমে দিবাশেষে রাম দিবাকর প্রায়।
হরিয়া সবার মন বহুদূরে যায়॥
যথায় অসংখ্যবিধ লোকের বসতি।
যথা চৈত্য, যূপ সব সুশোভিত অতি॥
যথা বিপ্রে বেদপাঠ করে নিরন্তর।
সর্ব্বলোক যথা হৃষ্ট পুষ্ট কলেবর॥
আম্রবন পূর্ণ যথা, শোভে জলাশয়।
ধনধান্যে পূর্ণ আর গোধন নিচয়॥
ক্রমে রাম সেই রাজজনদর্শনীয়।
ছাড়িলা কোশল দেশ অতি রমণীয়॥
সুন্দর কানন যুত অতি সুশোভিত।
শৃঙ্গবের পুরে পরে হৈলা উপনীত॥
তথায় দেখিল রাম ত্রিপথগামিনী।
যাইছে জাহ্নবী চলি পাপনিবারিণী॥
কল কল শব্দে বহে জাহ্নবীর জল।
নির্ম্মল মণির সম পবিত্র শীতল॥
একান্ত শৈবালশূন্য সেই গঙ্গাজলে।
মুনিজন স্নান পান করে কুতুহলে॥
অদূরে আশ্রম আছে শোভা তার কত।
দেবের কানন তটে শোভন পর্ব্বত॥
পবিত্রসলিলা গঙ্গা স্বর্গের ভিতরে।
সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনী নাম ধরে॥
তথায় কনক পদ্ম দেবমনোলোভা।
বিকসিত গঙ্গাজলে ধরে কত শোভা॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব আর দানব কিন্নর।
বিহরে অপ্সরাগণ তথা নিরন্তর॥
শিলাঘাত পেয়ে গঙ্গা ফিরি মহাবলে।
যাইছে ভীষণ অট্ট হাসি' কোন স্থলে॥
কোথা ফেন ভাসে কোথা বেণীরূপ ধরে।
বহিছে প্রবাহ কোথা জল ঘূর্ণি করে॥
কোথা মহাবেগে ধায় কোথা বহে স্থির।
কোথা অল্প জল কোথা একান্ত গভীর॥
কোথায় প্রবাহ শব্দ অতি সুমধুর।
কোথা বা কঠোর অতি একান্ত নিঠুর॥
কোথা বালুময় স্থান কঠিন নীরস।
কোথা ডাকে চক্রবাক বক ও সারস॥
কোথা তটে তরুরাজি মালাহার প্রায়।
ধরে অপরূপ শোভা নয়ন জুড়ায়
কমল কুমুদ কোথা কোথা বা কহ্লার।
মুকুলিত বিকসিত হয় অনিবার॥
কোথা বা সুগন্ধ পুষ্প পরাগ সকলে।
নাচিতে নাচিতে বেগে ভাসি যায় জলে॥
বিষ্ণুপদ হৈতে ভগীরথ তপোবলে।
হরজটা দিয়া গঙ্গা এলো মহীতলে॥
নক্র শিশুমার আর কুম্ভীর মকর।
ইথে সদা করে বাস উরগ নিকর॥
তরুলতা গুল্মে তীর একান্ত গহন।
তার মাঝে বন্য গজ করয় গর্জ্জন॥

জাহ্নবীকে দরশন করি কুতূহলে।
মধুর বচনে রাম সুমন্ত্রকে বলে॥
অদূরে ইঙ্গুদী বৃক্ষ দেখ মুনিবর।
কুসুম পল্লবে সুশোভিত মনোহর॥
তাঁর তলে আজ নিশা করিব যাপন।
শুনি পুলকিত অতি সুমন্ত্র লক্ষ্মণ॥
রথ লয়ে ত্বরা যন্ত্রী গেল তরুতলে।
ভূমে অবতীর্ণ তবে হইল সকলে॥

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন

তবে ভীষ্ম কহিলেন কৌরব ঈশ্বরে।
দশদিন ভার সম হইল সমরে॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যেরে নাশিব।
রথী দশ সহস্রেরে প্রত্যহ মারিব॥
শুনি দুর্য্যোধন হয়ে আশ্বাসিত মন।
নিজ রথে, সৈন্য সাথে, করে আরোহণ॥
দুই দলে যোদ্ধাগণ করে সিংহনাদ।
ঢাক, ঢোল, শঙ্খ বাজে জয় জয় বাদ॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ঙ্কর ধ্বনি।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি॥

দেবদত্ত শঙ্খ বাজায়েন ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজায়েন ভীম মহাশয়॥
দুই দলে কোলাহল হইল তুমুল।
দশদিক্ যুড়ি শব্দ জন্মিল অতুল॥
ধনুর্ব্বাণ ধরি কৃষ্ণে বলে ধনঞ্জয়।
নিবেদন শুন মম; কৃষ্ণ মহাশয়॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখহ ক্ষণেক।
যতেক বিপক্ষগণে দেখিব প্রত্যেক॥
কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম।
কাহে কাহে যুদ্ধ হবে; কেবা কার সম॥
শুনি সৈন্য মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥
সর্ব্ব অগ্রে পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল।
ভ্রাতৃ, পুত্র, পৌত্র দেখিলেন নিজকুল॥
বন্ধুগণে দেখি প্রাণ বিষাদিত মন।
অবশ হইল অঙ্গ, [illegible] দন॥
শরীর রোমাঞ্চযুক্ত কাঁপে ঘনে, ঘন।
হাত হ'তে খসি তার পড়ে শরাসন॥
সকরুণে কৃষ্ণ প্রতি ক'ন ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবার বধ উচিত না হয়॥
দেখিলাম যত বন্ধু আত্মীয় সকল।
ইহা সবা মারি রণে হবে কোন ফল॥
বিফল জীবন মম বাঁচি কোন সুখ।
গুরু, বন্ধু মারি কিসে দেখাইব মুখ॥

রাজ্যে কার্য্য নাহি মম, জীবন অসার।
কাহার নিমিত্ত করি বংশের সংহার॥
জ্ঞাতি বধে মহাপাপ হইবে নিশ্চয়।
রাজ্যলোভে যোগ্য নহে পাপের সঞ্চয়॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম, বনবাসে যাব।
জ্ঞাতিনাশ, বন্ধুনাশ সহিতে নারিব॥
এত বলি ধনঞ্জয় ত্যজি ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর॥
কৃষ্ণ তাঁরে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন॥
অহঙ্কার করি আগে আসি যুদ্ধ-স্থান।
সম্মুখ-সমরে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ॥
জ্ঞাতিবধ-পাপ তুমি ভাব, ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে পার্থ হইল সভয়॥
কে কা'রে মারিতে পারে, কেবা কা'র অরি।
সবারে সংহারি আমি, আমি সব করি॥
কর্ম্ম-অনুসারে লোক করে গতায়াত।
যাহার যেমন কর্ম্ম, পায় সেই পথ॥
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নব বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চরে॥
শরীর বিনাশ হয়, নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয়, করিয়া প্রকাশ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশলোকে।
সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে॥

সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্বত্থ।
নদী মধ্যে সুরধুনী কহিলাম তথ্য ॥
ঋষি মধ্যে নারদ যে আমি, মহাশয়।
মুনি মধ্যে কপিল যে মোর মূর্ত্তি হয় ॥
গজ মধ্যে ঐরাবত, অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা।
নর মধ্যে নরপতি আমারে জানিবা ॥
দেব মধ্যে দেবরাজ, রুদ্রেতে কপালী।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, দানবেতে বলী ॥
নাগেতে অনন্ত নাগ আমারে জানিবে।
গ্রহমধ্যে দিনকর আমারে বুঝিবে ॥
তেজোমধ্যে বৈশ্বানর আমার বিভূতি।
পাণ্ডবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি ॥
বর্ণমধ্যে দ্বিজ পর্ব্বতেতে হিমালয়।
এমতে অনন্ত আমি, কুন্তীর তনয় ॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময়।
আপনার কর্ম্মফলে সবে হয় ক্ষয় ॥
হেন মতে যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে।
তথাপি প্রবোধ নাহি মানে তাঁর মনে ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন, ধনঞ্জয়।
মৃত সব সৈন্য এই, জানিও নিশ্চয় ॥
নিমিত্ত মাত্রক হও সব্যসাচী তুমি।
সব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি ॥
অর্জ্জুন বলেন, প্রভু তবে সত্য জানি।
আপন নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি ॥

শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্যচক্ষু অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
মেঘবর্ণ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশ।
রবি, শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর, তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ, নাহি পান অন্ত॥
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু, ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধুসম, তাঁর পৃষ্ঠ বসুচয়॥
দশদিক্ জঙ্ঘা তাঁর, পাতাল চরণ।
শৈলগণ তাঁর অস্থি, রোম তরুগণ॥
মাংসরূপা ধরণীরে দেখে ধনঞ্জয়।
হেরিয়া বিরাটরূপ মানেন বিস্ময়॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার॥
সর্ব্ব সৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়।
সলজ্জ, সভয়, চমৎকৃত অতিশয়॥
স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া।
আপন বৃত্তান্ত, কৃষ্ণ, কহ বিবরিয়া॥
ত্রিদশের নাথ যিনি ব্যাপক সংসার।
না পারি চিনিতে তাঁরে আমি পাপাচার॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা।
আমি মূঢ় নর জাতি কি জানি মহিমা॥
কহেন গোবিন্দ পার্থে করিয়া সান্ত্বন।
প্রকাশিত কর চক্ষু, ত্রাস কি কারণ॥

চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় যথারূপ দেখি।
নিলেন ধনুক করে পরম কৌতুকী॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেন মন।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে রথে বসেন তখন॥

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

অন্নদার আত্মপরিচয়

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে,
"পার কর" বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী,
"একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফেরফার।"
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
"বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি, তেঁই পতি মোর বাম ;
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ, দিলা হেন বরে !
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই ;
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।"
পাটনী বলিছে, "আমি বুঝিনু সকল ;
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল।"
দেবী কন, "দিব, আগে পারে লয়ে চল।"
বসিয়া নায়ের বাড়ে, নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ।
পাটনী বলিছে, "মা গো, বৈস ভাল হ'য়ে,
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে ল'য়ে।"
ভবানী কহেন, "তোর নায়ে ভরা জল,
আলতা ধুইবে, পদ কোথা রাখি বল।"
পাটনী বলিছে, "মা গো, শুন নিবেদন,
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।"
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি-উপরে।

সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতি হইল সোণা, দেখিতে দেখিতে।
তীরে উত্তরিলা তরী, তারা উত্তরিলা,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিলা।
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী ;
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল,
"দিয়াছ যে পরিচয় বুঝিনু সে ছল।
হের দেখ সেঁউতিতে রেখেছিলে পদ,
কাঠের সেঁউতি মোর হইল অষ্টাপদ।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়,
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয়।"
ছাড়াইতে নারি, দেবী কহিলা হাসিয়া,
"কহিয়াছি সত্য কথা, বুঝহ ভাবিয়া।"

ভারতচন্দ্র রায়।

প্রণাম তোমায়

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব॥

তরুণ তপন হরে, তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর।
খরতর-কর কর, হন দিবাকর॥
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।
দিন যত গত তত, দীন দিনপতি॥
পরিশেষে পুনর্ব্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে।
শত শত শতদল, শোভা করে বনে॥
কুসুমের বাস ছেড়ে, কুসুমের বাস।
বায়ুভরে এসে করে, নাসিকায় বাস॥
মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ।
আস্যভরা হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ॥
মাঝে মাঝে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে।
রস খায় যশ গায়, বসে, পুষ্পদলে॥
শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া।
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া॥
ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥

এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আবাস।
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ ॥
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ ॥
আরবার দেখি তার, নাহি সেই রূপ।
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ ॥
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকাররাশি।
তাই দেখে মাঝে মাঝে, চপলার হাসি ॥
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব ॥
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

মানুষ কে

নিয়ত মানসধামে একরূপ ভাব।
জগতের সুখে দুখে সুখ দুখ লাভ ॥
পরপীড়া পরিহরি, পূর্ণ পরিতোষ।
সদানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ ॥
নাহি চায় আপনার পরিবার সুখ।
রাজ্যের কুশলকার্য্যে সদা হাস্যমুখ ॥
কেবল পরের হিতে প্রেমলাভ যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?
নাহি চায় রাজ্যপদ নাহি চায় ধন।
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন ॥
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন।
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন ॥
আত্মার সহিত সব সমতুল্য গণে।
মাতা পিতা জ্ঞাতি ভাই ভেদ নাহি মনে ॥
সকলে সমান মিত্র, শত্রু নাই যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?
অহঙ্কার-মদে কভু নহে অভিমানী।
সর্ব্বদা রসনারাজ্যে বাস করে বাণী ॥
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে।
পর্ব্বত সলিল হয় রসনার রসে ॥

মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে।
অঙ্গীকার অস্বীকার নাহি কোন ক্রমে ॥
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?
মঙ্গলের প্রতি শুধু প্রেম অতিশয়।
কদাচ না করে কেহ জীবনের ভয় ॥
পরিবার পরিহৃত আশা পরিক্রমে।
জীবনের কল্যাণ হেতু নানা স্থানে ভ্রমে ॥
দুর্গম সুগম স্থল বিবেচনা নাই।
চিন্তার সহিত নিদ্রা থাকে এক ঠাঁই ॥
সতত গলায় পরে করুণার হার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?
চেষ্টা যত্ন অনুরাগ মনের বান্ধব।
আলস্য তা'দের কাছে রণে পরাভব ॥
ইঙ্গিতে কুশলগণে আয় আয় ডাকে।
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ॥
চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে সমুদয় আশা।
যতনে হৃদয়ে তার বাসনার বাসা ॥
স্মরণ স্মরণমাত্রে আজ্ঞাকারী যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর ?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ভাল

কাজ যদি ইচ্ছা হয় কর তবে ভাই।
মিছামিছি মুখে ব'লে কোন ফল নাই॥
শরতের মিছা মেঘ ডাকডোক্ সার।
ছিটে-ফোঁটা নাহি তায় জলের সঞ্চার॥
সেইরূপ মিছা তব মুখে আড়ম্বর।
ভাল যদি না হইল কার্য্য হিতকর॥
তথাপি করিবে তাহা যখন যা হয়।
বিলম্ব-বিধান তায় কোনমতে নয়॥
কল্পনায় কর যদি আলস্য এখন।
কখন হবে না আর সুফল সাধন॥
অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত।
কল্পনা না হয় যেন রাবণের মত॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

খল ও নিন্দুক

মহৎ যে হয় তার, সাধু ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে, করে বিতরণ॥
কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ॥

কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই মান ‍‍ ই।
গুণহীনে সমাদর কোন থানে নাই॥
শারী আর শুক পাখী অনেকেই রাখে।
যত্ন ক'রে কে কোথায় কাক পুষে থাকে?
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি সাধু হয় খল?
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে, গরল উগরে॥
লবণ-জলধি-জল ক র্যা ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে সুধা বরিষণ॥
সুজনে সুযশ গায়, কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

আত্মবিলাপ

(১)

আশার ছলনে ভুলি', কি ফল লভিনু, হায়,
তা'ই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি', কাল-সিন্ধু-পানে ধায়,—
ফিরা'ব কেমনে?

দিন-দিন আয়ু-হীন, হীন-বল দিন-দিন ;—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ;—এ কি দায় !

(২)

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?—
জাগিবি, রে, কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বা-দলে, নিত্য কি, রে, ঝলঝলে,
কে না জানে, অম্বু-বিম্ব অম্বু-মুখে সদ্যঃ-পাতি ?

(৩)

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?—
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণ-প্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরু-দেশে, নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে ;—
এ তিনের ছল-সম ছল, রে, এ কু-আশার !

(৪)

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে ;—
কি ফল লভিলি ?
জলন্ত-পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি ;—এবে, রে, পরাণ কাঁদে !

(৫)

বাকি কি রাখিলি, তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে—
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টক-গুণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি ; দংশিল কেবল ফণী !—
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

(৬)

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়,—
ক'ব তা' কাহারে ?
সুগন্ধ-কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে ;—
মাৎসর্য্য-বিষ-দশন, কামড়ে, রে, অনুক্ষণ—
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

(৭)

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে, রে, অতল জলে
যতনে ধীবর ;
শত-মুক্তাধিক আয়ু কাল-সিন্ধু-জল-তলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি' দিবে হারা-ধন, কে তোরে, অবোধ মন ?
হায়, রে, ভুলিবি কত, আশার কুহক-ছলে !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বঙ্গভূমির প্রতি

"My Native Land, Good night!"—*Byron.*

রেখো, মা, দাসেরে মনে; এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,—
মধু-হীন করো না, গো, তব মনঃ কোকনদে!
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হ'বে,
অমর কে, কোথা, কবে,
চির-স্থির কবে নীর, হায়, রে, জীবন-নদে!
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না, গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!
সেই ধন্য নর-কুলে,
লোকে যা'রে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি? কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!

তবে যদি কৃপা কর,
ভুলো দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সু-বরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

চিতোর

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ-কারণ।
ভারতের নানা দেশে করি' পর্য্যটন॥
অবশেষে উপনীত রাজপুতানায়।
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়॥
দেখিলেন অজামীল-পুরী আজমীর।
যশল্মীর যোধপুর আর বিকানীর॥
কোটা বুঁদি শিখাবতী নীমচ সারয়ে।
উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল-হৃদয়ে॥
জয়সিংহ-পুরী জয়পুর চারুদেশ।
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠ বিশেষ॥
ভ্রমি' বহু রাজপুরী, সানন্দ-অন্তরে।
প্রবেশেন এক দিন চিতোর নগরে॥

দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর।
তার নিম্নে শোভাকর সুন্দর নগর॥
গিরি পরে শোভে গড় প্রাচীর বেষ্টিত।
রাজচক্রবর্ত্তী হিন্দু-সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত॥
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর॥
কোন স্থলে মৃদুস্বর করি' নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর॥
তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম-অঙ্গে চারু শোভা ধরে॥
যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানু-করে করে অনিবার॥
বিবিধ বিহঙ্গে নানা স্বরে গান করে।
সন্তাপীর তাপ দূর, মন-প্রাণ হরে॥
আহা, এই রূপ-শোভা অতি অপরূপ।
উথলয় ভাবুকের বিভাবনা-কূপ!
সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুন্দর।
গহন গহ্বর বন নির্ঝরনিকর॥
দিনকর নিশাকর নক্ষত্রমণ্ডল।
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল॥
ইহ খলু নিসর্গের শোভা অনুপম।
যাহে জন্মে ভাবুকের বিলাসবিভ্রম॥

সে সুখের তুল্য সুখ আর কিবা হয় ?
দৈব-অনুগ্রহ ভিন্ন অনুভূত নয় ॥
দেখ দেখি ভবভূতি আর কালিদাস ।
কাব্যে সেই রস কিবা করিলা প্রকাশ ॥
মহামহিপালগণ সভার ভিতর ।
মহারত্নরূপে খ্যাত দেশ দেশান্তর ॥
কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বিষয় ।
না বর্ণিয়া কিছুমাত্র ভাব রসময় ॥
প্রকৃতি রূপের ছটা করি দরশন ।
করেছেন কাব্য-সুধা-সার বরষণ ॥
পাঠমাত্রে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর ।
ধন্য ধন্য কাব্যশক্তি রসের সাগর ॥
আয় মন ! চল যাই সেই সব দেশে ।
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে ॥
দেখিব বিচিত্র শোভা শৈল আর জলে ।
শ্রবণ জুড়াবে তটিনীর কলকলে ॥
কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ ।
শরীর জুড়াবে, যাবে সমুদায় ক্লেশ ॥
এইরূপ নানা শোভা দেখিতে দেখিতে ।
পথিক উঠেন দুর্গে পুলকিত চিতে ॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ-বাক্য

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায় ॥
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয়-তনয় ॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়,
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়
অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ !
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ॥

চল চল চল সবে, সমর-সমাজ হে,
সমর-সমাজ।
রক্ষহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে,
রাজপুতানার।
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥
কৃতান্ত কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান॥
স্মরহ ইক্ষ্বাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন॥

স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,

কীর্ত্তি-বিবরণ।

বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে?

ক্ষত্রিয়-নন্দন॥

অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,

চল ত্বরা যাই।

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,

তুল্য তার নাই॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিরণ্যনগর ও হরিহর দর্শন

যথা দুখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণ-চিত হয়;
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়;
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন-দরশনে;
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী হিমাংশু মিলনে;
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে, পাশে দিবাকরে দেখে।
হ'ল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়।
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।
বলে সখা হে বাঁচিতে বুঝি বিধি দিল ঠাঁই,
চল পরিশেষে পুরী-পরিসরে দোঁহে যাই।
যায় দোঁহে মিলি, এই বলাবলি করি স্থির;
ধীরে ধীরে ধীরে, বিধিরে বন্দিয়া দুই ধীর।

এসে প্রবেশে নিবেশে, শেষে সুবেশে দুজন,
দেখে, একে একে, থেকে থেকে সকল সদন।
চলে চাইতে চাইতে চারিদিক্ চলচিত ;
পরে পরিপাটী রাজবাটী হয় উপনীত।
আগে বিরাজিত মহারাজ ধীরাজ যে ঘরে ;
তথা বানর বানরী এবে সুখে ক্রীড়া করে।
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রী সাথ বসিতেন ধীর,
তথা ফেরুপাল ফিরি ফিরি ফুকারে গভীর।
দোঁহে দেখে এই দৈবদুঃখে দুঃখিতহৃদয়।
যবে যায় জলাশায় যথা আছে জলাশয়।
দেখে সুচারু শোভিত সরসিজ সরোবর ;
সদা শোভিছে সোপানসারি, সব থরেথর !
করে কমল-কলিতে অলিকুল কলকল ;
বহে ধীরে ধীরে সমীর, সে নীর টলটল !
ভেবে মনোগত ভাবে, না করিয়া পরকাশ,
নৃপ কথোপকথন করে সখার সকাশ।
দেখ সখা, কিবা অপরূপ সরোবর-নিধি ;
বুঝি মানসে মানসে রাখি সৃজিয়াছে বিধি।
চল বেলা বহে যায় আর দেখিতে সকলে।
দোঁহে জলে চলে মজ্জন করিতে কুতূহলে।
সারি তাড়াতাড়ি স্নান পূজা, কহে অতঃপর,
চল ত্বরা করি গিয়া হেরি যথা হরিহর।
ইহা করি স্থির, দুই ধীর সরোবর-তীরে,
চলে হরিহরে হেরিতে হরিষে ধীরে ধীরে।

দেখে চারি পাশে কুসুম-নিবাস সুশোভিত,
তার মাঝে এক অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজিত।
তার ভিতর কি মনোহর হরিহর মূর্ত্তি,
হেরে হয় যে হৃদয়-শতদল-দল-স্ফূর্ত্তি!
মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে,
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে।
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ,
আধা ফণীতে বিনান বেণী সাজে জটা-গুচ্ছ।
আধা কপাল-ফলকে শোভে অলকার পাঁতি,
আধা ধক্‌ধক্ জ্বলিছে জ্বলন দিবারাতি।
আধা তিলক আলোক তিন-লোক করে আলো,
আধা বিভূতি বিভূতি-ভূষা ভোলা বাসে ভালো।
কিবা নলিন-মলিনকারী নয়ন উজ্জ্বল,
আধা ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আঁখি যেন রক্তোৎপল।
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল;
ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল।
আধা বনমালা গলায় ভুলায় যোগিমন;
আধা রুক্ষ অক্ষমালা আলা করে ত্রিভুবন!
আধা কুঙ্কুম কস্তুরী হরিচন্দন চর্চ্চিত,
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্মবিভূষিত!
কিবা কর-কিসলয়-যুগে শোভে শঙ্খচক্র!
আধা অমর ডমরু করে আর শিঙ্গা বক্র!
আধা কেশবের কটিতটে আঁটা পীতধড়া;
আধা বাঘছাল ভোলার ভুজগমালা বেড়া।

আধা চরণ-কমলে শোভে কাঞ্চন-মঞ্জীর,
আধা ফণিমালা ফোঁশ ফোঁশ গরজে গম্ভীর।
দেখে এই রূপ অপরূপ-রূপ হরিহর,
রাজ পূজাবিধি যথাবিধি করে অতঃপর।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

প্রবাসীর জন্মভূমি-দর্শন

ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন
নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন।
স্বর্গ স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।
হয় হোক্ জন্মভূমি সৌন্দর্য্য-বিহীন,
থাক্ তার চারিপাশে বিজন বিপিন,
না থাক্ নিকটে নদ নদী সরোবর,
না রোক্ সেখানে কোন খাদ্য পরিকর;
তবু তার কাছে সুরপুর কোন্ ছার;
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার।
তিলেক রহিতে নারে প্রবাসী যেখানে,
নির্ব্বাসী সর্ব্বদা রয় হরিষে সেখানে।
দেখরে ল্যাপল্যাণ্ড দেখ কি কু-স্থান হায়
এমন সুলভ রোদ দুর্লভ তথায়,
ছ'মাসে তপন নাকি কথন কথন,
দেখা যায় তড়িতের রেখার মতন;

ঘন-ঘন শিশির না ছাড়ে কভু তারে,
প্রোথিত সকল স্থল নিবিড় তুষারে,
তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে;
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে

শুনেছি আফ্রিকা দেশ মহাভয়ঙ্কর;
বড়ই প্রখর তথা তপনের কর;
স্থানে স্থানে ভয়ানক মরুভূমি কত,
ক্ষুভিত পবনে হয় সাগরের মত;
কচিৎ জলদমালা, বরষিয়া জল,
উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ তার করে সুশীতল;
তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?

উত্তর দক্ষিণ আর প্রশান্ত সাগরে,
ভাসিতেছে কত দ্বীপ সলিল উপরে।
থাক্ তথা বাস করা, কথা শুনে তার,
হয় মনে নানারূপ ভয়ের সঞ্চার,
তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?

এই ত সে প্রিয়তম মম জন্মস্থান,
যার তরে ছিল সদা ব্যাকুলিত প্রাণ;
যার প্রীতিময়ী মূর্ত্তি চারুদরশন,
করিতাম এত দিন চিন্তা অনুক্ষণ;
আজ তার সেই মূর্ত্তি নিরখি নয়নে,
মরি কি বিমল সুখ উপজিল মনে!

কাদম্বিনী বরষার সময়ে যেমন,
নিয়ত সলিলে করে ভূতল সিঞ্চন।
আজ এ জনমভূমি আমার তেমন,
করিছে অন্তরে কত সুখ বরষণ!
অথবা তপন-আভা প্রভাত সময়,
যেরূপ প্রফুল্ল করে সরোজনিচয়;
জনম-ভূমির কান্তি আজ সে প্রকার,
হৃদয়-কমল ফুল্ল করিছে আমার।
কত কত রম্য স্থান করেছি ভ্রমণ,
হেরিয়াছি কত কত নগর শোভন।
কিন্তু তাহাদের সেই সুষমানিচয়,
আজ এ রূপের কাছে ছার জ্ঞান হয়।
অহে রম্য হর্ম্ম্যবাসী ধনাঢ্য নিকর,
যাতে মল-মূত্র-ক্ষেপ কর নিরন্তর,
বল বল বল শুনে জুড়াই শ্রবণ,
করিছ কি কিছু তার মঙ্গলসাধন?
নিরমল বিদ্যারূপ আলোক মালায়,
বল শুনি কতদূর উজলিলে তায়?
অজ্ঞান-তিমির-পুঞ্জ কত বিনাশিলে,
কতদূর মুখ তার প্রসন্ন করিলে?
অথবা বিস্মৃত বল হয়ে এ সকল,
ভোগের বাসনা পূর্ণ করিছ কেবল।
মিছে কেন নরদেহ ধরে ছিলে তবে,
ধিক্ ধিক্ শতবার ধিক্ তোমা সবে।

স্বদেশের উপকারে নাই যায় মন,
কে বলে মানব তাঁরে পশু সেই জন।
দেশের মঙ্গলে যার ব্যাভার না হয়,
লোষ্ট্রের সমান, তারে ধন কেবা কয়?

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

বায়ু

বল বল বল হে বিশ্বপ্রাণ
তোমায় করিল কে বিশ্ব-প্রাণ?
যথা তথা সদা করি ভ্রমণ,
শীতল করিছ জীব-জীবন।
কভু ধর বল প্রবল অতি,
কভু কর অতি সুধীরে গতি!
সমভাবে সবে করিছ স্নেহ,
কৃপালাভে নহে নিরাশ কেহ।
ভূপের সন্তাপ যেরূপ হর,
দরিদ্রে নিস্তাপ যেরূপ কর।
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হয় যে জন,
তুমি তার দুঃখ কর মোচন।
এ গুণ তোমারে দিলেন যিনি,
বল বল কোথা আছেন তিনি?
হেরিতে তাঁহারে মানস চায়,
কোথা গেলে আমি পাইব তায়?

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

রোগ-প্রতিকার

যখন যে রোগে, মন দেহ অধিকার
করে, কর যতন তখনি নাশে তার।
নতুবা সে রোগ শেষে নিশ্চয় জানিবে,
নিবারণ করা অতি কঠিন হইবে।
অঙ্কুরের উন্মূলন সহজ যেমন,
নয় নয় বদ্ধমূল বৃক্ষের তেমন।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার

সিদ্ধা। করি পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা-উপাসনা,
কেন তবে কর বধ কোটী কোটী প্রাণী?
জগন্মাতা,
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি।
দেখ, নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়!
যদি নৃপ, কৃপা নাই কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?
নির্দ্দয় যে জন;
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।

নরপতি,
কেন প্রাণিনাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি ?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন,
দুর্ব্বল এ ছাগপাল ;
হায় ! হায় ! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
"প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ !"
মহারাজ,
জীবগণ হিংসি পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে ;
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জ্জন ?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?
মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়,
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণদানে নাহিক শকতি,
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণনাশ ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে, মানব যেমতি !
মানবের প্রায়,
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে গায়,—
বেদনা জানাতে নারে !
বধি তারে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,

া হয় কথন—
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ।
বধ রাজা আমার জীবন,
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।
নরনাথ, কল্যাণ হইবে,
পুত্র কোলে পাবে,
এড়াইবে জীবহিংসা-দায়।
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়,
তাহে তব নাহি পাপ
রাখ—রাখ যোগীর মিনতি,
বসুমতী কলুষিত ক'র না, ভূপাল।
স্বার্থ-হেতু,
ক'র না হে কোটি প্রাণি-বধ।

কোথায় ঘাতক,—রাজকার্য্যে বধ মো র।

বিম্বা। মতিমান্,
আমি অতীব অজ্ঞান,
নিজগুণে কর ক্ষমা।
জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তব খুলেছে নয়ন,
বুঝিয়াছি হিংসা সম নাহি পাপ।
তুমি জগদ্‌গুরু—স্থান দেহ শ্রীচরণে।
নাহি আর পুত্রের কামনা,
নাহি রাজ্য ধন আশ,—
ত্যজি বাস যাব সাথে সাথে,
সেবিতে চরণ দুটি,—
কে তুমি হে দেহ পরিচয়!
জ্ঞানময়, কভু তুমি নহ সাধারণ,
বঞ্চনা ক'র না দেব, দেহ পরিচয়।

সিদ্ধা। শুন নরপতি।
হেরি জীবের দুর্গতি,
আসিয়াছি জ্ঞান অন্বেষণে।
রাজবংশে একক নন্দন,
ছিল রত্ন-ধন,
আসিয়াছি প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিয়ে!
কর আশীর্ব্বাদ,
যেন পূরে মন-সাধ,
পারি যেন হরিবারে জীবনের সন্তাপ।
নরনাথ, বঞ্চহ কল্যাণে,

যাই আমি যথাস্থানে।

বিম্বা। প্রভু, আমি যাব তব সাথে—
জীবন ত্যজিব প্রভু, বঞ্চনা করিলে।

সিদ্ধা। হে ভূপাল, ধরহ বচন,
অকারণ রাজ্যধন কি হেতু ত্যজিবে?
প্রেমে কর প্রজার পালন।
হয় যদি সফল জনম,
পাই যদি দুর্লভ রতন,
কহি সত্য বাণী, নৃপমণি,
দিব আনি সে রত্ন তোমারে।
দেখ রাজা, বহিছে সময়
আর না রহিতে পারি।

বিম্বা। মন্ত্রি, রাজ্যে মম সত্বর ঘোষণা দেহ,
জীব-হিংসা কেহ নাহি করে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন কর বিতরণ,
দেবার্চ্চনা অধিক নাহিক আর।
আছিল যে ভ্রান্ত সংস্কার,
হ'ল দূর সাধু-দরশনে।
আজি হ'তে হবে রাজ্যে বলিহীন পূজা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

লক্ষ্মণবর্জ্জনে

লক্ষ্মণ। সত্য-ব্রত ধন্য ধরাতলে,
রাম নাম মোক্ষধাম সত্যের পালনে ;
সত্যের মাহাত্ম্য বুঝে মহাত্মা যে জন,
ত্যাগ-পরায়ণ সদা সত্যপ্রিয় যেই ;
সেবা মম পূর্ণ এত দিনে,
আত্ম-বিসর্জ্জনে পূজা করি সম্পূরণ।
ত্যাগশিক্ষা মোরে শিখালে দয়াময়,
করি আপন বঞ্চন,
মিষ্টান্ন তুলিয়া দিয়া মুখে ;
খেলিতে পাইলে ব্যথা,
লইতেন কোলে তুলে মোরে,
বহিত আঁখিতে নীর,
পলকে হতেন হারা,
প্রাণের লক্ষ্মণে তাঁর ;
তেঁই তো শিখিনু
পূজিতে এ দুর্লভ সম্পদ,
রাজীব শ্রীপদ রাঘবের।
বনবাসে হেরি মোরে বাকল-বসনে,
রঘুমণি আপনা পাশরি,
নীরবে ফেলিতে আঁখিনীর,
চাহি মুখপানে—আঁখি-জল মুছি,

হাসি হাসি কহিতে আমায়,
তুলিতে কুসুম বনে,
জানিতে দয়াল আমি ফুল ভালবাসি,
কিন্তু বিলাস ত্যজেছি
পাছে নাহি চাহি ফুল।
যবে ইন্দ্রজিৎ বরষিল শর
ঢাকি মোরে আপন হৃদয়ে
রেখেছিলে দয়াময়;
জানি দেহ রাখিতে এ ছার দাসে;
সেই প্রেম স্মরি, সেই প্রেম-বলে,
জিনি অবহেলে পুরন্দর-জয়ী অরি,
পঙ্গু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু!
সেই প্রেম-বলে,
না টলিনু শক্তিশেল হেরি,
উচ্চ হৃদে পেতে নিনু শেল,
রাম-প্রেমে শেলে পাইনু ত্রাণ,
গৌরব আখ্যান মহতী রহিল ভবে;
ম'লে প্রাণ পাই, আর না ডরাই,
সত্য রাখি পাব তোমা নারায়ণ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

যমুনাতটে

(১)

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল,
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল।
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরুশাখা'পরে,
নিরবিলি ঝিঁ ঝিঁ ডাকে জগত ঘুমায় ;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

(২)

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথজ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্ব্বত-উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।

কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

(৩)

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু ক'রে দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশীথে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

(৪)

হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী ?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায় ?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জলে',
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবারাতি
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

(৫)

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না।
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙ্গি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি কত কাঁদি প্রাণ জুড়াইল।
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাশী-দৃশ্য

অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে
বিশাল সলিলরাশি
সম্মুখে চলেছে ভাসি,
জাহ্নবী-কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে!

শোভিছে সলিলকোলে সারি সারি সাজিয়া,
শত সৌধ-চূড়া-মালা
কপালে কিরণ ঢালা

স্তম্ভ'পরে স্তম্ভবর
গবাক্ষ গবাক্ষ'পর
কাঁধে কাঁধে বাঁধা যেন শূন্যদেশ যুড়িয়া !

উঠেছে সলিল-গর্ভে বারিদর্প নিবারি
কত শিলাময় মঠ,
কত অট্টালিকা পট,
জঙ্ঘা, কটি, স্কন্ধদেশ অর্দ্ধনীরে প্রসারি !

শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে—
শিলাবাঁধা স্থলে জলে
সোপানের শ্রেণী চলে,
উর্দ্ধদেশে সৌধশ্রেণী
নিম্নে সোপানের বেণী
চলেছে সলিলবুকে সরীসৃপ-বিধানে।

না উঠিতে রবিচ্ছবি প্রাচীতের আকাশে,
কলরবে কলকল
করে জাহ্নবীর জল
দিগন্ত সে কলরব উঠে নিশি-বাতাসে।

প্রাণিময় যেন কূল নরদেহে চিত্রিত !
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে,
পথে মাঠে স্থলে, জলে,
কত বেশে নারীনর
আসে যায় নিরন্তর,
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।

ওই দেখ উড়িতেছে "মাধোজীর ধরারা"
শূন্য ভেদি কাছে তার
অই দেখ উঠে আর
ছিচূড়া মস্‌জীদ্ অই, আলম্‌গীর পাহারা।

অই দিল্লীশ্বর-ছায়া-তলে এই নগরী,
এই উচ্চ শিলা-ঘাট
এই পাহাড়ের পাট,
শতচূড়া অট্টালিকা,
ক্ষুদ্র যেন পিপীলিকা,
অগাধ সলিলে কিংবা ক্ষুদ্র যেন সফরী।

হের হে দক্ষিণে তার আজো বর্ত্তমান,
হিন্দুর উন্নতিছায়া
মানমন্দিরের কায়া,
মানসিংহ-রাজ-কীর্ত্তি খ্যাত সর্ব্বস্থান।

অঙ্কিত কতই রূপ দেহেতে উহার,
গ্রহাদি-নক্ষত্র-গতি
গণনার সুপদ্ধতি
গ্রহণ-অয়ন-চক্র
পূর্ণ খণ্ড রেখা বক্র,
ভারতের "গ্রীন্‌উইচ" অই আগেকার।

পড়েছে সূর্য্যের আলো সুবর্ণের কলসে,
ঝকিছে দেখরে তায়

যেন সূর্য্য শত-কায়,
সুবর্ণ-মণ্ডিত চূড়া দেউলের পরশে !

কাশী-মধ্যস্থলে অই সুবর্ণের দেউটি—
অই বিশ্বেশ্বর-ধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম,
হিন্দুর ধর্ম্মের শিখা
অই মন্দিরেতে লেখা,
অনন্তকালের কোলে জ্বলে অই দেউটি।

এদিকে নদীর পারে বনরাজি-উপরে
অর্দ্ধ বপু ঊর্দ্ধ ক'রে
যেন বায়ুস্তর ধ'রে
দুর্গা-মন্দিরের চূড়া বিরাজিছে অম্বরে।

চলেছে তাহার তলে বনরাজি-কালিমা—
শূন্য-কোলে রেখা মত
তরুশ্রেণী সারি যত,
স্বভাবের চিত্রকরা,
স্বভাবের শোভাধরা
হরিত বরণে ঢাকা স্বভাবের প্রতিমা !

উঠেছে অদূরে তার দ্রবময়ী সলিলে
স্তূপাকার সৌধরাশি,
যেন সলিলেতে ভাসি,
কোলেতে গঙ্গার মূর্ত্তি নিন্দা করে ধবলে।

পুরাণের ব্যাসকাশী ছিল অই ভুবনে,
অই চইতের গড়,
বুরুজ-গম্বুজ-ধর
সুদৃঢ় প্রস্তরে ঢাকা,
ব্যাসমূর্ত্তি চিত্রে আঁকা
কাশীরাজ-নিকেতন অই "সিংহ" ভবনে!

হে দুর্গে দুর্গতিহরা, কাশীশ্বর-গৃহিণি
ভিখারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্ত্ত্য'পরে
এ সুন্দর বারাণসী, ওগো শিব-মোহিনি?

বিশাই গঠিল কি না জানি না এ নগরে,
দেখি নাই ফ্রাঁসিপুরী;
'পারিস'—ধরাসুন্দরী,
কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে
এ ভুবনে—কারো বক্ষে
এত শোভা দেখি নাই—নিন্দা করে ইহারে!

যাই থাক্ তব মনে, হে নগেন্দ্রবালিকে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব,
একত্র করিলা ভব,
কাশীতলে দয়াময়ী দীনদুঃখিপালিকে।

হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে
নাহিক এমন প্রাণী,
হেন জাতি নাহি জানি,

কি বাণিজ্য ব্যবসার
ভক্তি মুক্তি কি বিস্তার
আশা ক'রে যে না আসে অন্নপূর্ণা-নগরে

আমিও ভিখারী এই ভবরাজ্য ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা
পাব কি আমার দীক্ষা
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দ্ধদগ্ধ অন্তরে ?—
দু'ধারে বরুণা অসি, অই কাশী বারাণসী,
বিরাজে গঙ্গার কূলে ধ্বজা তুলে অম্বরে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কীর্ত্তিনাশা

১

সকলি কি স্বপ্ন! বল ছিল কি এখানে
অভ্রভেদী সেই একবিংশতি রতন?
যেই সৌধচূড়া হ'তে বিশাল পদ্মায়,
বোধ হতো ঠিক উপবীতের মতন?
সে বিশাল রাজপুরী ছিল কি এখানে,
পড়িয়াছে ছায়া যার বঙ্গ-ইতিহাসে?
যাহার বিশাল ছায়া সজ্জিয়া পদ্মায়
পড়েছিল বঙ্গে দশের হৃদয়-আকাশে?

২

সে রাজনগর এ কি? সকলি স্বপন!
স্বপনের মত সব গেছে লুকাইয়া!
বঙ্গ-সিংহাসন ছিল আকাঙ্ক্ষা যাহার,
একটি ইষ্টক তার নাহি নিদর্শন!
অতল-সলিল-গর্ভে পড়িল ভাঙ্গিয়া
কর্ত্তা, কীৰ্ত্তি,—কি সাদৃশ্য! পশিল অতল
চক্র, চক্রী; হায়! এই বিষময় ফল,
অমর কলঙ্কমাত্র রহিল কেবল।

৩

কীৰ্ত্তিনাশা মানবের ভীষণ শিক্ষক।
ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন,
লভিবারে অমরতা বাসনা যাহার,—
লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কালগর্ভে অমরতা, আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীৰ্ত্তির শ্মশানে,
দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত-নয়নে,
তাহার অদৃষ্টলিপি; ভাবী সমাচার
তব মৃদু কলকলে শুনুক শ্রবণে!

৪

মরি; কিবা অভিমানে যাইছ বহিয়া—
সন্ধ্যালোকে কীৰ্ত্তিনাশা! আনন্দে যেমতি
বিজয়ী বীরেন্দ্র যায় মৃদু-মন্দগতি
উপেক্ষি বিজিত শত্রু, চলেছ তেমতি।

উপে ক্ষা ভগবতীর। কি শান্ত হৃদয়—
গণা যায় একে একে তারকা সকল
প্রতিবিম্বে নীল জলে! কি স্রোত মধুর
ঝরিবে না গোলাপের কামিনীর দল।

৫

এত অভিমান যদি; ধর তবে, নদি,
ধর একবার সেই ভীষণ আকার,
রাজবল্লভের পুরী গ্রাসিলে যেরূপে।
ভীষণ-ঘূর্ণিত স্রোতে ছাড়িয়া হুঙ্কার
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে, তরঙ্গ-ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিঙ্মণ্ডল করি বিধুনিত,—
যে মুর্ত্তিতে বালকের ক্রীড়াযষ্টি মত,
ডুবালে সে কীর্ত্তিরাশি, কল্পনা-অতীত,—

৬

ধর সেই মুর্ত্তি,—আমি দেখাব তোমায়
বঙ্গ-ইতিহাসের সে পৃষ্ঠা ভয়ঙ্কর।
দেখাব বিপ্লব-চিত্র, ঘূর্ণচক্রে যার
ডুবিলেন এই রাজনগর-ঈশ্বর!
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্রপুরী,—সেই ঝটিকায়
একটি বিশাল রাজ্য পড়েছে ভাঙ্গিয়া।
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র শাস্তি,—দেখহ চাহিয়া
কি শাস্তি পশ্চাতে তুমি গিয়াছ রাখিয়া!
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র সৃষ্টি, ওই বালুচর—
একই নিঃশ্বাসে যাহা পার মিশাইতে,—

সে বিপ্লবে সেই রাজ্য গিয়াছ স্বজিয়া
না ধরে শকতি কাল রণা খসাইতে।

৭

দূর হোক ইতিহাস! দেখ একবার
মানব-হৃদয়-রাজ্য। দেখ নিরন্তর
বহিতেছে কি ঝটিকা! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কতই গগনস্পর্শী হর্ম্ম্য মনোহর
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কত রূপান্তর তার! উঠিছে জাগিয়া
কতই নূতন সৃষ্টি, কত পুরাতন
নয়ন না পালটিতে যাইছে ভাসিয়া!

৮

কীর্ত্তিনাশা—কিবা নাম, কিবা অভিমান,
পার তুমি মানবের কি কীর্ত্তি নাশিতে?
বঙ্গ-ইতিহাসের সে কাল-পৃষ্ঠা হ'তে
একটি অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে
মুছিলে যেমন এই ধরাপৃষ্ঠ হ'তে
রাজবল্লভের কীর্ত্তি, পার কি মুছিতে
সেই পৃষ্ঠা হ'তে সেই কলুষিত নাম?
সেই পৃষ্ঠা অন্যরূপে পার কি লিখিতে?

৯

কীর্ত্তিনাশা! বৃথা নাম! বৃথা অভিমান!
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার?

নাশিতে করের সৃষ্টি সর্ব্বশক্তিমান,
মানস সৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার!
ভারতের পরাক্রান্ত নৃপতিনিচয়
হয়েছে অদৃশ্য সহ রাজ্য-সিংহাসন,
ত্রিকালের সীমা ওই দেখ নিরূপিয়া
দাঁড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
নশ্বর জোনাকিরাশি গিয়াছে নিবিয়া
অমর তারকাবলি রয়েছে চাহিয়া।

১০

তুচ্ছ তুমি কীর্ত্তিনাশা! মহাকাল-স্রোত
ঐ দেখ দূর হ'তে যাইছে নমিয়া
তাহাদের কীর্ত্তিরাশি। কর-পরশনে
চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ রয়েছে বাঁচিয়া!
একটি চরণ-রেণু যেই পুণ্যবান্
পাইয়াছে, তার কীর্ত্তি করিতে বিনাশ
নাহিক শকতি তব, পারিবে না তুমি,
কীর্ত্তিনাশা! কিংবা কাল সর্ব্ব-কীর্ত্তিত্রাস।

১১

আমি কীর্ত্তি-হীন নর; না ডরি তোমায়,
তব সংহারক মূর্ত্তি ধর, কীর্ত্তিনাশা!
তব ভগ্ন তীরে ওই মূলশূন্য তরু,
আমার অধিক রাখে জীবনের আশা।
তাহার ফলিবে ফল, ফুটিবে কুসুম;

নিষ্ফল জীবন মম। পড়েছে ঝরিয়া
আছিল যে কটি ফুল ; থাক সেই তরু,
দয়া করি কীর্ত্তিহীনে নেও ভাসাইয়া

নবীনচন্দ্র সেন।

জন্মভূমি

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে
দ্যুতিমান্ মধ্যমণি যেমন সুন্দর,
সেইরূপ সমুদায় মেদিনী-মাঝারে
আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর !

প্রকৃতির অতি প্রিয় সেই রম্য স্থল,
নয়নের অভিরাম সেখানে যেমন
নদ, নদী, বনভূমি, প্রান্তর শ্যামল,
ভুবনভিতরে আর নাহিক তেমন !

বিতরে উজ্জ্বলতর কর তথা বিধু,
সূর্য্যের সুবর্ণ করে দীপ্ত দিনমান,
মেদুর সমীর সদা বহে মৃদু মৃদু,
ভূতলে অতুল সেই রমণীয় স্থান !

বিশাল বারিধি-বক্ষে বহিত্র বাহিয়া,
কর্ণধার নাবিক অনেক দেশে যায়,
সুস্থচিত্ত নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া,
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়।

অন্য ভূপ, লোলুপ সে দেশ অধিকারে,
বিপুলবিক্রমে যদি করে আক্রমণ,
হেন কাপুরুষ নাহি, অবাধে তাহারে
প্রস্তুত সে প্রিয় ভূমি করিতে অর্পণ।

বদ্ধপরিকর সবে যুদ্ধভূমে ধায়,
গৃহ-সুখ-অভিলাষ দিয়া বিসর্জ্জন,
জনম সফল ভাবি লয় সে বিদায়,
প্রিয়দেশ-রক্ষা দায়, যাহার নিধন।

অঙ্গনা ভূষণপ্রিয়া সে দেশ রক্ষণে,
অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র-অলঙ্কার;
সুকেশিনী, শিরশোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে, যদি তাহে হয় উপকার।

ধন্য সে ধরণীতলে অগ্রগণ্য ধাম!
যাহার মাহাত্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে;
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" যে ভূমির নাম
উজ্জ্বল করিতে সাধ করে সর্ব্বজনে!

এত অনুরাগ, কোন্ ভূভাগ-উপর?
যদি অল্পজ্ঞান কেহ, সন্ধান না পায়,
যারে ইচ্ছা জিজ্ঞাসিলে পাইবে উত্তর,
'জন্মভূমি'—সুখে তুমি বাস কর যা'য়।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

নিদ্রা

রজনীর সহচরী নিদ্রে মায়াবিনি !
চেতনে মুহূর্ত্তে তুমি কর অচেতন !
জীব-সত্ত্ব-শব্দময়ী এই যে মেদিনী,
তোমার প্রভাবে মৌনী হয়েছে এখন।

নবতৃণবিমণ্ডিত ভূমিখণ্ডে গাভী
চরে না, সম্বিৎহারা, নাই হাম্বারব ;
উন্নত-ককুদ, মেঘ-গম্ভীর-আরাবী,
শিথিলশরীরগ্রন্থি বৃষভ নীরব।

বীতরাগ বিহঙ্গম সঙ্গীত আলাপে,
মোহাবেশে পশিয়াছে কুলায়-মাঝারে।
অবহেলি নব ফুল্ল মল্লিকা গোলাপে,
মন্ত্রমুগ্ধ শিলীমুখ বিমুখ ঝঙ্কারে।

স্পন্দহীন শিশুগণ সহজ-অস্থির,
খেলা ভুলে নীরবেতে করেছে শয়ন।
প্রসূতি চেতনাশূন্য নিস্পন্দ-শরীর,
শিশুপ্রতি নাই আর সতর্ক নয়ন।

বিদ্যার্থী সর্ব্বদা যার বিদ্যা অনুধ্যান,
বিদ্যা-লাভে অতিশ্রমে কাতর না হয় ;
এখন সে শ্রমশীল, অলসপ্রধান,
দেখে না বিফলে তার যেতেছে সময়।

রাখাল মুরলী-যন্ত্র করে না বাদন,
করতালি-তালে গীত না গায় কৃষক,
পল্লীবাল ভুলিয়াছে ধাবন-কুর্দ্দন,
উচ্চহাস হাসে নাকো বাচাল যুবক।

অশ্বরথ রাজপথে করে না প্রয়াণ,
মানুষের যাতায়াত নাহিক তথায়,
নিরাতঙ্কে সারমেয় সেথানে শয়ান,
কিংবা বায়ুভুক্ সর্প তথা লম্বকায়।

নানা নর-কণ্ঠ-স্বরে কোলাহলময়—
জনাকীর্ণ পণ্যশালা হয়েছে বিজন,
বিক্রেতা গ্রাহক নাই, নাই বিনিময়,
নাই প্রয়োজন বুঝে মূল্যনিরূপণ।

বিথারিয়া মায়া, সত্ত্বঃ-সংজ্ঞা-বিঘাতিনী,
মুখর জনমে নিদ্রা মূক জড় করি,
এই যে প্রকৃতি, স্পষ্ট চৈতন্যরূপিণী,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার লইতেছে হরি'।

ধন্য নিদ্রে, তোমার কুহক বিমোহন!
শোক-দুঃখ দূরীভূত তোমার পরশে!
সুস্থিরহৃদয়ে নিশা করিছে যাপন
অশ্রু-জল-অভিষিক্ত যে জন দিবসে।

নয়ন-নন্দন-প্রিয়-পুত্র-শোকাতুরা
অভাগিনী জননী ভুলেছে, শোক-জ্বালা।

জীবন-সর্ব্বস্ব-পতি-বিয়োগ-বিধুরা
মরম-বেদনা তার ভুলিয়াছে বালা !

আশ্চর্য্য সে ইন্দ্রজাল ! হে নিদ্রে ! তোমার,
স্বপনসম্ভূত, যাহে অদ্ভুতের শেষ,
এ হেন যোগ্যতা আর নাহি দেখি কার,
মিথ্যারে সাজাতে দিয়া সত্যের সুবেশ।

দরিদ্র কুটীরে শুয়ে ভুঞ্জে রাজসুখ,
সুধা-ধবলিত-গৃহে ভিখারী ভূপতি,
অপুত্রক আনন্দেতে দেখে পুত্রমুখ,
সন্তান হলোনা বলে ক্ষুণ্ণা পুত্রবতী।

ধন্য ইন্দ্রজাল ! যাহে যোগীন্দ্রবাসনা
স্বর্গধামে যায় নর বিনা তপস্যায় !
প্রসন্ন-সলিলা মন্দাকিনী কলস্বনা,
ললিত-লহরীভঙ্গে বাহিত যথায়।

কল্পতরু, নিয়তই পুষ্পিত, ফলিত,
ফলদানে রাখে যথা যাচকের মান ;
তুষারধবলা, সুরবালা-নিষেবিত,
কামদুঘা, দুগ্ধধারা করে যথা দান

বৃন্দারক-বৃন্দ-মাঝে দেবেন্দ্র বাসব,
বামে শচী তনুরুচি মাধুরী-সম্ভার,
বৈজয়ন্তধামে শোভা সমৃদ্ধি যে সব,
নয়নে বিশদ আহা বিভাসিত তার !

লম্বমান আপিঙ্গল জটা পৃষ্ঠ'পরি,
মধ্যাহ্ন-তপন, মহাযশা তপোধন,
দেবর্ষি নারদ, করে বীণা-যন্ত্র ধরি,
হরিগুণ-গানে তার তোষেন শ্রবণ!

কম্বুগ্রীবা-প্রলম্বিত মন্দারের মালা,
তালমান-সুসঙ্গত-ভূষণ-শিঞ্জন,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী-বালা,
উল্লাসে উৎফুল্ল আঁখি নিরখে সে জন!

কখন বা ঘোরদৃশ্য দেখে সে নরক,
পরিণামে পাপীদের বসতির স্থান,
শিখা উগারিছে যথা জ্বলন্ত পাবক,
দহিবারে দুরাত্মারে, না বধিয়া প্রাণ।

পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, রসনা নীরস,
মুখাগ্রে নির্ঝরে ঝরে সুশীতল জল,
কিন্তু পাপী পায়নাকো তাহার পরশ,
দুষ্কৃতির হেন যথা আছে প্রতিফল!

আছে যথা কৃষ্ণবর্ণ করাল কুক্কুর,
কামড়ায় গাত্রমাংস, করে রক্তপাত,
জীবন্তের চক্ষু খায় বায়স নিষ্ঠুর,
দণ্ডে দণ্ডে যমদূত করে দণ্ডাঘাত!

হর্ষ-খেদ-ক্রোধ-ভয়-বিস্ময়-উদ্রেকে
সমর্থ কবির কাব্য-রস-আস্বাদনে,

বিমুগ্ধ হইলে বালী, বঞ্চিত অনেকে,
স্বপ্ন কিন্তু কুতূহলী করে সর্ব্বজনে।

অয়ি নিদ্রে! অসামান্য কুহক তোমার;
কিন্তু তোমা চেয়ে শ্রেষ্ঠ আছে একজন—
অল্পক্ষণ তুমি দেহ কর অধিকার,
তার স্পর্শে জীব চির-নিদ্রায় মগন।

সে নিদ্রায় শয়নের নাহি প্রয়োজন;
দিবা-নিশা ভেদ নাই সেই কুহকীর;
তুমিত বিলম্ব সও; তিলেক কারণ
বিলম্ব না সহে সেই বিনয়-বধির।

মিথ্যা ঘটনায় সৃষ্ট স্বপন তোমার;
সে নিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মা যখন,
এই যে অবনী-মাঝে জনম তাহার,
প্রকৃত ঘটনা যত ভাবে সে স্বপন।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

শিবাজী

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে—
হে রাজা শিবাজী,

তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি'—
"এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ,
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ!
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী'
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'।

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগযুগান্তের বিদ্যুদ্বহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা!
মোগল উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সে দিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্র নির্ঘোষে
কি ছিল বারতা!

তার পরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশিতে,
দিল্লীরাজশালা,—

একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা !
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তার সীমা।

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন !
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে ;
বণিকের মান দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'ল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম !
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে !

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী!
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি!

হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন
কে জানিত হ'য়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন!

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগি,
গিরিদরীতলে,
—বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি'
পরিপূর্ণ বলে—
সেই মতে বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা

অম্বর আচ্ছন্ন করে এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা !

সেই মত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি
বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হতে
তব জয়ভেরি ?
তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্রবিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার ?

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে !
যারে ভেবেছিল সবে কোন্ কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্ম পরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে !

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে,
এক দৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় কি দৃশ্য মহান
হেরিছে কে জানে !

অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'রে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'রে,
সেই তব কাজ !

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর,—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর !
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এল নামি',
করিল আহ্বান,
মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামি,
বাঙ্গালীর প্রাণ !

এ কথা ভাবেনি কেহ এ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানেনি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে !
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্দ্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত !

মারাঠার প্রান্ত হ'তে এক দিন তুমি, ধর্ম্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,

রাজা বলে' জানি নাই, মানি নাই; পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।
তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্য্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে।

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছে অমর মূরতি,—
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবেনা তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনো কালে!
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন,
তুমি মহারাজ!
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ!

সেদিন শুনিনি কথা— আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' ল'ব!
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব!
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী' বসন
দরিদ্রের বল!
"এক ধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে"—এ মহাবচন
করিব সম্বল!

মারাঠির সাথে আজি হে বাঙ্গালী, এক কণ্ঠে বল
"জয়তু শিবাজী !"
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালী, একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি !
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
সম্ভোগ করুক আজি এক বক্ষে একটি গৌরব
এক পুণ্যনামে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরৎ

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ,
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন-সভাতে,
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে !

শরৎ

জননী তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্তে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁঠি আঁঠি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে!

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল বরণী;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বার তলে
দিশি দিশি হতে তরণী!
আকাশ করেছ সুনীল অমল
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী!

বহিছে প্রথম শিশির সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে,—

কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে !
দিকে দিকে মাতা কত আয়োজন,
হাসিভরা মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে !
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে !

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !
ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া !
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মালা
গন্ধে ভরিছে অবনী ।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী !

পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী!
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্ব্বোধ অতি ঘোর!
যা কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, "কেষ্টা বেটাই চোর!"
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি, "কেষ্টা,"—
যতকরি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা!
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে' আনে!
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপরে নিদ্রাটী আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে "পাজি হতভাগা গাধা,"
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে দেখে' জ্বলে' যায় পিত্ত!
তবু মায়া তা'র ত্যাগ করা ভার—বড় পুরাতন ভৃত্য!
ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি বলে, "আর পারি না কো!
"রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার কেষ্টারে ল'য়ে থাকো!

"না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
"কোথায় কি গেলো, শুধু টাকা গুলো যেতেছে জলের মত !
"গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার,—
"করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলেনা আর !"
শুনে মহারেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তা'র টিকি ধরে',
বলি তা'রে, "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর ক'রে দিনু তোরে।"
ধীরে চলে' যায়, ভাবি গেল দায় ;—পরদিন উঠে দেখি
হুকাটী বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি !
প্রসন্নমুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত,
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তা'রে মোর পুরাতন ভৃত্য !

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালাল গিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়,—বুঝায়ে বলিনু তা'রে—!
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ;—নহিলে খরচ বাড়ে !
ল'য়ে রশারশি করি' কশাকশি পোঁটলা পুঁটলি বাঁধি',
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,—
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।"
আমি কহিলাম, "আরে রাম রাম ! নিবারণ সাথে যাবে !"
রেলগাড়ী ধায় ;—হেরিলাম হায় নামিয়া বর্দ্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে !
স্পর্দ্ধা তাহার হেন মতে আর কত বা সহিব নিত্য !
যত তা'রে দুষি তবু হ'নু খুসি হেরি পুরাতন ভৃত্য !

নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে পিছনে সম্মুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত !
জন ছয় সাতে মিলি' একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা আরামে দিবস যাবে !
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি
কোথা, হা হন্ত, চির বসন্ত ! আমি বসন্তে মরি
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ !
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—"কেষ্ট আয় রে কাছে !
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে !"
হেরি তা'র মুখ ভরে' ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য !
মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তা'র ভাত।
বলে বার বার, "কর্ত্তা, তোমার কোন ভয় নাই, শুন,
"যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম ; তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কাল ব্যাধিভার আপনার দেহ' পরে।
হ'য়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন বন্ধ হইল নাড়ি।
এতবার তা'রে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি' !
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গমাতা

পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি! তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে' আর রাখিও না ধরে'।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে'।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে'
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে'।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে', মানুষ করনি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নববর্ষের গান

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান।—
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।

নববর্ষের গান

এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ !
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান !
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে !
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
চরণের ধুলা লুটে !
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে !
রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয় !
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব,
তোমারি উত্তরীয় !
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
তাই আমাদের দিয়ো !

পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয় !
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব !
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব !
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব !
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

দণ্ডকারণ্যে

কল্পনা ! জাগাও আজি সুখদুঃখময়
অতীত করুণ স্মৃতি ; গাহিব বিজনে—
কাঁদিব একেলা হেথা জুড়াতে হৃদয়,
সীতার বিরহ কথা স্মরি এই বনে ।

আজিও গো গোদাবরী ! কলধ্বনি তব
করিতেছে মুখরিত শূন্য জনস্থান ;
বিকাশিয়া মনোহর শোভা অভিনব
আজিও শোভিছে দূরে গিরি মাল্যবান ।

দনুবন্ধ-অধিষ্ঠিত, জনস্থানপারে
এই সে দণ্ডকারণ্য, চিত্র কুঞ্জবন ;
দূরে দূরে সুবিস্তীর্ণ বনের দু'ধারে
শোভে গিরি শত শত, শোভে প্রস্রবণ

কলস্বের কলকণ্ঠে কোথা কলম্বিত
মনোহর পম্পাসর নয়নরঞ্জন ;
কোথা বা কীচকবন পেচক-শব্দিত ;
নিকুঞ্জ-স্তিমিত কোথা সুগভীর বন।

এই সে দণ্ডকারণ্য শোভায় প্লাবিত,
সেই চারু জনস্থান, গিরি প্রস্রবণ ;
সেই মহারঙ্গভূমি,—যথা অভিনীত
অমিত বিরহদুঃখ, সৌহার্দ্দ্য, মিলন !

হে শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি, দেখাও এ বনে
ফুটিল যে কুঞ্জতলে বাল্মীকি-ভারতী ;
যাপিলা সুদীর্ঘকাল বিরহরোদনে
যথায় ভারতলক্ষ্মী দেবী সীতা সতী।

ছায়াময়ী জানকী গো, ছায়া-তরু-কূলে
জুড়াতে কি তাপদগ্ধ জীবন তোমার ?
যেতে কি কালিন্দীতটে শ্যামবটমূলে
স্মরি পূর্ব্ব সুখকথা বিরহে অপার ?
রচিতে কি শয্যা, দেবী, প্রস্রবণ-শিরে
সৃজি প্রস্রবণ তব দুঃখ-অশ্রুধারে ?

ভ্রমিতে কি বিরহিণী, গোদাবরী তীরে ?
কিংবা সুখচিহ্নমাখা কুঞ্জের মাঝারে ?

ধ্বনিত কি কর্ণে নিত্য, কহ বিরহিণী,
" তব সঙ্গ রব আমি মধুগন্ধি বনে"—
"নয়নে কৌমুদী তুমি, জীবনসঙ্গিনী" ?
বাড়িত কি বড় ব্যথা সে সুখ-স্বপনে ?

লক্ষ্মী ছিলে গৃহে যাঁর, হে ধরা-শায়িনী,
নয়নে অমৃতবর্ত্তি, দেহের চন্দন,
সুখে দুঃখে ছিলে যাঁর আনন্দদায়িনী,
কি করিতে, স্মরি মনে তাঁহার ক্রন্দন ?

স্বকর-কলিত তব শল্লকী-পল্লবে
পুষ্ট করি করভকবংশজাত করী
বিচরে পর্ব্বতে বনে যূথে যূথে সবে ;
কৃপাময়ী, এত দয়া গেছিলে বিতরি।

তোমার পালিত সেই ময়ূর-সন্তান
আজিও নাচিছে হেথা কানন উজলি ;
গাহিছে বিহগ তব করুণার গান ;
তোমার-ই স্নেহের কথা কহে বনস্থলী

তোমার-ই রোপিত সেই কদম্ব এখন
করিয়াছে বনভূমি নীপগন্ধময় ;
সতীত্ব-সৌরভ তব যেন এ কানন
প্রসারিছে বিস্তারিয়া কুরুজ্ঞহৃদয়।

আজিও কদলীকুঞ্জে হরিণের দল
তব দন্ত-তৃণ-লুব্ধ নির্ভয়ে বিচরে ;
কাননে কাননে লেখা রয়েছে কেবল
তোমার স্নেহের লিপি অক্ষয় অক্ষরে।

সহমর্মী বনদেবী বাসন্তী হেথায়
স্মরিয়া তোমার দুঃখ কাঁদে দিন গণি।
তমসা মুরলা আসি গোদাবরী-পায়
বরদে দুঃখের অশ্রু করি কলধ্বনি।

দুঃখান্তে মিলন তব করিয়া সূচিত
ব্রততী-বেষ্টিত তরু বিকশিত ফুলে ;
বিহগ বিহগীসাথে গাহে মধু-গীত ;
মৃগ সহ ভ্রমে মৃগী গোদাবরীকূলে।

তোমার মঙ্গলকরে, বিরহিণী সতী !
আজিও গাহিছে গীতি সুমঙ্গল অতি,
অবনী, অমর সিন্ধু, দেবকুলপতি,
আদি কবি, সবশিষ্ঠ দেবী অরুন্ধতী।

অর্ঘ্য ঢালে মধুচ্যুত, ফল পুষ্পদল ;
বহে মন্দ বনানিল কমল-সুরভি ;
প্রেমের আগ্রহে গায় বিহগসকল।
সতীর মঙ্গলে আজি মাঙ্গলিক সব-ই।

জুড়াইতে জগতের বিরহের ব্যথা,
ভারতের পাপ তাপ করিতে মোচন,

অমৃতা অমৃতময়ী রামায়ণ-কথা
পত্রের মর্ম্মরে গাহে বনস্পতিগণ।

বাল্মীকির কাব্য-কুঞ্জ প্রিয় জনস্থান!
ভারতীর রঙ্গক্ষেত্র চিরদিন তুমি;
তুমি পুণ্য তপোবন, শান্তির সোপান;
ঋষির তপস্যাপূত সুপবিত্র ভূমি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

হিমাচলে

জাগে শৈলে সূর্য্য-কিরণ-বিম্ব,
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি;
যেন তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ—
ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জ্জটি।
ঐ সানুর সোপান-মালার ঊর্দ্ধে
শৃঙ্গ-চরণ রঞ্জিকা;
শোভে অভ্র-সুষমা, যেনরে শুদ্ধা
গৌরকান্তি অম্বিকা।
তথা অর্দ্ধ-ধূসর ভূধর-খণ্ড
দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে;
যেন নন্দীর মত রুদ্র-প্রহরী
দণ্ডিছে চরণে রৌরবে।

সেথা ত্যক্ত চপল বাসনা মানসে,
হত লালসার উগ্রতা
রাজে মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে
তাপসীর চারু শুভ্রতা

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মুষ্টি ভিক্ষা চাই

মুষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।
হাজার রাজা উজীর ধরে' দয়া এনে ভিক্ষা করে'
রচেছ যে গরীব-খানা, সেথায় সোণার ছাই॥
নাই করুণার কোমল সাড়া,— পূর্ণ ভাঁড়ার লক্ষীছাড়া ;
মাইনে-করা দাতার বুকে মায়ার ব্যথা নাই।
মুষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই॥

ওমা তোমার মধুর দৃষ্টি অন্নে করে পুণ্য বৃষ্টি ;
দাওগো দানা অন্নপূর্ণা স্নেহের কণা খাই।
চালের সাথে চাল সুধা আধপেটাতে মিটবে ক্ষুধা ;
দঠির গুণে একটি মুঠায় ঝুলি ভরে' খাই।
মিষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই॥

হাড় জির্ জির্ গায়ে ধুলা অই যে আমার ছেলেগুলা,
তোমার যত সোণার চাঁদে ওদিগে দেখাই ;
বড় সুখী হয়গো দেখে, কত গল্প করে ডেকে ;
তোমার সুখে মোদের বুকে দুঃখ না পায় ঠাঁই।
দৃষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই॥

তোমার প্রসন্ন আনন পানে, ছুটে আসি প্রাণের টানে ;
দূরের পথে সৌরভে তার উল্লাসেতে ধাই।
কাঙাল-খানায় আছে যোড়া, শুক্‌না বাসি ফুলের তোড়া
ভাঙা বৌটায় টাট্‌কা দয়ার কুসুম হেথা পাই।
তুষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী মা, মুক্তি-ভিক্ষা চাই॥

দুঃখী জনে করে মানা গড়ো'নাগো কাঙাল-খানা।
ঘুরে-ফিরে এই দুয়ারে ব্যথার গীতি গাই।
সোনার ঘরে লক্ষ্মী মাগো, ধন-পুত্রে নিয়ে থাকো
ভিক্ষা নিতে এসে দুটি চক্ষে দেখি তাই।
ইষ্ট-ভিক্ষা করি তোমার, মুক্তি-ভিক্ষা চাই॥

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভারতবর্ষের মানচিত্র

শিক্ষক। দেখ, বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র ; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই ; মাতৃ‌অঙ্কে যথা,
এ দেশের ফলে, জলে পালিত আমরা।
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।
ছাত্র। (প্রণামানন্তর) ঐই যে চিত্রের শিরে ঘন মসী-রেখা
পূরব পশ্চিম ব্যাপি' রয়েছে অঙ্কিত,

কি নাম উহার, দেব ! বলুন আমারে ।

শিক্ষক । নহে তুচ্ছ মসী-রেখা ; অই হিমাচল
ভারতের পিতৃরূপী । জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা দানে,
পালিছেন সযতনে । অই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
বিরচি আশ্রয় যেথা, পূজি ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর । সম্মুখেতে তব,
বিজয় মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে অই গৌরী-শৃঙ্গ । দেখ বামদিকে,
অই বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস,
বসি' সে আশ্রম মাঝে, রচিলা পুলকে
অমর ভারত কথা । অবিদূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি উদযাপন,
লভিলা সমাধি যথা । এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি যুগ যুগ,
হইয়াছে পুণ্যভূমি ।—কর নমস্কার !

ছাত্র । অই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক । অই পঞ্চনদ, বৎস ! এই পুণ্যভূমি,
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত ;

কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার প্রতি নদীকূলে,
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস! অমর-ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জ্জন;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র। অই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধ সম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার?

শিক্ষক। এই বিন্ধ্যাচল বৎস। উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধার পূর্ণ। মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য, আর্য্যের বাস স্থাপিলা এদেশে;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে,
শোভিছে এ দেশ মাঝে। এই বন-ভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা চীর ধরি,
কাটাইলা কাল যথা। পুণ্য-প্রবাহিণী
গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে

এখন' বহেন সেথা। পবিত্র এ দেশ,
সীতারাম-পাদ-স্পর্শে। কর নমস্কার।

ছাত্র। গুরুদেব! কৌতূহল বাড়িতেছে মন,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি আজ দেখান আমারে

শিক্ষক। অই বঙ্গভূমি, বৎস। হিমাদ্রি আপনি
মুকুট আকারে হের, শোভে শিরোদেশে ;
ধৌত করি পদতল বহেন জলধি ;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে
"সুজলা," "সুফলা," "শ্যামা"। ভূষারূপে তার
হের ঐ নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু অই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে। নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম অই, পতিতপাবনী
তারিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ।
কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
মাগ' এই বর বৎস ! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।

ছাত্র। বিশাল এ চিত্র দেব! কৃপা করি তবে

সেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।

শিক্ষক। আছে শত শত, বৎস! কি বর্ণিব আমি।
বর্ণিলে জীবন কাল না ফুরাবে তবু;
পুণ্য-প্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল; পদমূলে তার
দেখ শীর্ণকায়া ওই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তট-দেশে তার
আছিল কপিলবাস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখ বামদিকে,
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া ওই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী; হরিশ্চন্দ্র যথা,
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য। দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত-গৌরবস্মৃতি-শিলা ধরি বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী;—বিক্রমের পুরী;
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখন' উঠিছে, বৎস! দেশ-দেশান্তরে।
কি আর অধিক কব? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের;—
নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু বাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ,
তেমনি জানিও বৎস, ভারত-ভূমির

প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণুমাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ;
সামান্য এ দেশ নয়। বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস ! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য্যবংশধর,
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ,
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্য পথে
হও বৎস ! অগ্রসর। ভারতজননী
করুন মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

মা

তবু ভরিল না চিত্ত ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম। বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;

হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি', ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বর গুঞ্জমালা।
তবু ভরিল না চিত্ত, সর্ব্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার।

দেবেন্দ্রনাথ সেন।

ভিখারিণী মেয়ে

(১)

দিনমান যায় যায় প্রায়,
গেল রোদ গাছের আগায় ;
কে ও গায় পথে বসি এমন সময় ?—
না না না, আমারি ভুল, গান ওতো নয় ;
পরাণে কত কি ব্যথা পেয়ে,
কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে !

(২)

কত দুঃখে আহা রে ! না জানি,
শুকায়েছে সোণা মুখখানি !

ছেঁড়া বাস জুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়,
কতদিন তেল বুঝি পড়েনি মাথায় !
অই শুন ! বড় বেদনায়
নিজে কেঁদে পরেরে কাঁদায় !

(৩)

"এ জগতে কেউ মোর নাই,
আমি আজি ভিখারিণী তাই ;
দুয়ারে দুয়ারে ডাকি 'ভিক্ষা দাও' বলে,
ঘর নাই, রেতে তাই থাকি তরুতলে ;
কিছু নাই আমার সম্বল,
সবে ধন নয়নের জল !"

(৪)

ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
অভাগিনী নীরবে তাকায় ;
"পাছে র‍্যাগ করে ভেবে কথা বলি নাই,
তারা কেউ নহে মোর বোন কিবা ভাই ;
তাই তারা আমারে ডাকে না,
মোর পানে চেয়েও থাকে না !

(৫)

"এ জগতে কে আছে আমার,
আমারে বলিবে 'আপনার' ?
আপনা আপনি কাঁদি কেউ নাহি শোনে,
আমারে জগতে কিগো ! কেউ নাহি চেনে ?

এ দেশে তো এত আছে লোক,
মোর তরে কেবা করে শোক ?

(৬)

"হায় বিধি ! আমার কপালে,
মরণ আছে কি কোন কালে ?
বাবা গেছে, দাদা গেছে, মা'ও গেছে চলে,
একা আমি পড়ে আছি এত স'ব বলে
ভাগ্যবান্ তাড়াতাড়ি মরে,
অভাগারে যমে ভয় করে ।

(৭)

"তিন দিন ভাত নাই পেটে,
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে ;
আকাশে উঠিছে মেঘ, উড়িছে পরাণ,
যদি আসে ঝড় জল কোথা পাব স্থান ?
এই মাত্র ভিক্ষা দাও হরি !
আজ যেন একেবারে মরি !

(৮)

"দারুণ দুখের জ্বালা সয়ে,
বেঁচে আছি আধমরা হয়ে ;
এখন বাসনা শুধু, জনম মতন—
মরণের কোলে পাই করিতে শয়ন ;
এ জগতে কেউ যার নাই,
মরণ তুমিই তার ভাই !"

(৯)

কচি মুখে এ বিষাদ গান,
শুনে কার কাঁদে না পরাণ ?
আয় তোরা ভাই বোন, সবে মিলে যাই,
দুখিনীর আঁখি-জল যতনে মুছাই ;
আমাদের মানুষের প্রাণ,
কেন হবে নিরেট পাষাণ ?

(১০)

চল তোরা ওর হাতে ধরে,
ডেকে আনি আমাদের ঘরে ;
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই,
কেউ হ'ব বোন মোরা, কেউ হ'ব ভাই ;
তা হলে ও বেদনা ভুলিবে,
তা হলে বা পুলকে হাসিবে।

শ্রীমানকুমারী বসু।

পল্লী-সন্ধ্যা

সন্ধ্যা আসে অলক্ষিতে অতি ধীরে ধীরে
নয়নে নিদ্রার মত ! নভ, নদী, মাঠ,
তরুর শ্যামল রেখা সাঁঝের তিমিরে
গেছে মিশি'। স্তব্ধ হ'য়ে আকাশ বিরাট
করিছে কাহার ধ্যান। নক্ষত্রের আলো
ধ্যান-মগ্ন যোগি-মুখে হাসির মতন

ফুটিয়া উঠিছে ধীরে। জমিয়াছে ভালো
মণ্ডূক-ঝিল্লীর কণ্ঠে সান্ধ্য-সংকীর্ত্তন
নভ-প্রান্তে। গ্রামখানি করিছে মুখর
শিব-ভক্ত শিবাদল গাল-বাদ্য করি'।
ঊর্দ্ধনেত্রে ভক্তি ভরে জুড়ি' দুটি কর
পল্লীসতী সন্ধ্যারতি করিছে সুন্দরী।

*   *   *   *

সহসা অশথ-শিরে মূক মনোরমা
দেবতার আশীর্ব্বাণী ঢালিল চন্দ্রমা!

শ্রীভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

ডেভিড হেয়ার

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত
জ্বেলেছিলে শুভ্র দীপ শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে;
জনমি খ্রীষ্টান-কুলে খ্রীষ্ট-নামে তরাতে তরিতে
চাহ নাই; তাইত নাস্তিক তুমি নর-সেবা ব্রত।
অর্থদানে মুক্ত পাণি, বিদ্যা দানে অতন্দ্র নিয়ত,
আর্ত্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু মানুষ গড়িতে
স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে; নব্য বঙ্গে—বিকল ঘড়িতে
বিনি মূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত!
কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ,—
তবুও নাস্তিক তুমি!—ও অস্থি নেবে না গোরস্থান!

তাই ছাত্র পল্লী তলে বিরাজিছ ছাত্রের দেবতা !
সমাধা—সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু !
ছাত্র-পরম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
মনুষ্যত্ব ধর্ম্মে পূত—হে নাস্তিক ! আস্তিকের গুরু !

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পুষ্পের নিবেদন

ওগো কালো মেঘ ! বাতাসের বেগে
যেয়োনা, যেয়োনা, যেয়োনা ভেসে ;
নয়ন-জুড়ানো মূরতি তোমার,
আরতি তোমার সকল দেশে !
আকাশের পথে ক্ষণেক দাঁড়ায়ে
পিপাসা বাড়ায়ে যেয়োনা চলে,
গদ গদ ভাষে কি কহ ?—আভাসে
পারিনা বুঝিতে, যাও গো ব'লে
কি বেদনা, মরি' গুমরি' গুমরি'
উঠিছে তোমার হৃদয়-দেশে ?
তৃষিত ফুলের তৃষ্ণা জুড়াও
দাঁড়াও ভুবন-ভুলানো বেশে ।
করুণ তোমার কালো আঁখি হ'তে
দু'টি ফোঁটা জল পড়িল ঝরে' !
ব্যথা পাও যদি, তবে, কেন যাও ?
দাও গো মোদের পরাণ ভ'রে ।

আঙুর-দোলানো অলকে তোমার
লেগেছে স্বপন-বুলানো হাওয়া,
হে চির-শরণ ! জীবন-মরণ !
তোমার পানে যে যায় না চাওয়া !
হের পাণ্ডুর বনভূমি আজ,
পাখীদের স্বরে কত কাকুতি,
বজ্রের ভয় রাখেনা কেবল
কামিনী, কদম, কেতকী, যূথি
ওগো কালো মেঘ ! দাঁড়াও দাঁড়াও,—
বারেক দাঁড়াও যেয়োনা ভেসে,—
ধূলায় মলিন, পিপাসায় ক্ষীণ
দগ্ধ-জীবন-দিনের শেষে ।
কদম আবার উঠুক পুলকি',
কেতকী উঠুক কণ্টকিয়া,
কামিনীর শাখে যে স্বপন জাগে
তাহারে সফল করগো পিয়া ।
গভীর তোমার কাজল নয়নে
ছলছলি' জল পড়িছে এসে,
বনানী ডাকিছে তোমায়,—
দাঁড়াও ক্ষণেক ফুলের দেশে ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পিতা স্বর্গঃ

নীল আকাশের কোনখানে ঐ নীল আকাশের কোন কোণে—
পরীরা সব করচে খেলা পারিজাতের ফুল বনে ?
মিথ্যে অলীক কল্পনা—
কামধেনু আর কল্প-লতার ছলনাতে ভুলবোনা !
তুমিই আমার স্বর্গ পিতা তুমিই আমার দেবতা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধুলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

তাল পাতার ঐ পুঁথির ভিতর ধর্ম্ম আছে বল্লে কে ?
বেদ কোরাণ আর বাইবেলে কি কেউ দেখেচিস্ এক লেখে ?
পুরোহিতের মন্ত্রণায়
সোনা ফেলে আঁচলে তুই বাঁধলি গেরো হায় রে হায় !
তুমিই আমার ধর্ম্ম পিতা তুমিই আমার দেবতা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধুলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

হোম আরতি ঘিয়ের বাতি তপ তপস্যার আড়ম্বর
জোপবোনা নাম, শ্বাস প্রাণায়াম কোরবোনাক অতঃপর,
কাজ কি মিছে জঞ্জালে ?
কি হবে তোর চক্ষু বুজে আসন পেতে বাঘ ছালে !
তুমিই আমার তপ তপস্যা তুমিই আমার দেবতা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধুলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

জানিনিকো শৈশবে আর মানিনিকো যৌবনে,
পাপ করেচি হাজার হাজার আদেশ-নিষেধ-লঙ্ঘনে ;

অপরাধ আর দোষ ত্রুটী—
ক্ষমা করো ভিক্ষে মাগি জোড় করে মোর হাত দুটি!
ঠেকিয়ে মাথা তোমার পায়ে আর মাগি এই ভিক্ষা গো—
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য!

তোমার অতল স্নেহ-শীতল পরশখানি মোর প্রাণে—
বুলিয়ে দে যায় শান্তি সুখের কি অমৃত কে জানে!
মনে মনে হয় ধোঁকা—
আজো আমি তেমনি তোমার ছোট্ট কচি সেই খোকা,
আড়াল করে আগলে আছ যা-কিছু ঝড় ঝঞ্ঝা গো!
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীধর

সন্ন্যাসী সাজি শ্রীধর যেতেছে বদ্রীনাথের পথে,—
আমাদের সেই সঙ্গী শ্রীধর চিনিবে না কোন মতে।
পাঠশালে তার ছিল হাত-টান, দৃষ্টিও ছিল খর,
'নষ্টচন্দ্রে' কত ফল মূল গোপনে করিত জড়।
একদা তাহার মরেছিল যবে পোষা এক শুক পাখী,
দুদিন শ্রীধর কেঁদে ফিরেছিল বনে বনে তারে ডাকি।
পালিত যতনে বিড়াল, কুকুর, পশুপক্ষী নানা জাতি,
জানিনে ত মোরা কবে হ'তে হল সাধু-ফকিরের সাথী।
ছাড়ি যোশী-মঠ চলেছে শ্রীধর শ্রীধামের অভিমুখে,
"পরশ পাথরে" গঠিত ঠাকুর বার বার জাগে বুকে।

সিনান করিয়া, মন্দিরে যবে প্রবেশে হৃষ্টমতি,
দৃষ্টি পড়িল দেবতাগলের মুক্তা-মালার প্রতি।
স্তিমিত আলোকে হেরিয়া সে হার কুভাব জাগিল মনে,
দেখিয়া শ্রীমুখ কাঁপিল হৃদয় বাজিল মরম-কোণে।

দুদিনের পর বিদায়ের দিন হস্তে ধরিয়া থালা,
রাওল ঠাকুর আসিলেন লয়ে সেই সে মুক্তামালা।
বলিলেন ধীরে জড়ায়ে আদরে শ্রীধরের দুটি পাণি—
"বদরী-নাথের পরম ভক্ত আপনি, তাহা কি জানি।
দেবের আদেশে দেবের এ মালা উপহার দিনু করে।"
শুনিয়া শ্রীধর কাঁপিয়া উঠিল বিস্ময়ে লাজে ডরে।
কম্পিত করে মুকুতার মালা গ্রহণ করিল যবে।
পদধূলি নিতে করে কাড়াকাড়ি সাধু সন্ন্যাসী সবে।

ছল ছল চোখে চলেছে শ্রীধর প্রতিপদে পদ টুটে,
যতনে তাহারে ধরে' লয়ে যায় গাড়োয়ালি এক মুটে।
নিজের দীনতা ভাবিয়া শ্রীধর পারে না রোধিতে বারি,
লাগিতেছে আজ মুকুতার মালা পাষাণের চেয়ে ভারি।
এমনি হরির অহেতু করুণা প্রেমের এমনি যাদু,
কয়লা-হৃদয় গলি' হীরা হয় তস্করও হয় সাধু।

শ্রীধর তখন মুছি আঁখিনীর বলিল, "রে মন তবে
এখন হইতে যার মালা তার সন্ধান নিতে হবে।
সংসার ছাড়ি এ মণির মালা কি করিবি তুই নিয়ে,
দেখা হলে পর তাহারে চাহিবি তার ধন ফিরে দিয়ে।"